মোঘল-রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা

(১৭০০—১৭৫০)

এন্. এ. সিদ্দিকী

ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত

পার্ল পাবলিশার্স

২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুখবন্ধ

মোঘল যুগের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিদ্বৎসমাজের আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের গবেষণার দ্বারা পথপ্রদর্শকের কাজটি পূর্বেই সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মত ধারায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে, নূতনতর তথ্যাদি—বিশেষ করিয়া দলিলপত্রাদি লইয়া যথেষ্ট গবেষণা করিতে হইবে। ১৯৫৩ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণার কাজ শুরু করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থ ওই গবেষণারই একটি অঙ্গ। অষ্টাদশ শতকের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। দলিলপত্রাদির সহিত বিভিন্ন ইতিবৃত্ত হইতে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের ভিত্তিতেই ইহা রচিত হইয়াছে।

১৯৫৯ সালে ডক্টরেট উপাধির জন্য আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের উপর মূলতঃ ভিত্তি করিয়াই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থটি সংশোধন করিবার সময় নূতন তথ্যাদির অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন সমস্যা—যথা, ভূমি-রাজস্বের প্রকৃতি ও তাহার পরিমাণ, জমিদারী সংস্থা ও তাহার শাখা প্রশাখা, উজিরী দপ্তরের কার্যাবলী ও কৃষি সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থায় তাহার প্রভাব ইত্যাদির উপর যথেষ্ট বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। কয়েকটি অনিবার্য কারণে গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। তবে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক নুরুল হাসান এবং তাঁহার সহধর্মিনী স্বর্গীয়া খুরশীদ নুরুল হাসান ব্যক্তিগত ভাবে ইহার প্রকাশনায় আগ্রহী থাকায় আমার পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম।

গ্রন্থ রচনায় আমার শিক্ষক, সহকর্মী ও বন্ধুগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি। তাঁহাদের সাহায্য ও পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। আমার শিক্ষক ও নির্দেশক এবং অলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা, অধ্যাপক শেখ আবদুর রসিদের নিকট আমার ঋণ জানাইবার ভাষা নাই। তাঁহার উদার জীবন-দর্শন এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সমস্যাগুলির বাস্তব-সম্মত ব্যাখ্যা, ইতিহাসের মৌলিক উপাদানগুলি যতদূর সম্ভব নিরাসক্তভাবে বিচার করিতে আমায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আমার শিক্ষক, অধ্যাপক নুরুল হাসানের সতর্ক সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া, আমি আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পুনর্বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আমার প্রাক্তন সহকর্মী ডাঃ শ্রীমতী আসিয়া সিদ্দিকি, পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়ার কয়েকটি অধ্যায় অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়া অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক, অধ্যাপক

সতীশ চন্দ্র, গ্রন্থ রচনায় আমায় সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার এই সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

উত্তরপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন সচিব, শ্রী আলি আমির ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক হবিবুর রহমন অনুগ্রহ-পূর্বক এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করায় ভাষার গোলযোগ হইতে বহুল ভাবে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

গ্রন্থ প্রণয়নে বহু ঐতিহাসিক ও গবেষকের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ইহার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন এবং ইহার জন্য সম্পূর্ণভাবে আমি নিজেই দায়ী। পরিবেশিত তথ্য, যুক্তি বা সিদ্ধান্তের ভুল-ত্রুটিগুলি যদি কেহ দয়া করিয়া আমায় দেখাইয়া দেন, তবে আমি সানন্দে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিব।

নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির নিকট হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি ঃ আলিগড়ের মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (আলিগড়) ইতিহাস বিভাগের গবেষণাগার এবং (তাঁহাদের হেফাজতে রক্ষিত দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করায়), উত্তর প্রদেশে সরকারী মহাফেজখানার (এলাহাবাদ) কর্তৃপক্ষ।

নোমান আহ্মদ্ সিদ্দিকী

৬, জাকির বাগ,
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়,
আলিগড়

সূচীপত্র

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের সূচনায় মোঘল সাম্রাজ্যর আঞ্চলিক বিস্তৃতি শীর্ষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যেই এই সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজদরবারে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর আত্মকলহ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার শিথিলতা প্রভৃতি কারণসমূহ সম্মিলিতভাবে ভাঙ্গনপ্রবাহকে ত্বরান্বিত করে। মারাঠাগণ কর্তৃক সাম্রাজ্য আক্রমণ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ; তাহা ছাড়া, শিখ ও জাঠগণ, এমন কি সময় সময় রাজপুতেরা পর্যন্ত, সুযোগ পাইলেই রাজাদেশ অমান্য করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। মোঘল সাম্রাজ্যের শক্তিধর রাজপুরুষগণ নিজেদের স্বার্থে অর্ধ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়েন। তাঁহাদের দলগত বিবাদে রাজদরবার কূট চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির চারণভূমিতে পরিণত হয়। ফলে, সম্রাটের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের শক্তি এবং প্রশাসনিক স্থায়িত্ব দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার উপর ছিল জায়গীরদারী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকট ; যাহার সঙ্গে পূর্বোক্ত ঘটনাবলী ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এইভাবে, অবধারিত ধ্বংসের পথে মোঘল সাম্রাজ্য অগ্রসর হইতে থাকে। ১৭৩৯ সালে পারসিক বাহিনীর জয়লাভে, মোঘল সামরিক শক্তির নৈতিক চরিত্র ও গৌরব বিনষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে।

কী অবস্থায় এবং কোন কার্য পরম্পরায় মোঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ঘটিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, গভীরভাবে উক্ত ঘটনাগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। আলোচ্য যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর লিখিত "দি লেটার মোঘল্‌স্" নামক গ্রন্থে আরভিন অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। সতীশ চন্দ্রের "পার্টিস্ এণ্ড পলিটিক্‌স্ অ্যাট দি মোঘল কোর্ট, ১৭০৭-১৭৩৯" গ্রন্থটি, বিশেষ করিয়া রাজপুরুষগণের ভূমিকা প্রসঙ্গে, অত্যন্ত মূল্যবান। "দি আর্মি অফ দি ইণ্ডিয়ান মোঘল্‌স্" পুস্তকে, আরভিন সেনাবাহিনী সংগঠন লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মূল্যবান হইলেও, সপ্তদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে প্রশাসনিক ও কৃষি সংক্রান্ত ভূমি-ব্যবস্থায় যে সংকটের উদ্ভব হয় এবং যাহা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে অধিকতর ঘনীভূত হয়—তাহার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার বিশ্লেষণ এই সকল গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। "দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ্ মোসলেম ইণ্ডিয়া" পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ শতকের কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে মোরল্যাণ্ড আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু, এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমস্যাকে দেখিবার কোনও প্রচেষ্টা করা হয় নাই। উপরন্তু, প্রধানতঃ বৃটিশ দলিলপত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার আলোচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক কালের পারসিক দলিলপত্র সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করেন নাই ; অথচ এইসব দলিলে প্রচুর মূল্যবান তথ্যাদি রহিয়াছে, যাহার সহায়তায় ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত একটি পরিচ্ছন্ন কাঠামো রচনা করা সম্ভব। এই ফাঁকটি পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেই বর্তমান পুস্তকটি রচিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার বিবিধ বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। জায়গীরদারী প্রথার কার্যধারা এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ ও মোঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উপর তাহার প্রভাব কিভাবে পড়িয়াছিল, বর্তমান গ্রন্থে সে বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। গবেষণার বিষয় হিসাবে গ্রামীন জমিদারী প্রথা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং সেই কারণে, ইহার উপর বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। একই কারণে ইজারাদারী বা রাজস্ব-বিলির প্রথা ও তাহার কার্য পদ্ধতি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। মাদাদ্-মাস্ বিলি প্রথা ও গ্রামীন হিন্দুস্তানের সামাজিক ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক জীবনে তাহার প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। তবে, এই গ্রন্থে মোঘল ভূমি-রাজস্ব পরিচালন পদ্ধতির সেই সকল বৈশিষ্ট্যের উপরেই সাধারণভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে মূলতঃ একটি ঐক্যের ধারা খুঁজিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু উক্ত পরিচালন ব্যবস্থার প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক প্রকারান্তর আমাদের বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু নহে।

১৮শ শতকের প্রথমার্ধে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা মোঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্থায়িত্ব দুর্বল করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। মোটামুটিভাবে বিশিষ্ট মোঘল সম্রাটগণের আমলে যে সকল বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে জায়গীরদারী প্রথার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা ছিল, উক্ত ঘটনাগুলির ফলে, সেই সকল বৈশিষ্ট্য লোপ পাওয়ায় জায়গীরদারী প্রথা বস্তুতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। একইসঙ্গে রাজস্ব-বিলি বা ইজারা প্রথার ব্যাপক প্রচলন শুরু হইয়াছিল।

জায়গীরদারের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে প্রাপ্ত জায়গীরের সংখ্যা হ্রাস, অত্যন্ত উচ্চহারে জমা নির্ধারণ এবং মন্‌সব্‌ ও জায়গীর লাভে বিভিন্ন উচ্চ-পদমর্যাদা-সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ঘটনা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ বৎসরগুলিতে জায়গীর প্রথা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। জায়গীরদারী পদ্ধতির মধ্যে এই প্রবণতা থাকিয়া যায় এবং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ইহা প্রকটতর হয়। জায়গীর পাইবার জন্য মন্‌সব্‌দারগণ চাপ দিতে থাকিলে খালিসা ভূমির বিলি শুরু হয় এবং মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম যুগে দেখা যায়, অধিকাংশ খালিসা ভূমি জায়গীর হিসাবে বন্টন করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না এবং জরুরী অবস্থায় নগদ মাহিনায় সৈন্য সংগ্রহ করিবার প্রথা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, হয় জায়গীরদারগণের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, না হয় উচ্চ হারে জমা নির্ধারিত হওয়ায় মন্‌সব্‌দারগণের আর্থিক সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছিল যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনাবাহিনীর ভরণপোষনে তাঁহারা অপারগ ছিলেন। এই সকল ঘটনার সমন্বয়ের মোট ফল হইল এই যে, জায়গীরদারী পদ্ধতি শুধু যে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সুদক্ষ সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে অসমর্থ হইল তাহা নহে, উপরন্তু, সরকারী বেতনভূক তালিকার অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও এক বৃহৎ সংখ্যক মন্‌সব্‌দার ও

অশ্বারোহী বাহিনীকে জীবিকা হইতে বঞ্চিত করিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাহাই ঘটিল। শুরু হইল রাজদরবারে দলাদলি, সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরে নানারূপ বিদ্রোহ এবং বাহির হইতে মারাঠাগণের পৌনঃপুনিক আক্রমণ।

জায়গীরদারী পদ্ধতির সংকটের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইয়াছিল রাজস্ব-বিলি প্রথার ব্যাপক প্রসার। দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই প্রথা পুনরাবির্ভূত হইয়া বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ব্যাপকতর প্রসার লাভ করে এবং ফারুখসিয়ারের আমলে ইহার প্রচলন অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠে। এই পরিণতির মূল কারণ নিহিত ছিল অংশতঃ অত্যুচ্চহারে জমার অংক নির্ধারণে এবং অংশতঃ বিভিন্ন স্তরের ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান শিথিলতায়। সে যাহাই হউক, রাজস্ব-বিলি পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন জমিদার ও কৃষকের সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল। এই প্রথার প্রচলনে, বংশানুক্রমিক জমিদার শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শ্রেণীর মহাজন ও ফাটকাবাজ সৃষ্টি হইয়াছিল, যাঁহারা রাজস্ব-বিলির ব্যবসায় তাঁহাদের অর্থ লগ্নী করিতেন। এই ইজারাদারগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর জমিদার ছিলেন—এক শ্রেণীতে ধনী ও শক্তিশালী জমিদার, যাঁহারা ক্রমশঃ নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র তালুকদারী গঠন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে শহর হইতে আগত ধনী মহাজন শ্রেণী যাঁহারা প্রবাসী জমিদাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কৃষক শ্রেণীর উপর রাজস্ব-বিলি-প্রথার প্রভাব অধিকতর মারাত্মক হইয়াছিল। ইজারাদার বা জমিদার, যাহার সহিতই রাজস্ব-বন্দোবস্ত করা হউক না কেন, অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে কৃষক শ্রেণীর উপর ধার্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত। উৎপীড়ন চরমে উঠিলে, কৃষকগণ গ্রাম পরিত্যাগ করিতেন ; ফলে, কৃষিকর্মের ক্ষতি হইত এবং উৎপাদন হ্রাস পাইত।

এইরূপে কৃষি-সংক্রান্ত ভূমি-ব্যবস্থার সংকটের সহিত জায়গীরদারী পদ্ধতির সংকট মিলিত হইয়া রাষ্ট্রের আর্থিক ও প্রশাসনিক স্থিতি দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। যাহার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিও এতই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল যে অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ প্রতিহত করিবার মত কোন শক্তিই আর রহিল না।

আশা করি, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিবেন, তাঁহাদের গবেষণার ভূমিকা হিসাবেও বর্তমান গ্রন্থ কাজে লাগিবে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজগণ যখন ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন জমিদারী প্রথা ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কৃষি সংক্রান্ত ভূমি-ব্যবস্থা সহ অন্যান্য অনেক সংস্থান এবং ভূমি-রাজস্ব পরিচালন পদ্ধতির রীতিনীতি বিনষ্ট না করিয়া অপরিবর্তিত রাখাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। ইংরেজদের এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল।

গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যাদির ভিত্তি

বর্তমান গ্রন্থটি প্রধানতঃ মূল পারসিক দলিলপত্রাদির ভিত্তিতে রচিত, যেমন, প্রশাসনিক সারগ্রন্থ, দলিলপত্র, সংবাদ-লিপি, ইতিবৃত্ত, ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত সমসাময়িক রচনা এবং অপ্রচলিত প্রায়োগিক শব্দের অভিধান—এই সকল দলিল-পত্রাদি এবং ইতিবৃত্ত ও সংবাদলিপি হইতে প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হইয়াছে। সুবা সরকার এবং পরগণা ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের ভূমি-রাজস্ব পদ্ধতির গঠন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে উক্ত দলিলগুলির অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন। প্রশাসনিক সারগ্রন্থের সহিত চিঠিপত্রের সঙ্কলন ও দলিলপত্রাদির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে। প্রশাসনিক সারগ্রন্থগুলিতে মোঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থা মোটামুটি সুসঙ্গত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী-গণের নিকট কি ধরনের দলিলপত্র রক্ষিত থাকিত তাহার নিদর্শন আছে। চিঠি-পত্রের সঙ্কলন ও দলিলপত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুসঙ্গত বর্ণনা না থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে যে সকল ফারমান, পরোয়ানা, নিশান, আর্জাদাস্ত ও নিয়োগপত্রের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে মোঘল যুগের প্রশাসনিক পদ্ধতির, বিশেষ করিয়া, বিভিন্ন কর্মচারীর দায় দায়িত্ব এবং ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার আভ্যন্তরিক কর্মধারা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। প্রশাসনিক সারগ্রন্থগুলির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের জমাদানী অঙ্ক এবং মনসব্দার ও অশ্বারোহীর বেতনহারের তালিকা রহিয়াছে।

অনেকগুলি সংস্থার বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য আইন-ই-আকবরী, আকবরনামা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইতিবৃত্তগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করিতে হইয়াছে। এই সকল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত সমসাময়িক কালের তথ্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে রচিত কয়েকটি পারসিক গ্রন্থ যথা, দিল্লীর খাজা ইয়াসিন রচিত গ্লোসারী অফ দি রেভিনিউ টার্মস, মাখজাল-ই-আখবর, দেওয়ান-ই-পসন্দ, দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-মেহেদি আলী খান ইত্যাদি আকর গ্রন্থ হিসাবে আমরা যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছি, কারণ সমসাময়িক কালে রচিত গ্রন্থাদির বহু তথ্য অথবা সমসাময়িক (বা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন) কালের গ্রন্থে কোনো ব্যাখ্যা নাই, এরূপ বহু প্রায়োগিক পদের সমর্থন অথবা সংযোজন উক্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে অথবা ঊনবিংশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে রচিত ইংরেজী দলিলপত্রও পরীক্ষা করা হইয়াছে ; কারণ, যে সকল ইংরেজ রাজকর্মচারী শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় পঠিত মূল পারসিক দলিলের ভিত্তিতে নতুবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐসব দলিল রচনা করিয়াছিলেন। বিভ্রান্তি এড়াইবার জন্য *যে সন বা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ তথ্য পাওয়া গিয়াছে,* বর্তমান গ্রন্থে সেই সময় বা যুগের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাম্রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বা প্রদেশের তথ্যাদি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। মনে হয়, খুলাসাত-উস্-সিয়াক্ গ্রন্থে পাঞ্জাবের প্রশাসনিক পদ্ধতির বিবরণ আছে, নিগার-নামা-ই-মুন্সির আলোচ্য বিষয় হইল পাঞ্জাব, দিল্লি এবং আগ্রা প্রদেশ। দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস রচিত হইয়াছিল সম্ভল মুরাদাবাদে, সুতরাং সম্ভল মুরাদাবাদ ও দিল্লির নিকটবর্তী অঞ্চলের কথা উক্ত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্, দস্তুর-উল্-অমাল-ই-মেহেদি আলী খান ও মাখ্জান-ই-আখবরী অযোধ্যা প্রদেশের ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করে। ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী, রিসালা-ই-জিরাত এবং খাজা ইয়াসিন মহম্মদ প্রণীত গ্লোসারি অফ দি রেভিনিউ টার্মস্ হইতে বঙ্গদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। আজমীর ও রাজপুতানার প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য ওয়াকা-ই-সুবা আজমীর ও গোয়ালিয়রনামা হইতে পাওয়া যায়। গুজরাটের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য মিরাট-ই-আহমদি গ্রন্থে রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য লইয়া গবেষণা করিতে হইলে সিলেক্টেড ডকুমেণ্টস্ অফ শাহজাহান্স্ রেন্ এবং হায়দ্রাবাদের দফ্তর-ই-দেওয়ানী কর্তৃক প্রকাশিত সিলেক্টেড ওয়াকা-ই-অফ ডেকান্ গ্রন্থগুলি অপরিহার্য।

আকরগ্রন্থগুলি বা পান্ডুলিপিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা চলিতে পারে।

(১) এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্
(২) সংকলিত চিঠিপত্র ও দলিলাদি
(৩) বিভিন্ন প্রশাসনিক সারগ্রন্থ
(৪) প্রায়োগিক শব্দ ও প্রশাসনিক প্রথার ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ
(৫) ওয়াকাই
(৬) বিবিধ ইতিবৃত্ত
(৭) ইংরেজী দলিল দস্তাবেজ।

১। **দি এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্ঃ** বহু সংখ্যক ফারমান[১], পরোয়ানা[২], বিক্রয়-কবালা, আদালতের ডিক্রি, ইত্যাদি উত্তর প্রদেশে সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে। আকবরের আমল হইতে মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের প্রায় এক সহস্র দলিল দস্তাবেজ আমি পরীক্ষা করিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকটি দলিলেই তারিখ ও কোনো দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারী বা দপ্তরের অধিকারিকের শীলমোহর আছে, সুতরাং ইহাদের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। মোঘল আমলে অযোধ্যা প্রদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যাদি এই দলিলগুলিতে রহিয়াছে। তবে, উক্ত দলিলগুলিতে জমিদারী ও মাদাদ্-মাস্-বিলি সংস্থার যে সকল বিশিষ্ট তথ্যাদি রহিয়াছে, আমরা মূলতঃ সেই সকল তথ্যের উপরেই গুরুত্ব দিয়াছি। সাধারণতঃ ফারমান ও পরোয়ানাগুলিতে বিলিব্যবস্থা মাদাদ্-মাস্ প্রথায় বণ্টন করা জমির অনুমোদন বা পুনর্নবীকরণের তথ্যাদি পাওয়া যায়। অপর পক্ষে, বিক্রয়-

কবালায়, জমিদারী স্বত্ব বিক্রয়ের লিখিত প্রমাণ থাকায় অনুমান করা যাইতে পারে যে, জমিদারী স্বত্বের হস্তান্তর আইন-সঙ্গত ছিল।

২। **সংকলিত চিঠিপত্র ও দলিলাদি ঃ** বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মচারী-গণ নিজেদের মধ্যে যে সকল চিঠিপত্র বিনিময় করিতেন, এবং কেনো রাজপুরুষ বা সম্রাটের উদ্দেশ্যে যে সকল আর্জাদাস্ত[৩] পাঠানো হইত, তাহাদের নমুনা সংকলিত চিঠিপত্র ও দলিলাদিতে পাওয়া যায়। পরোয়ানা, নিশান[৪], ফারমান এবং বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগপত্র প্রভৃতি প্রচুর সরকারী নথীপত্রও উক্ত চিঠিপত্র ও দলিলগুচ্ছে রহিয়াছে। এই সকল চিঠিপত্র ও দলিল হইতে প্রশাসনিক রীতি ও পদ্ধতি, বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মোঘল প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রকৃত কর্মপন্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। ভূমি-রাজস্ব পদ্ধতি সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান তথ্য এই সকল চিঠিপত্র হইতে পাওয়া যায়।

৩। **বিভিন্ন প্রশাসনিক সারগ্রন্থ ঃ** প্রশাসনিক সারগ্রন্থ সমূহে মোঘল প্রশাসনিক পদ্ধতির মোটামুটি একটা সুসম্বদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় এবং মোঘল প্রশাসনের প্রায় সকল শাখার কথাই এই সবল বিবরণে উল্লেখিত। দস্তুর-উল্-অমাল, খুলাসাত-উস্-সিয়াক্, ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী ও সিয়াবনামা ইত্যাদি গ্রন্থগুলি ইহাদের অন্তর্গত। কয়েকটি প্রশাসনিক সারগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হইল, কেন্দ্রের মোঘল প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি ; আবার অপর কয়েকটি সারগ্রন্থে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং বিভিন্ন কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাই সাধারণতঃ এই সকল সারগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহাদের হেফাজতে যে সকল কাগজপত্র থাকিত তাহার তালিকা, পরগনা কর্মচারীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাবের প্রতিলিপি, প্রদেশগুলির জমা অঙ্ক সহ প্রতি প্রদেশের অন্তর্গত সরকার ও মহালের সংখ্যা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলির মধ্যে ব্যবধান, ইত্যাদি তথ্য উক্ত সারগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। দস্তুর-উল্-অমাল নামক গ্রন্থগুলিতে কেবলমাত্র প্রদেশগুলির জমা অঙ্ক সহ প্রতি প্রদেশের সরকার ও পরগনার সংখ্যা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলির মধ্যে ব্যবধান উল্লেখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে জমা অঙ্কের যে পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে, জমার তুলনামূলক আলোচনার দুরূহ সমস্যায় তাহা যথেষ্ট সাহায্য করে। ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত আলোচনায় পূর্বোক্ত কয়েকটি গ্রন্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আকরগ্রন্থ হিসাবে ইহাদের মূল্য পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। **প্রায়োগিক শব্দ ও প্রশাসনিক প্রথার ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ ঃ** অনেক মূল্যবান তথ্য সেই সকল গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে প্রায়োগিক পদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, মিরাট-উল্-ইস্তিলাহ্, রিসালা-ই-জিরাত এবং দিল্লির খাজা মহম্মদ ইয়াসিন কর্তৃক সংকলিত গ্লোসারি অফ রেভিনিউ টার্মস্।

৫। **ওয়াকাই ঃ** ওয়াকাই বা বিভিন্ন প্রদেশ কর্তৃক রাজদরবারে প্রেরিত সংবাদ হইতে মোঘল আমলের প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রকৃত কার্যপ্রণালী সম্পর্কে

অনেক মূল্যবান ও প্রামাণিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় জয়পুরের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ওয়াকাই ও আখবরাৎ দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। কিন্তু, হায়দ্রাবাদের দফ্তরী-দেওয়ানী কর্তৃক প্রকাশিত দাক্ষিণাত্যের নির্বাচিত ওয়াকাই সমূহ এবং ওয়াকাই-ই-সুবা আজমীর ও রনথম্বোরের প্রতিলিপি (আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষণাগারে প্রাপ্তব্য) আমি অনুধাবন করিয়াছি।

৬। **বিবিধ ইতিবৃত্তঃ** দলিলপত্র হইতে প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদির সহিত, বিভিন্ন ইতিবৃত্তের (পাণ্ডুলিপি অথবা মুদ্রিত) সাক্ষ্যাদির সংযোজন ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সকল ইতিবৃত্তের বিষয়বস্তু আকবরের রাজত্বকাল হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণতঃ ইতিবৃত্ত রচয়িতাগণ প্রশাসনিক ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতেন না, কিন্তু সাধারণ ঘটনার বিবরণে প্রশাসনিক বিষয়ের উপর যে সকল প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ এই সকল বিবরণ হইতে প্রশাসনিক দপ্তরের প্রকৃত কার্যাবলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। উপরন্তু, কয়েকটি ইতিবৃত্তে মোঘল ভূমি-রাজস্ব পরিচালন পদ্ধতির বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। আকবরনামা, মুন্তাখাব-উল্-লুবাব্ ও মিরাট-ই-আহমদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কাফি খাঁ প্রণীত মুন্তাখাব-উল্-লুবাব্ গ্রন্থে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্য প্রণালী এবং বিশেষ করিয়া আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ যুগে জায়গীরদারী পদ্ধতির যে পরিণতি ঘটিয়াছিল, সেই সম্পর্কে বহু তথ্য আছে। মোঘল প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে আকবরনামার পরেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ইতিবৃত্ত হিসাবে মিরাট-ই-আহমদির উল্লেখ করিতে হয়। ইহাতে এরূপ কিছু সংখ্যক ফারমান ও রাজাদেশের উল্লেখ আছে, যাহা হইতে মোঘল প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার, বিশেষ করিয়া, মনসবদারী ও ভূমি-রাজস্ব পরিচালন পদ্ধতির উপর যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন কর্মচারীগণের দায়িত্ব, রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি এবং জমিতে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও স্বত্ব সম্পর্কে বহু তথ্য আলোচ্য ইতিবৃত্তে রহিয়াছে। ইহার ক্রোড়পত্রে জমাদামী হিসাবের পরিসংখ্যান এবং মহাল সংখ্যা সহ সরকারের মোট সংখ্যার যে হিসাব উল্লেখিত আছে, বিশদভাবে জমা অঙ্কের তুলনামূলক আলোচনা করিবার পক্ষে তাহা অপরিহার্য (আইন গ্রন্থেও এই অঙ্কের উল্লেখ আছে)।

অনুরূপভাবে আহ্ওয়াল-উল্-খাওয়াকিন, তাজকিরাত-উল্-মুলুক্, শাহ-নামা-ই-মুনাব্বার-উল্-কলম, রিয়াজ-উস্-সালাতিন এবং সিয়ার-উল্-মুতাক্ষিরিণ গ্রন্থগুলির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশে জায়গীরদারী, জমিদারী ও রাজস্ব-ইজারাদারী সংস্থাগুলির প্রকৃত কার্যপ্রণালীর এবং সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র কিভাবে ভাঙ্গনের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার সুন্দর বিবরণ রহিয়াছে। প্রতিটি ইতিবৃত্ত বিশদভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। তবে, আবশ্যকীয় ইতিবৃত্তসমূহ, তাহাদের রচয়িতা এবং রচনাকালের একটি তালিকা গ্রন্থবিবরণীর মধ্যে উল্লিখিত থাকিবে।

৭। **ইংরেজী দলিল দস্তাবেজঃ** কয়েকটি সংস্থার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম

করিবার প্রয়োজনে আমরা ইংরেজী দলিলপত্রও (বিশেষ করিয়া আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম কর্তৃক সংগৃহীত "সিলেকশনস্‌ ফ্রম দি রেভিনিউ রেকর্ডস অব্‌ দি ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস্‌, ১৮১৮-১৮২১" এবং "স্টাডিস্‌ ইন্‌ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিস্টরী অব্‌ বেঙ্গল, ১৭৬৯-১৭৮৭" গ্রন্থে যে সকল দলিলের উল্লেখ আছে) পরীক্ষা করিয়াছি। "দি সিলেকশনস্‌ ফ্রম দি রেকর্ডস" গ্রন্থে জমিদার, মোকাদ্দাম, কৃষক ও গ্রামীণ ভৃত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই সমসাময়িক কালে রচিত পারসিক গ্রন্থে উল্লেখিত সাক্ষ্য সমূহের অনুমোদন পাওয়া যায়। "স্টাডিস্‌ ইন্‌ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিস্টরী অব্‌ বেঙ্গল" গ্রন্থে কানুনগো দপ্তরের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে মোঘল যুগে কানুনগো দপ্তরের উৎপত্তি ও ক্রম পরিণতি কিভাবে ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে, বহু প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়।

প্রথম অধ্যায়

গ্রাম ও কৃষিজীবী

—এক—

ভারতীয় জনজীবনের ইতিহাস রচনায় যদি গ্রাম এবং গ্রামবাসীর কোন উল্লেখ না থাকে, তবে সে ইতিহাস যে সম্পূর্ণ হইতে পারে না সে বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা কেবলমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ বর্তমান যুগের ন্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামেই বাস করিত। আমাদের আলোচনা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া শুরু করা যাইতে পারে, কারণ জমির সঙ্গে যাহাদের স্বত্ব ও স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাহারা গ্রামেই বাস করিত। আবার ভূমি-রাজস্ব নিরূপণ ও তাহা সংগ্রহের জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই গ্রামই ছিল সেই কর্মকৃতির পটভূমি।

চারিত্রিক ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ভারতীয় গ্রামগুলির মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য, উৎপন্ন শস্য, জমির গুণগত মান এবং গ্রামবাসীদের বিচিত্র সমাবেশের রূপ শুধু যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ছিল তাহা নহে, এই বৈশিষ্ট্য একই প্রদেশের জেলা হইতে জেলান্তরেও ছড়াইয়া ছিল। কিন্তু এইসব প্রভেদ সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলির কয়েকটি সাধারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল আর সেইজন্যই ভারতীয় গ্রাম বলিতে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে এক বিশেষ সত্তার অতিপরিচিত জনপদ। মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামকে অভিহিত করা হইত গাঁও অথবা দেহ্ নামে, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলগুলিতে মৌজা বলিয়াই ছিল ইহার পরিচয়।

মৌজা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজস্ব ব্যবস্থার একক ছিল মৌজা বা গ্রাম। হালি বা আবাদী এবং বাস্তুজমি, জমি, নালা, পুষ্করিণী বা বাগিচা এবং পতিত জমি লইয়া একটি গ্রাম গঠিত হইত।[১] প্রতিটি গ্রামের সীমানা, স্পষ্ট-ভাবে নির্ধারিত করা থাকিত।[২] বিভিন্ন গ্রামের আয়তনে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও ধরা যাইতে পারে যে একটি সাধারণ গ্রামে প্রায় এক হাজার বিঘা হালি জমি থাকিত।[৩] হালি জমি একাধিক প্লটে ভাগ করা হইত এবং প্রত্যেকটি প্লটের সীমানা আল দিয়া নির্ধারিত হইত। বর্তমান যুগের ন্যায় আলোচ্য যুগেও কৃষক ঐসব প্লট বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করিয়া রাখিত।[৪] কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হইত একটি পরগনা এবং এই পরগনাকেই রাজস্ব ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার একক বলিয়া গণ্য করা হইত। পাঁচ বা বারো হইতে ছয়শত বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক গ্রাম জুড়িয়া গঠিত হইত এককেটি পরগনা।[৫] রাজস্ব হিসাব-নিকাশে এইসব গ্রামকে যথাক্রমে আস্‌লি ও দখিলী[৬] এবং রায়তি ও তালুক[৭] এই দুই ভাগে চিহ্নিত করা হইত।

খুলাসত-উস্-সিয়াকের মতে আস্‌লি বলা হইত সেই গ্রামকে, যে গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামেই বসবাস করিত আর দখিলী বলা হইত সেই সব পরিত্যক্ত, অনামা গ্রামকে যা কালক্রমে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাইত।[৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একজন বৃটিশ কর্মচারী লিখিয়াছেন, "রাজস্ব-হিসাব নিকাশে বৃহৎ গ্রামকে আস্‌লি অথবা আদি এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পরনির্ভরশীল গ্রামকে দখিলী বা সমিতিভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করা হইত।"[৯] বস্তুত এই দুটি সংজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী নয়। সম্ভবতঃ যে সব গ্রাম সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়ায় নিকটবর্তী আস্‌লি গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যাইত, এবং যে সব গ্রাম ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র পল্লীতে রূপান্তরিত হইত, তাহাদের উভয়কেই দখিলী বলিয়া অভিহিত করা হইত। মনে হয়, হিসাব-নিকাশের খাতায় তালিকাভুক্ত আস্‌লি ও দখিলী গ্রামের সংখ্যা হইতে স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগ তাহার নির্ধারিত সীমানার মধ্যে মোট আবাদী জমি ও মোট কৃষিজীবীর অনুপাতিক সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারিত।

আস্‌লি এবং দখিলী ছাড়া পরগনার অন্তর্ভূত গ্রামগুলিকে রায়তি ও তালুক নামেও চিহ্নিত করা হইত। এই দুইটি পদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকিলে তৎকালীন কৃষি-ভিত্তিক সমাজে ভূসম্পত্তি ও ভূস্বামীর পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহা জানা যায়। প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাহায্যে আমরা অনুমান করি যে, রায়তি গ্রাম বলিতে সেইসব গ্রামকে চিহ্নিত করা হইত যেগুলি কোন জমিদারের নিষ্কর তালুক অথবা পেশকাশ·দিবার অধিকারী কোন জমিদারের তালুক বহির্ভূত ছিল। দ্বিতীয়ত, রায়তি গ্রামে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন-কানুনের যথাযথ প্রচলন ছিল। তৃতীয়ত রায়তি গ্রামে এক শ্রেণীর কৃষিজীবী কোন কোন ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তর করিবার অথবা ভূমি-রাজস্ব দিবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু রাইয়া নামে পরিচিত অপর এক শ্রেণীর কৃষিজীবীর সেই অধিকার ছিল না। যে শ্রেণীর এই অধিকার ছিল, তাহারা রায়তারি জমিদার নামেও বর্ণিত হইতেন। উপসংহারে বলা যায় যে, রায়তারি গ্রামের জমিদার ব্যক্তিগতভাবে নিজ অংশের ভূমি-রাজস্ব দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিতেন এবং তাঁহারা কোনমতেই তালুকদার নামধারী মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমি-রাজস্ব দাখিলকারী হিসাবে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইতেন না। অপরদিকে, 'তালুক' বলিতে মনে হয়, প্রথমত এমন কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি যাহার জমিদারী স্বত্ব পেশকাশ অথবা পেশকাশের বিনিময়ে সামরিক সাহায্যদানের শর্তে কোন জমিদারকে দেওয়া হইত। দ্বিতীয়ত, তালুক বলিতে এমন কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকেও উল্লেখ করা হইত যে গ্রামগুলির রাজস্ব দিবার ভার কয়েকজন জমিদারের সম্মিলিত হস্তে অর্পিত ছিল এবং যাঁহারা কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির মারফৎ তাহাদের দেয় রাজস্ব সরকারের কাছে পাঠাইতেন। তৃতীয়ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অথবা সাম্প্রতিক ক্রয়ের মারফৎ অর্জিত হইয়াছে, এমন সব জমিদারিকেও তালুক বলা হইত। তাহা ছাড়া, প্রশাসনিক প্রয়োজনে গঠিত কয়েকটি গ্রামের সম্মিলনকেও তালুক বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।[১০]

মনে হয়, এই ধরনের শ্রেণীবিন্যাস একটি পরগনার কৃষিজীবনের নির্দেশক

হিসাবে কাজ করিত। প্রচলিত সংবিধানানুসারে বিভিন্ন স্তরের মনসবদারের মধ্যে জায়গীর বিলি বণ্টন ব্যবস্থার কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করিত।[১১]

—দুই—

কৃষিজীবী : প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাহায্যে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজে কৃষকের স্থান কোথায় ছিল, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে 'কৃষক' শব্দটি আমরা ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বর্তমান লেখক কৃষক বলিতে বোঝাইতে চান সেই চাষীকে, হালি জমিতে যাহার দখলী স্বত্ব থাক বা না থাক, জমি বিক্রয় অথবা বন্ধক দিবার অধিকার যাহার থাকিত না। পারসী ভাষায় রচিত কড়চা এবং নথিপত্রে এই শ্রেণীর কৃষককে মাজারা, আসামী বা রাইয়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই পরিভাষাটি মোরল্যাণ্ড অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, "কৃষক সমিতি (brotherhood) অথবা গ্রামীণ জমিদার এবং গ্রামে যে-সব চাষীর বাস, অথবা, যাহাদের বসত গ্রামের সীমানার বাহিরে হইলেও চাষ করিবার জন্য গ্রামেই আসিত, এই তিন শ্রেণীর চাষীকে লইয়াই কৃষক সমাজ গঠিত।"[১২] আমরা অবশ্য কৃষক কথাটির সংজ্ঞা হইতে উক্ত জমিদার শ্রেণীকে বাদ দিব।[১৩] প্রামাণ্য পারসী গ্রন্থকারেরা যে কৃষক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে জমিদারের শ্রেণীভুক্ত এবং যে কৃষক বঞ্চিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের পরিষ্কার ভাবে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। একথা ঠিক যে চাষের কাজে কৃষক ও জমিদার উভয়েই নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্যটি সহজেই চোখে পড়িত তাহা হইল এই যে, পূর্বোক্ত জমিদারশ্রেণী জমির স্বত্ব ও তাহা হস্তান্তর করিবার জন্মগত অধিকার দাবি করিতেন। অপরপক্ষে, এই দাবি করিবার কোনও অধিকার পরোক্ত শ্রেণীর কৃষকের ছিল না। উপরন্তু, জমিতে তাহাদের দখলী স্বত্ব সম্পর্কেও আপত্তি তোলা যাইত। সুতরাং কৃষক কথাটি যদি এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়, যাহার ফলে গ্রামীণ সমাজে এই দুই বিশিষ্ট শ্রেণীর গুণগত পার্থক্য ঢাকা পড়িয়া যায়, তবে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে। কারণ তাহা হইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যের কথা পারসী গ্রন্থকারেরা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পার্থক্যকে অস্বীকার করা হইবে।

সাধারণত রায়তারি গ্রামেও● জমিদার ব্যক্তিগত ভাবে জমির ভূমি-রাজস্ব দিতে অঙ্গীকৃত থাকিতেন এবং সরকারী কর্মচারিবৃন্দ এই বিষয়ে কৃষকের সঙ্গে সরাসরি কোন সম্পর্ক স্থাপন করিতেন না। 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস' গ্রন্থে উল্লিখিত একটি পাট্টায় দেখা যায় যে মোকাদ্দাম অথবা জমিদারই ভূমি রাজস্ব দাখিল করিবার স্বীকৃতি দিতেন।[১৪] কৃষক এবং জমিদারের আপেক্ষিক অবস্থার সম্পর্কে 'দেওয়ান-ই-পসন্দ গ্রন্থের লেখকের অভিমত অধিকতর স্পষ্ট, তাঁহার মতে প্রত্যেক গ্রামে বসবাস করিতেন কিছু সংখ্যক মোকাদ্দাম অথবা মালিক এবং

তাঁহাদের অধীনে থাকিতেন আসামী বা মাজারা নামে অভিহিত কয়েক শত মানুষ। আসামীরা জমি চাষ করিতেন, এবং মোকাদ্দামদিগের মারফৎ সরকারী-ভূমি-রাজস্ব দাখিল করিতেন।[১৫] এই পুস্তকের অপরাংশে দেখা যায়, জমিদার মারফৎ ভূমি-রাজস্ব দাখিলের পদ্ধতি সাধারণভাবেই চালু ছিল। এই ধরনের বিলি-বন্দোবস্ত জামা-ই-মুসাখ্খাস নামে পরিচিত ছিল। যখন কোন কারণবশত জমিদার নিজে ধার্য ভূমি-রাজস্ব জমা দিবার দায়িত্ব লইতে অসম্মত হইতেন, কেবল সেই সব ক্ষেত্রে কৃষকের নিকট হইতে জমা-বন্দির ভিত্তিতে সরাসরি ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হইত। এই পদ্ধতিকে অমাল-ই-খাম্ বলা হইয়াছে।[১৬] সুতরাং একথা বলা যায় যে, সাধারণত সরকার ও কৃষকের মধ্যে সরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রধানত জমিদারের সঙ্গেই রাজস্ব বিলি বন্দোবস্ত করা হইত এবং কৃষকেরও জমিদারের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইত। তবে একথা ঠিক যে কয়েকটি সরকারী আইনকানুনের সহায়তায় জমিদার কৃষক সম্পর্কে এবং জমিতে কৃষকের কিরূপ স্বত্ব ছিল, তাহা জানা যায়।

কৃষকের স্বত্বঃ জমি বিক্রয় অথবা বন্ধক দিবার কোন অধিকার কৃষকের ছিল না। অন্তত প্রাপ্ত তথ্য সমূহে এই অধিকারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে একটি প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত নিয়মাবলী হইতে জানা যায় যে কিছু কৃষকের জমিতে দখলী স্বত্ব ছিল। 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস' গ্রন্থে জমিদার অথবা মোকাদ্দাম প্রদত্ত এক অঙ্গীকারনামা হইতে আলোচ্য বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জমিদার-কৃষক সম্পর্কে ও তাঁহাদের পারস্পরিক দাবিস্বত্বের ধারা কিরূপ ছিল। তাহার উল্লেখ উক্ত অঙ্গীকার-নামায় রহিয়াছে। আলোচ্য দলিলের মূল বক্তব্যগুলি এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।[১৭]

১। উৎপন্ন শস্যের মোট পরিমাণের ভিত্তিতে স্বীকৃত বাৎসরিক জমা দিতে জমিদার অঙ্গীকারবদ্ধ। ফসলী জমির প্রকৃত পরিমাণ সরকারী খাতায় যে হারে উল্লিখিত রহিয়াছে, জমিদার সেই হারেই প্রতিটি কৃষকের নিকট হইতে নির্ধারিত জমার অংশ সংগ্রহ করিবেন।

২। বিঘা প্রতি নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বাদে জমিদার অন্য কোন প্রকার কর কৃষকদের কাছ হইতে আদায় করিতে পারিবেন না।

৩। তাঁহারা এমন কোন দাবি করিতে পারিবেন না, যাহার ফলে কৃষক গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

৪। যদি কোন কৃষক কোন কারণে গ্রাম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে জমিদার ঐ কৃষকের জমিতে উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পরেও যদি ঐ কৃষকের কোন বকেয়া ভূমি-রাজস্ব থাকে, তবে তাহা গ্রামের অন্যান্য কৃষকের মধ্যে সমহারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

৫। যে সব কৃষক গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে পরের বৎসর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বসবাস করেন, এবং নিজ নিজ জমিতে চাষবাস পুনরায় শুরু করেন, তাহার ব্যবস্থা জমিদারকে করিতে হইবে।

৬। যদি কৃষক পুনরায় গ্রামে বসবাস করিতে অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার জমি নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের আনুপাতিক হারে জমিদারগণ নিজেদের মধ্যে বিলি করিয়া লইয়া সেই জমিতে চাষ শুরু করিয়া দিবেন।

৭। নিজেদের জমি বিনা মজুরিতে চাষ করিয়া লইবার জন্য কৃষকদের উপর প্রচলিত প্রথার অতিরিক্ত চাপ জমিদার দিতে পারিবেন না।

৮। রায়তের ক্ষতি করা চলিবে না।

উক্ত অঙ্গীকার-নামায় মূলত কৃষি সম্বন্ধীয় সম্পর্কের তিনটি বিশেষ ধারার উল্লেখ রহিয়াছে। এই তিনটি ধারা হইল, রাজস্ব ধার্য ও তাহার আদায়, জমিতে কৃষকের দখলী স্বত্ব এবং জমিদারের নিমিত্ত কৃষকের শ্রমদানের সামন্ততান্ত্রিক দায়িত্ব। আলোচ্য অঙ্গীকার-নামায় উল্লিখিত নিয়মাবলী দেখিলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কৃষককে কোন মতেই সহায়হীন ও জমিদারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন প্রজা বলিয়া গণ্য করা যায় না। কয়েকটি নির্ধারিত শর্তে জমি চাষ করিবার অধিকার কৃষকের ছিল। প্রতিটি কৃষকের উপর ধার্য ভূমি রাজস্ব সরকারী কর্মচারী দ্বারা নির্দিষ্ট হইত এবং ঐ ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কীয় বিশদ হিসাব সরকারী দপ্তরের হিসাবের খাতায় লিখিত থাকিত। জমিদারের হস্তে ন্যস্ত ছিল কেবলমাত্র সরকারী হিসাবের তালিকা অনুসারে ভূমি-রাজস্ব আদায় করিবার দায়িত্ব, এবং একথাও পরিষ্কারভাবে জানানো ছিল যে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বাদে কৃষকের নিকট হইতে অন্য কোন প্রকার কর আদায় করিবার অধিকার জমিদারের নাই। অর্থাৎ ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও তাহার আদায় পৃথক পৃথক ব্যক্তিতে ন্যস্ত থাকায় কৃষকের স্বত্ব ও অধিকার অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ থাকিত। মনে হয়, বেআইনী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কৃষকের যথেষ্ট প্রতিকার ছিল, এবং সাধারণত তাঁহার দখলী স্বত্ব অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইত না। এমন কি, গ্রাম ত্যাগ করিলেও তাঁহার দখলী স্বত্ব কায়েম থাকিত যদি তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিতেন।[১৮]

তবে, অঙ্গীকার-নামায় উল্লিখিত স্বত্ব বা অধিকার বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা রূপায়িত হইত অথবা জমিদার কতটা অগ্রাহ্য করিতেন, তাহা অবশ্যই অনুমান সাপেক্ষ। উগ্র নিয়মাবলী কার্যকর করা হয় নাই, বলিয়া কোন অভিযোগের অথবা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির উল্লেখ কোনও দলিলে নাই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জমিদারের প্রতি আরোপিত এই শর্তগুলির নির্দেশ থাকায় এ-কথা আমাদের মানিতে হয় যে, কৃষকের স্বত্ব বা অধিকার শুধুমাত্র সর্বজনবিদিত ছিল না, তাহা সরকারিভাবে লিপিবদ্ধও ছিল। নিজের অধিকার সম্পর্কে কৃষক সচেতন ছিলেন, এবং প্রয়োজনে তিনি সেই অধিকার কার্যকর করিবার প্রচেষ্টায় সরকারের সাহায্যপ্রার্থীও হইতে পারিতেন। আমাদের একথাও মনে হয় যে, জমিদারের প্রচণ্ড প্রভাব সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সরকার একথাও জানিতেন যে সুযোগ পাইলে জমিদার সেই প্রভাবের অপব্যবহার করিয়া কৃষকের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারিতেন। সুতরাং ধরা যায় যে, ঐ শর্তগুলি লিপিবদ্ধ থাকায় জমিদারের যথেচ্ছাচার করিবার সুযোগ অনেকটা সীমিত থাকিত।[১৯]

কৃষক ও জমিদার : আলোচ্য শর্তাবলীর একটিতে বলা হইয়াছে যে জমিদারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কৃষককে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেগার দিতে হইত। তবে এই বেগারের নির্দিষ্ট মাপকাঠি স্থানীয় দেশাচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। বহুপূর্ব হইতে যে সামন্ততান্ত্রিক সূত্রে জমিদার-কৃষক সম্পর্ক আবদ্ধ ছিল, সেই সূত্রের জের হিসাবেই বেগার পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, এ সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় কৃষককে একজন স্বাধীন মানুষ বলা যায়, যে মানুষ কয়েকটি নির্ধারিত বিধি-অনুযায়ী তাঁহার জমি চাষ করিতেন এবং জমিদার মারফৎ তাঁহার উৎপন্ন ফসলের একাংশ ভূমি-রাজস্ব বাবদ সরকারকে দিতেন। এই শর্ত ও নিয়মাবলী পাট্টা নামক দলিলে লিখিত থাকিত, এবং জমিদার এই দলিল কৃষকের হাতে তুলিয়া দিতেন। মেহেদি আলি খান লিখিত 'দস্তুর-উল্-অমাল' হইতে জানা যায় যে, ভূমি-রাজস্ব জমা দিবার দায়িত্ব যে সব জমিদার ও ইজারাদারের হস্তে থাকিত, পাট্টা বিলি করা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। পাট্টায় ভূমি-রাজস্ব পরিমাণ ও নির্ধারণ পদ্ধতির (যেমন নগদী অথবা বাহোলী) সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখিত থাকিত যে নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব ব্যতিরেকে কৃষকের নিকট হইতে অন্য কোনও প্রকার কর জমিদার আদায় করিতে পারিবেন না।[২০] বুঝা যায় যে, কৃষক কত ভূমি-রাজস্ব দিয়াছেন তাহার রসিদ দিতে হইত এবং রসিদে পাটোয়ারীর স্বাক্ষর থাকিত।[২১] অযোধ্যা প্রদেশ সংক্রান্ত এক দলিলে উক্ত প্রদেশের কিয়দংশে কৃষক কি কি শর্তে জমি ভোগ করেন, তাহার বিশদ বিবরণ থাকায়, মনে হয় যে, ঐ সব অঞ্চলে এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন ছিল। এখানে যে দলিলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা একটি স্বীকার পত্র। সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বের ঊনত্রিশতম বৎসরে সাণ্ডিলা পরগনার অন্তর্গত কর্ণাচোরা গ্রামের পাট্টা ও ঝাণ্ডা নামক দুই কৃষকের তরফ হইতে এই স্বীকারপত্র পেশ করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে, উক্ত দুই কৃষক স্বেচ্ছায় ৩২ বিঘা ১০ বিশা জমির পত্তনি গ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ জমি বাবদ তিন বৎসরে ১১৭৪ ফসলি হইতে ১১৭৬ ফসলি (১৭৪৭-১৭৪৯ খৃঃ) মোট ১৯২ টাকা ৩ আনা ভূমি-রাজস্ব দিতে চুক্তিবদ্ধ থাকিতেছেন। ঐ ভূমি-রাজস্ব বাদে দামি ও সাতাহারি নামক কর বাবদ তাঁহাদের যা দেয়, তাহা দিতেও তাঁহারা চুক্তিবদ্ধ থাকিতেছেন। স্বাক্ষরকারীদ্বয় এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ ভূমি-রাজস্ব প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই দিয়া যাইবেন। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, তবে স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আনুপাতিক হারে তাঁহাদের ভূমি-রাজস্ব মকুফ করা হইবে।[২২]

উক্ত মোট ভূমি-রাজস্বের (১৯২ টাকা ৩ আনা) বাৎসরিক কিস্তির হার নিচে দেখান হইল :[২৩]

সন	মোট দেয় ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ
১১৫৪ ফসলি	৬৪ টাকা ১ আনা
১১৫৫ ফসলি	৬৪ টাকা ১ আনা
১১৫৬ ফসলি	৬৪ টাকা ১ আনা

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে সব শর্তে কৃষককে জমি দখলের অধিকার দেওয়া হইত তাহা দলিলে স্পষ্টভাবে লিখিত থাকিত। এই শর্তগুলির মধ্যে ছিল, কৃষককে কতটা জমি দেওয়া হইল, মোট দেয় ভূমি-রাজস্ব এবং তাহার বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ, চুক্তির মেয়াদ এবং শস্য উৎপাদনের ক্ষতি হইলে কি হারে ভূমি-রাজস্ব মকুফ করা হইবে। তবে জমিদার-কৃষক সম্পর্ক প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, আলোচ্য দলিলের দুটি ধারা তাহার সহিত সম্পূর্ণ খাপ খায় নাই। প্রথমত লক্ষণীয় যে, দলিলে যে পরিমাণ জমি কৃষককে দেওয়া হইল বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, শুরুতে সেই জমির উপরই তিন বৎসরের জন্য রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছিল এবং বাৎসরিক কিস্তির হারও ছিল সমপরিমাণ। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে কতটা জমিতে এবং কি রূপ শস্য উৎপাদন করা হইতেছে অথবা পরবর্তী প্রতি বৎসর কত শস্য উৎপন্ন হইল, এই সব বিবরণের কোন উল্লেখ ঐ চুক্তিপত্রে নাই। অর্থাৎ যে করের পরিমাণ চুক্তিপত্রে লিখিত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে জমির নির্দিষ্ট কর। এই কর মোঘল আমলে প্রচলিত উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব নহে। তাহা ছাড়া, আলোচ্য ভূমি-রাজস্ব (যদি ঐ করকে ভূমি-রাজস্ব বলা হয়) প্রচলিত প্রথায় সরকারী কর্মচারী দ্বারা নির্ধারিত হয় নাই। তাহা হইয়াছিল কৃষক ও জমিদারের পারস্পরিক দর কষাকষির নিক্তিতে। তবে, চুক্তিতে প্রচলিত স্থানীয় পরগনার রীতির উল্লেখ থাকায় মনে হয়, সরকার স্থানীয় রাজস্বের যে হার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সেই হারের উপর ভিত্তি করিয়াই উভয়পক্ষ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। এখানে এমন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার নজির অন্য কোন তথ্যে নাই। চুক্তিতে যে রাজস্বের পরিমাণ নির্দেশ করা রহিয়াছে, দামি ও সাতাহারি শুল্ক বাবদ মোট রাজস্ব সংগ্রহের উপর সরকারিভাবে স্বীকৃত জমিদারের দস্তুরি তাহার অন্তর্গত নহে। তথ্যটির সঠিক বিশ্লেষণ দুষ্কর। তবে মনে হয়, কোন এলাকায় এইরূপ বিশেষ রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। দলিলে যে নির্দিষ্ট রাজস্বের কথা রহিয়াছে, তাহা আদায় করিয়া সরকারী রাজস্বশালায় পাঠাইবার দায়িত্ব জমিদারের উপর ন্যস্ত ছিল। আর দামি ও সাতাহারি বাবদ যে শুল্ক আদায় হইত, দস্তুরি হিসাবে জমিদার তাহা নিজস্ব ভোগে নিয়োগ করিতেন। আলোচ্য তথ্য হইতে মনে হয়, কোন কোন অঞ্চলে মোট আদায়ীকৃত রাজস্ব হইতে জমিদারের প্রাপ্য লওয়া হইত না। পরন্তু জমিদারের যাহা দস্তুরি, তাহা পৃথকভাবে দাবি করা হইত।

'তমসুকের প্রতিলিপি' শিরোনামায়[২৪] ৯ই রাজাব ১০৮৮ হিঃ (ইং ১৬৭৮-৭৯ খৃঃ) তারিখের অপর এক দলিলে বলা হইয়াছে, চাদের গ্রাম নিবাসী কানহাইয়া ও রঘুনাথ নামক দুই মোকাদ্দাম ঘোষণা করিতেছেন যে উক্তগ্রামে এবং সাল্সি ও লালপুর নামক দুইটি গ্রাম মহম্মদ সরিফ চৌধুরী মিল্‌কিয়াত স্বত্বে ভোগ করিয়া আসিতেন। তাঁহারা উক্ত চৌধুরীর কৃষক বা মাজারা এবং তাঁহার অনুমতি ক্রমেই কৃষিকর্ম করিয়া আসিতেছেন। সনন্দ হিসাবে এই দলিলটি সম্পাদিত হয়। এখানে দেখা যায় যে, জমি চাষ করিতে হইলে জমিদারের অনুমতি লইতে হইত।

যে চাষীদের কথা এই দলিলে বলা হইয়াছে, তাঁহারা জন্মগত অধিকার বলে জমির মালিকানা দাবি করিতে পারিতেন না। সুতরাং লাঙ্গলে হাত লাগাইবার পূর্বেই জমিদারের অনুমতি ভিক্ষা করিতে হইত। যদি এই বিশ্লেষণ সঠিক হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, এক ধরনের জমি কৃষিকার্যের প্রয়োজনে কৃষককে দিবার অধিকার জমিদারের ছিল, এবং স্বভাবতই জমিদারের কৃপায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এইসব কৃষককে জমিদার ইচ্ছামত জমি হইতে উৎখাত করিতে পারিতেন।

কৃষকের প্রকার ভেদ ঃ অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে সংকলিত এক কড়চায় বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায়কে পাট্টাদার রায়ত, ফসলি রায়ত এবং পাইকাস্ত রায়ত—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাট্টাদার রায়তের স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে নির্দেশ করা হইয়াছে, কারণ তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ১৫ বিঘা জমি চাষ করিতেন, কিন্তু ভূমি-রাজস্ব দিতেন দশ বিঘা জমির উপর। সুতরাং তাঁহাদের অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল ছিল। বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে ফসলি রায়তকে জমি-চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইত এবং বাৎসরিক হারেই তাঁহাদের নিকট ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হইত। ফসলি রায়ত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের নিজস্ব কোন সম্বল ছিল না। অপরপক্ষে, যে-সব কৃষক গ্রামের বাহিরে বসবাস করিতেন, তাঁহাদের পাইকাস্ত রায়ত বলা হইত, এবং জমি চাষ করিবার জন্য তাঁহাদের নির্ধারিত হারে ভূমি-রাজস্ব দিতে হইত।[১৫] আলোচ্য তথ্য হইতে মনে হয় যে বংশানুক্রমিক, পাট্টাদার এবং খুদকাস্ত—এই তিন শ্রেণীর রায়তের কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার ছিল। জমিতে ইঁহারা দখলী স্বত্ব ভোগ করিতেন এবং ফসলী অথবা পাইকাস্ত রায়তের তুলনায় ইঁহাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের হার কম ছিল।

কৃষকের স্থান ঃ উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ সমাজে কৃষকের স্থান কি ছিল তাহা নিরূপণ করা যাইতে পারে। সরকারের সঙ্গে কৃষকের সরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ ভূমি-রাজস্ব জমা দিবার দায়িত্ব ছিল জমিদারের। তবে, জমিদার চুক্তিবন্ধ হইতে অস্বীকার করিলে ভূমি-রাজস্ব সরাসরি প্রতিটি কৃষকের নিকট হইতে পৃথকভাবে আদায় করা হইত। সাধারণত প্রতিটি কৃষকের উপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ সরকারী কর্মচারিবৃন্দই নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কিন্তু তাহা আদায় করিবার দায়িত্ব ছিল জমিদারের। তবে, এলাকা বিশেষে এই নীতির কিছু তারতম্য ঘটা অস্বাভাবিক নহে এবং কিছু কিছু এলাকায় কৃষকের ব্যক্তিগত দেয় খাজনার পরিমাণ কৃষক ও জমিদারের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হইত।

আমাদের তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে যে জমি বিক্রয় অথবা বন্ধক দিবার অধিকার কৃষকের ছিল না। তবে, মৌরসী নামে পরিচিত এক শ্রেণীর কৃষক জমিতে তাঁহাদের একরূপ অধিকার রহিয়াছে বলিয়া দাবি করিতেন। এই অধিকারকে দখলী স্বত্ব বলা যাইতে পারে। সাধারণত, তাঁহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা চলিত না এবং এই অধিকার তাঁহাদের বংশধরদের উপর বর্তাইত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানিতে হয় যে সমাজে এমন এক শ্রেণীর কৃষক

ছিলেন, যাঁহারা কেবলমাত্র জমিদারের অনুমতিক্রমেই জমি চাষ করিতেন এবং জমিদার ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন। বস্তুত, কৃষকশ্রেণীকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায় এবং এইসব বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষকের স্বত্ব ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ছিল।

দেশের কিয়দংশে পাট্টা ও কাবুলিয়তের প্রচলন স্বীকৃত হইয়াছিল এবং এইসব অঞ্চলে যে সকল শর্তে কৃষক জমির মালিকানা ভোগ করিতেন, তাহা নির্দিষ্ট ছিল। তবে, এই প্রচলন দেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ছিল, অথবা কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা দুষ্কর। তবে, যেসব স্থানে এর প্রচলন ছিল, সেইসব স্থানে বে-আইনী আদায় অথবা উৎপীড়নের সম্ভাবনা অনেকাংশেই সীমিত ছিল।

কৃষকের অবস্থা: এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৃষকের অবস্থা কিরূপ ছিল সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ লইয়া কিছুটা বিশদ আলোচনা করা যাইবে। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে ঐ পরিমাণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ছিল। মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যায় যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ হইতে এক দ্বিতীয়াংশ পরিমাণ ফসল কৃষককে রাজস্ব বাবদ দিতে হইত। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন অঞ্চলের জমির উৎপাদন ক্ষমতাও বিভিন্ন ছিল। জমির আসল রাজস্ব (মাল্) ছাড়াও ঐ রাজস্ব ধার্য এবং আদায় করিবার খরচ বাবদ বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন রূপ কর বা শুল্ক তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইত।[২৬] মনে হয়, তলবানা ও সাহগাই নামক যে দুইটি শুল্কের প্রচলন ছিল, তাহা জমিদারের নিকট হইতে আদায় করা হইত। কিন্তু, জমিদার সাধারণত তাহা কৃষকের নিকট হইতে আদায় করিতেন।[২৭] কানুনগো এবং চৌধুরীর প্রাপ্য দস্তুরিও রায়তকেই দিতে হইত। কৃষকের লভ্যাংশের শতকরা ২ ভাগ হারে একটি সরকার স্তরের কানুনগোর দস্তুরি বরাদ্দ ছিল, ঐ লভ্যাংশের শতকরা ১ ভাগ হারে।[২৮] উপরন্তু, আলোচ্য যুগের শাসন পদ্ধতি কৃষিজীবী, বিশেষ করিয়া কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই যুগের শাসন পদ্ধতি কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী ছিল, তাহার নিদর্শন হিদায়ৎ-উল্-কাওয়াদ নামক পুস্তকের এক পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। সুতরাং, ঐ পরিচ্ছেদের বিশদ উদ্ধৃতি হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। *"জমিদারির পথ" এই শিরোনামায় লিখিত পরিচ্ছেদে জোর তলব ও রায়তি* অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থার এক বিবরণ রহিয়াছে। এই পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদারগণকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করা হইত, এবং ভূমি-রাজস্ব আদায়ের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদের অল্প সংখ্যক সৈনিক নিয়োগের ক্ষমতাও দেওয়া হইত। কিন্তু, অনেক সময় অবাধ্য কৃষককে রাজস্ব দিতে বাধ্য করা ঐ স্বল্প সংখ্যক সৈনিকের দ্বারা সম্ভব হইত না। তাহার জন্য প্রয়োজন হইত যথেষ্ট বল প্রয়োগ অথবা বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন।

পদোন্নতির লোভে শত অসুবিধা সত্ত্বেও এইরূপ রাজকর্মচারী সব সময় জমার অংশ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। সুতরাং রায়তি জমিদারের কোথায় কিরূপ ভূ-সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব জোগাড় করিয়া উক্ত কর্মচারিবৃন্দ তাঁহার উপর প্রচণ্ড রাজস্বের ভার চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। আবার জমিদারের চেষ্টা ছিল, এইসব বাড়তি রাজস্বের বোঝা কৃষকের উপর চাপাইয়া দিবার। ফলে, মাঝে মাঝেই কৃষককে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইত। অত্যাচার চরমে উঠিলে তাঁহারা বাধ্য হইয়া রায়তি এলাকা পরিত্যাগ করিয়া জোর তলব জমিদারী এলাকায় চলিয়া যাইতেন। সুতবাং, একদিকে জোর তলব জমিদারী অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিত এবং ঐ অঞ্চলগুলিও সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিত, অন্যদিকে রায়তি জমিদারের আর্থিক দৈন্য ক্রমেই তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যাইত যে তিনি ভূমি-রাজস্ব পর্যন্ত দিতে অপারগ হইয়া পড়িতেন।[২৯]

উপরোক্ত নজির হইতে মনে হয় যে, সাধারণভাবে রায়তি এলাকাভুক্ত কৃষকের উপর অত্যাচার ও রাজস্বের বোঝা প্রচণ্ড ছিল। কাজেই যে-সব এলাকায় এইরূপ উৎপীড়ন অপেক্ষাকৃত কম, কৃষক সেই সব এলাকায় পলাইয়া যাইতেন। তবে একটা কথা এই যে, এইসব বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ তথ্যাদির সাহায্যে তৎকালীন কৃষিজীবনের মোটামুটি একটি চিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে আসা কষ্টকর। তাহার জন্য প্রয়োজন তৎকালীন সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল হইতে আহৃত নজির ও তথ্যাদির।

একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে, ইজারা প্রথা ও তাহার প্রচলন লইয়া আলোচনা করা হইবে। তবে এখানে বলিয়া লওয়া যায় যে, এই পদ্ধতিটিও কৃষকজীবনের কম ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে নাই। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, তৎকালীন সমাজের অনিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা কৃষি-সমৃদ্ধির পরিপন্থী ছিল। সুতরাং সাধারণ কৃষককে কোন মতেই বিত্তশালীদের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কোন মতে দুটি গ্রাসাচ্ছাদন করিয়াই তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইত। সাধারণ কৃষকের গড়পড়তা আয় কত ছিল, তাহা বলা শক্ত। কারণ, অনেকগুলি বিষয়ের উপর তাহা নির্ভর করে। কৃষকের বর্ণ বা জাতি, কিরূপ গ্রামে তিনি বাস করেন, জমিদার সেই গ্রামেই অথবা সংলগ্ন কোন গ্রামে বাস করেন কিনা, গ্রামের সমস্ত হালী জমি কৃষকই চাষ করেন কিনা, জমিতে জনসংখ্যার চাপ কিরূপ অর্থাৎ কৃষকের হাতে গড়পড়তা কতটা জমি এবং ব্যক্তিগতভাবে আসিলের নিজস্ব সততা কতটা · এইসব তথ্যের সঠিক অনুসন্ধানের উপরই নির্ভর করে কৃষকের গড়পড়তা আয় অথবা তাঁহার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা কি ছিল। আঞ্চলিক ভিত্তিতে যদি এই তথ্যগুলির অনুসন্ধান চালানো যায়, তবেই আমরা কৃষকজীবনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব। এখানে আমরা শুধু এই কথাই বোধহয় বলিতে পারি যে কৃষক-শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল। তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন অতিশয় গরীব, কিন্তু সম্পন্ন কৃষকের নজিরও পাওয়া যায়। তাঁহারা জমিতে কয়েকটি শর্ত ভোগ করিতেন। এইসব সম্পন্ন কৃষককে উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে হাই শিয়াৎদার

(বা বিত্তশালী) বলা হইত। রিসালা-ই-জিরাত্ নামক গ্রন্থে আমাদের এই অনুমানের স্বপক্ষে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে, পাট্টাদার রায়ত যথেষ্ট বিত্তশালী, কিন্তু ফসলী রায়তের কপালে থাকিত শুধু অন্তহীন দারিদ্র্য।[৩০]

গ্রামীন ভৃত্যঃ আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে একটি সাধারণ গ্রামে বসবাস করিতেন জমিদার, কৃষক, ভূমিহীন কৃষক এবং গ্রামীণ ভৃত্যবৃন্দ। শেষোক্ত ভৃত্যশ্রেণী, অদ্যাবধি কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় খিদ্‌মতি প্রজা বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা সমগ্র গ্রামীণ সমাজের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিলেও প্রধানতঃ জমিদার ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের কাজেই নিযুক্ত থাকিতেন। পারসী দলিল পত্রে পাটোয়ারী ভিন্ন অপর কোনো শ্রেণীর ভৃত্যের উল্লেখ নাই বটে, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজস্ব-কর্মে লিপ্ত একাধিক সরকারী কর্মচারীর বিবরণে বিভিন্ন শ্রেণীর ভৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজ সরকারের দলিলপত্রে এইসব গ্রামীণ ভৃত্যের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সমর্থনে আমরা দেখি যে বর্তমান যুগে ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ গ্রামে এইসব গ্রামীণ ভৃত্যগণ বংশ পরম্পরায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য হইল লোহার বা কর্মকার, বরহাই বা সূত্রধর, নায়ি বা ক্ষৌরকার এবং ধোবি বা রজক।[৩১] কোন কোন গ্রামে ঝাড়ুদারকেও গ্রামীণ ভৃত্য হিসাবে গণ্য করা হইত। সাধারণত, গ্রামীণ ভৃত্যের মজুরি নগদের পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলে দেওয়া হইত এবং এই প্রথা আজও চলিয়া আসিতেছে। আগ্রা জেলার কালেক্টর প্রদত্ত বিবরণে দেখা যায় "গ্রামীণ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিসমূহ[৩২] প্রতিটি খেত-খামার হইতে লাঙ্গল প্রতি ১০ সের (আধ্যা) ফসল পাইত।"[৩৩] মনে হয়, কিছু সংখ্যক গ্রামে সাকাহ বা ভিস্তিকেও উপরোক্ত হারে নিয়োগ করিবার প্রথা চালু ছিল।[৩৪] ধনুক অথবা গ্রাম্য চৌকিদারের বেতনও দেওয়া হইত ফসল অথবা নিষ্কর জমিদানের মাধ্যমে।[৩৫] ভাঙ্গি বা ঝাড়ুদারকেও তাহার কাজের জন্য কিছু নিষ্কর জমি দেওয়া হইত, তবে সাধারণত· প্রতিটি গৃহস্থের নিকট হইতে প্রতিদিন একটি রুটি বা পিঠা জাতীয় খাদ্য তাহার বরাদ্দ ছিল।[৩৬]

পাটোয়ারীঃ গ্রামের এক মুখ্য কর্মচারী হিসাবে পাটোয়ারী বা গ্রামীণ হিসাবরক্ষক পরিচিত ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে তাঁহার কর্তব্যের বিভিন্ন দিক নির্ধারিত রহিয়াছে। পরবর্তী যুগের কোন দলিলপত্রে তাঁহার দায় দায়িত্বের কোন পরিবর্তন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। মোঘল আমলে পাটোয়ারী গ্রামীণ কেরানী অথবা হিসাবরক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আবুল ফজলের মতে প্রত্যেক গ্রামে একজন পাটোয়ারী থাকিতেন। কৃষকের তরফ হইতে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত।[৩৭] তাঁহার প্রাপ্য কমিশন নির্ধারিত ছিল, মোট রাজস্বের শতকরা ১ ভাগ হারে এবং এই কমিশন পাটোয়ারীর 'সাদ্-দই' নামে অভিহিত হইত।[৩৮] মোকাদ্দাম ও কারকুনের সহযোগে ফসল গ্রহণ ও তাহার পরিমাপ করা এবং বিভিন্ন রাজস্বের মোট হিসাব-সাক্ষ্য দান পাটোয়ারীর প্রধান কর্তব্য ছিল।[৩৯] রাজস্ব আদায়ের কাজেও পাটোয়ারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রায়তের নিকট হইতে যে রাজস্ব আদায় করা হইত, সারখাত বা স্মারকলিপিতে তাহার যথাযথ বিবরণ দিয়া সেই স্মারকলিপি কৃষকের হস্তে অর্পণ করা হইত।[৪০] রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং পরগনা খাজাঞ্চীখাতায় তাহা জমা দিবার ক্ষমতা পাটোয়ারীর উপর ন্যস্ত ছিল।[৪১] তাঁহার অপর একটি কর্তব্য ছিল, মুসখা-ই-তাওজী বা নির্ধারিত রাজস্ব ও তাহার বকেয়া প্রাপ্তির হিসাব রক্ষা করা।[৪২] অপর একটি তথ্য হইতে জানা যায় যে আমিল যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন, পাটোয়ারী তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ স্থানীয় ভাষায় সংকলন করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিতেন। কাগজি-ই-খাম্ নামে পরিচিত এই হিসাবে আমিল কোনরূপ কারচুপি করিয়াছেন কিনা, তাহা সঠিক ভাবে জানিবার জন্য, এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ঐ হিসাব পারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া লওয়া হইত।[৪৩]

মনে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাটোয়ারীর বরাদ্দ মজুরি জমিদারের নিকট হইতে আসিত। পাটোয়ারীর প্রাপ্য মিটাইবার জন্য জমিদার কৃষকের নিকট হইতে টাকা প্রতি ছয় পয়সা হারে দামি নামে একটি শুল্ক আদায় করিতেন।[৪৪] ১১৫৪ ফসলির এক দলিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাতারহি বা জমিদারের প্রাপ্য অংশের উপরও জমিদার জমি-শুল্ক বাবদ কৃষকের নিকট হইতে বিঘা প্রতি এক ফুলুস্ হারে ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতেছেন।[৪৫] রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রে দামি বলিয়া যাহার উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা যদি উপরের আলোচ্য ডামি নামক শুল্কের কথাই হয়, তবে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৃষকই প্রকৃতপক্ষে জমিদার মারফৎ পাটোয়ারীর প্রাপ্য মজুরি মিটাইয়া দিতেন।

পাদটীকা

১. 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলম্‌গিরি', পৃঃ ৪১খ।
২. 'আইন-ই-আকবরি'—১, পৃঃ ২০০ : 'দিওয়ান-ই-পসন্দ', পৃঃ ৭খ।
৩. 'দিওয়ান-ই-পসন্দ', পৃঃ ৮।
৪. 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্', ৩০২ ; 'মেমোয়ারস্ অফ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া', খণ্ড-২, পৃঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য।
৫. 'মিরাট-ই-আহমদি', ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৮৮-২০০ ; 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-শাহনশাহী', পৃঃ ৮৪ক, ৯৩ক, ৯৭খ।
৬. 'সিয়াক্‌নামা', পৃঃ ৩৩-৪৩ ; এবং 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-মুজ্‌মাল-ই', পৃঃ ৪০খ, ৪১কখ, ৪২ক দ্রষ্টব্য। 'খুলাসাত্-উস্-সিয়াক', পৃঃ ২৩ক। 'আসলি' এবং 'দখলি গ্রাম' এর জন্য 'দস্তুর-উস-অমাল-ই-শাহনশাহী', পৃঃ ২৫ক-২৭খ দ্রষ্টব্য।
৭. 'সিয়াক্-নামা', পৃঃ ৩৫-৩৯।
৮. 'সিয়াক্-নামা', পৃঃ ২২খ।
৯. 'মেমোয়ারস্ অফ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া', ম্যালকম পৃঃ ৫ (পাদটীকা)।
১০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।
১১. 'হিদায়ৎ-উল্-কোয়াইত', পৃঃ ৭ক-৯খ।

১২. 'অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অফ মুসলেম ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৬১ ; পাদটীকায় মোরল্যাণ্ড ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে দলিলপত্রে 'কৃষক সমিতি' (brotherhood) অন্তর্গত কৃষকদিগকে সাধারণত গ্রামীণ জমিদার, পাত্তিদার অথবা সহ উত্তরাধিকারী বলা হইত। (পৃঃ ১৬১ পাদটীকা)।

১৩. উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলির দলিলপত্রে গ্রামীণ জমিদারের ব্যাখ্যা এইরূপে করা হইয়াছে : "অপরদিকে, স্মরণাতীত কাল হইতে গ্রামীণ জমিদারগণ জমি দখল করিয়া আসিয়াছেন। বংশপরম্পরায় তাঁহারা কৃষিকর্ম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জমি বিক্রয় করিতে এবং বন্ধক দিতে পারিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কৃষকদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতেন যে চুক্তির ফলে অথবা দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারায় পরোক্ত শ্রেণী প্রচলিত খাজনা দিবার অঙ্গীকারে জমির দখলিস্বত্ব অর্জন করিতেন। কিন্তু, কৃষকসমিতির অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কৃষিকর্মে নিযুক্ত রায়তকে স্পষ্টভাবে অপর জমির কৃষক বলিয়া গণ্য করা হইত বলিয়া মনে হয়। তিনি যে জমি চাষ করিতেন সেই জমির উপর দখলিস্বত্ব ছাড়া অপর কোনো স্বত্বের দাবি করিতে পারিতেন বলিয়া কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় নাই এবং বিক্রয়, যৌতুক অথবা বন্ধকী মারফৎ হস্তান্তরিত অথবা একবার পরিত্যাগ করিলে পুনর্বার অধিকার করা চলিত না।" ('রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ৮৯-৯৬ দ্রষ্টব্য)

১৪. 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস', পৃঃ ৬১ক-৮৬খ : এবং 'হিদায়ৎ-উল্-কোয়াইত্', পৃঃ ২৭খ, ২৮কখ দ্রষ্টব্য।

১৫. 'দিওয়ান-ই-পসন্দ', পৃঃ ৭খ।

১৬. একই গ্রন্থে পৃঃ ১৫কখ ; 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-মেহদি আলিখান', পৃঃ ৮খ দ্রষ্টব্য। অনিবার্য কারণ ব্যতিরেকে কোন গ্রামের কৃষকদিগের (বাহশিল-ই-খান) নিকট হইতে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ না করিতে রাজস্ব সংগ্রহকারীর উপর আদেশ ছিল।

১৭. 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস', পৃঃ ৬৬কখ।

১৮. মেহদি আলি খান কৃত 'দস্তুর-উল্-অমাল' গ্রন্থে উদ্ধৃত কিছু কিছু সাক্ষ্যেও কৃষকের দখলি-স্বত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। 'দস্তুর-উল্-অমাল'-এ উল্লিখিত বিধিগুলির প্রথমটিতে বলা হইয়াছে, যে সকল রায়ত তাঁহাদের জমির বংশানুক্রমিক স্বত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের গ্রাম হইতে উৎখাত করা চলিবে না। কোন অবস্থাতেই দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কৃষক পরিবার কোন জমি বংশানুক্রমিক স্বত্বে ভোগ করিয়া আসিতেছেন, সেই জমি হইতে কোন কারণেই তাঁহাদের উৎখাত করা চলিবে না। তবে কৃষক স্বেচ্ছায় তাঁহার দাবি প্রত্যাহার করিলে, সেই জমি পুনর্গ্রহণ করা চলিতে পারে। এইরূপ পরিত্যক্ত জমি এমন কোন ব্যক্তিকে দিতে হইবে যিনি বংশানুক্রমিক স্বত্বে জমি ভোগ করেন। 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-মেহদি আলি খান', পৃঃ ১খ।

১৯. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাস্তবিক ক্ষেত্রে উৎখাতের প্রশ্নটি কখনও উঠে নাই। "বস্তুত জমিদার ও রায়তের মধ্যে এই প্রশ্নটি কখনই সরাসরি উত্থাপিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মজুরের তুলনায় জমির প্রাচুর্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকায়, স্থায়ী রায়ত বর্তমানেও

অত্যধিক অন্যায় দাবি হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারেন। 'রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ৯৬।

২০. 'দস্তুর-উল্-অমাল'—মেহদি আলি খান, পৃঃ ৩ক।

২১. 'দস্তুর-উল্-অমাল'—মেহদি আলি খান, পৃঃ ৩ক।

২২. 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্', ৩২৪ নং

২৩. 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্', ৩২৪ নং

২৪. 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্', ৩২০ নং। তমসুক, একটি চুক্তিপত্র।

২৫. 'রিসালা-ই-জিরাত', পৃঃ ৯খ। দ্রষ্টব্য 'অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম', পৃঃ ১৬১। পূর্বের ন্যায় অস্থায়ী কৃষকদিগকে আজও পাই-কাস্ত বলা হয়, তবে কথাটির বানান ভিন্নরূপে করা হয় (যথা, পাইওকুস্ত)। পূর্বের ন্যায় স্থায়ী কৃষকদিগকে আজও কাহ্প্লারবন্ধ অথবা খুদকাস্ত বলা হয়। (পাদটীকা—১৬১ পৃঃ)

২৬. 'সিয়াক্নামা', পৃঃ ৩১-৩৪।

২৭. 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-মেহদি আলিখান', পৃঃ ১৩ক।

২৮. 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস', পৃঃ ৪২-৪৪ক।

২৯. 'হিদায়ত-উল-কোয়াইত', পৃঃ ৬৪খ-৬৬খ।

৩০. 'রিসালাহ্-ই-জিরাত', পৃঃ ৯খ।

৩১. 'সিলেক্শন্স্ : রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ২৭৮।

৩২. গ্রামীণ সংস্থায় থাকিতেন : কর্মকার, সূত্রধর, ক্ষৌরিক, রজক। ('রেভিনিউ সিলেকশন্স্', পৃঃ ২৭৮)

৩৩. 'সিলেক্শন্স্ : রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ২৭৮।

৩৪. একই গ্রন্থে।

৩৫. একই গ্রন্থে, পৃঃ ২৭৮; কয়েকটি অঞ্চলে পাশীগণ গ্রামীণ চৌকিদারের কার্য করিত।

৩৬. একই গ্রন্থে, পৃঃ ২৭৮।

৩৭. 'আইন-ই-আকবরি', ১ : পৃঃ ২০৯।

৩৮. একই গ্রন্থে, ১, পৃঃ ২০৯। 'সও-দোই'-এর অর্থগত মানে শতকরা দুই হারে।

৩৯. একই গ্রন্থে. পৃঃ ১৯৯।

৪০. একই গ্রন্থে, পৃঃ ১৯৯।

৪১. একই গ্রন্থে, পৃঃ ২০০।

৪২. একই গ্রন্থে, পৃঃ ২০০।

৪৩. 'খুলাসাত-উস্-সিয়াক', পৃঃ ৪৩-৪৪ক।

৪৪. 'সিলেক্শন্স : রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

৪৫. 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস', ৩২৯নং। আলোচ্য দলিলে বলা হইয়াছে যে, 'দামি'র হার পূর্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জমিদার ও জমিদারি

—এক—

জমিদারী সংস্থার মূল বৈশিষ্ট্য : মোঘল আমলের জমিদারী সংস্থাকে রাজস্ব-ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি বলা যায়। বস্তুত জমি ও তাহার ফলভোগাধিকারে উচ্চতম যে সব বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত ছিল এই সংস্থাই তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিত। সাধারণত জমিদার নিজে জমির চাষাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু উৎপন্ন ফসলের একাংশের উপর তাঁহার দাবি ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারের স্বত্ব ও দাবির ধরন ছিল বিভিন্ন। এমনকি, একই অঞ্চলে বা প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের জমিদারির স্বত্বের নিদর্শনও পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে এইসব স্বত্ব ও দাবিগুলি একটি স্থায়ী ভিত্তিতে গঠিত ছিল এবং বংশানুক্রমে তাহা ভোগ করা হইত। এইসব স্বত্বগুলির অধিকাংশই উদ্ভূত হইয়াছিল বসবাসের প্রথম যুগে অথবা ঐ অঞ্চলগুলি অধিকৃত হইবার সময়। এবং কয়েকটি স্বত্ব পরবর্তী যুগে ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হইয়াছিল। আবার কোন কোন সময়ে মোঘল সরকার নিজেই বিভিন্ন ধরনের জমিদারি স্বত্ব দান করিয়াছিল। যদিও উপরোক্ত জমিদারশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল, তবুও শ্রেণীগতভাবে ইহারা আসমি বা রায়ত নামে পরিচিত কৃষক শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন এবং কৃষকশ্রেণীর তুলনায় ইঁহাদের পদমর্যাদা অনেক উচ্চ ছিল। এই দিক হইতে বলা যায় যে, 'জমিদারি' শব্দটি যথেষ্ট অসংযতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সব ব্যক্তিকে জমিদার বলা হইত যাঁহারা বিভিন্ন শর্তে জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন।

উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট হারে পেশকাশ বা কর' দিয়া বংশানুক্রমে তাঁহার জমিদারি ভোগ করিতেন তাঁহাকেও যেমন জমিদার বলা হইত, তেমনই আবার যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট পেশকাশের পরিবর্তে জায়গীর হিসাবে সরকারের কার্যে তাঁহার পদমর্যাদানুযায়ী মাহিনার পরিবর্তে মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন, তাঁহাকেও জমিদার বলা হইত। অন্যদিকে এমন ·ব্যক্তিকেও জমিদার বলা হইত যিনি রাজাদেশে পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জমিদারী পদে অভিষিক্ত হইতেন। অবশ্য জমিদারিতে কোন বংশগত স্বত্ব তাঁহার বর্তাইত না। আবার এমন ব্যক্তিকেও জমিদার বলা হইত জমিতে যাঁহার নির্দিষ্ট কিছু অধিকার ও স্বার্থ স্বীকৃত ছিল। এই স্বত্বগুলির মধ্যে ছিল নির্দিষ্ট জরিপের মাধ্যমে ধর্ম মাল-ওয়াজিব অথবা ভূমি-রাজস্ব দিবার অধিকার। তালুকদার নামে পরিচিত ব্যক্তিরাও জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

জমিদারী প্রথা যে কেবলমাত্র বিভিন্ন শর্ত বা চুক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল, তাহাই নহে, উপরন্তু বিভিন্ন জমিদারির সীমানাও বিভিন্ন অঙ্কের ছিল। নির্ধারিত

মাল ওয়াজিব বা রাজস্ব প্রদানের শর্তে একটি জমিদারির সীমানা এক অথবা একাধিক গ্রামের অংশ বিশেষ হইতে পারিত। আবার এরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায়, যেখানে একাধিক গ্রামের সমষ্টি লইয়া গঠিত কোন জমিদারির মালিকানা এক বা একাধিক ব্যক্তির হস্তে অর্পিত ছিল। ভূমি-রাজস্ব বা মাল-ওয়াজিব প্রদানের শর্তে কোন কোন জমিদারি একাধিক গ্রাম এবং এক বা একাধিক পরগনা লইয়া গঠিত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।[১] একই রূপে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণের পেশকাশ দিবার অঙ্গীকারে কোন কোন জমিদারির সীমানা কতিপয় গ্রাম অথবা এক ও একাধিক পরগনা অথবা একটি সরকার বা তদপেক্ষা অধিক এলাকা লইয়াও গঠিত হইত। একইভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন সংখ্যক গ্রাম লইয়া একটি তালুকও গঠিত হয়।

যে সকল জমিদার মোঘল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করিতেন ও যাঁহারা সামন্তপ্রধান অথবা রাজা নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদেরও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়। প্রথমে উল্লেখ করা যায় সেইসব জমিদার বা রাজন্যবর্গের, যাঁহারা মোঘল-সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে সামরিক অথবা অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। তাঁহাদের রাজত্বের মধ্যে মোঘল মুদ্রার প্রচলনে ঐ স্বীকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, অপর এক শ্রেণীর জমিদার ছিলেন যাঁহারা সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নির্দিষ্ট পেশকাশ অথবা প্রাদেশিক নাজিমকে সামরিক সাহায্য প্রদানের শর্তে নিজস্ব রাজত্ব ভোগ করিতেন। এই শ্রেণীর জমিদারের কিয়দংশ মনসবদার হিসাবে তালিকাভুক্ত ছিলেন এবং নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী (অশ্ব চিহ্নিত করা ও অশ্বের সংখ্যা সংক্রান্ত প্রমাণ) মোঘল রাজদরবারের নিকট হইতে তাঁহাদের পদমর্যাদার উপযুক্ত পারিশ্রমিকের পরিবর্তে এই জমিদারিগুলি জায়গীর হিসাবে পাইতেন।[২] কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় মনসবদারী জমিদারকে উক্ত নিয়মাবলী হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইত বটে, তবে প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রয়োজনানুযায়ী তাঁহাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য জোগান দিতে বাধ্য থাকিতে হইত।[৩]

যে সকল জমিদার মোঘল সম্রাটের বশ্যতা নামমাত্র স্বীকার করিয়া সামরিক অথবা আর্থিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা এইখানে করা হইবে না। মোঘল সম্রাটের সহিত তাঁহাদের সম্পর্কটি ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক।

পেশকাশী জমিদার শ্রেণী ঃ যে সকল জমিদার সরকারকে পেশকাশ অথবা কর প্রদান করিতেন আমাদের মূল দলিল দস্তাবেজে তাঁহারা পেশকাশী[৪], মুকারারী[৫] খয়ের আমালি[৬] জমিদার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পেশকাশ প্রদানকারী জমিদার এবং মাল-ওয়াজিব প্রদানকারী জমিদারের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ ছিল। বীরভূমের জমিদার কেবলমাত্র নির্ধারিত পেশকাশ প্রদান করিতেন। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে তাঁহাকে মাল-ওয়াজিব[৭] প্রদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। মাল-ওয়াজিব শব্দটির অতিপরিচিত অর্থ রহিয়াছে। কৃষিকার্যে নিয়োজিত মোট জমির প্রকৃত পরিমাণ অথবা প্রতিটি গ্রামে কি পরিমাণ শস্য

উৎপন্ন হইত এবং ঐ গ্রাম হইতে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হইত, তাহার পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করিয়া যে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হইত, তাহারই নাম মাল-ওয়াজিব। অতএব পেশকাশী জমিদারিতে কৃষিকার্যে নিয়োজিত জমির প্রকৃত পরিমাণের উপর কর নির্ধারণ করা হইত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পেশকাশী জমিদারির উৎপত্তি ও প্রকৃতি, পরবর্তীকালে তাহার পরিবর্তন এবং উক্ত জমিদারির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য 'মিরাট-ই-আহ্‌মদী' নামক পুস্তকের ক্রোড়পত্রে পাওয়া যায়। এইসব সাক্ষ্য প্রমাণাদি[৮] বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুজরাট প্রদেশটি পেশকাশী এবং খিরাজি সরকার নামে দুইটি পৃথক ধরনের সরকারে বিভক্ত ছিল। উক্ত প্রদেশের ষোলটি সরকারের মধ্যে দশটি খিরাজি[৯] এবং অবশিষ্ট ছয়টি পেশকাশী[১০] সরকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয় গুজরাট প্রদেশ অধিকৃত হইবার পর ডোঙ্গরাপুর, বাঁশবল্লাহ, সন্ত, সিরোহি, সুলেমান নগর (অথবা কচ্ছ) এবং রামনগর নামে ছয়টি সরকার ইহাদের প্রাক্তন জমিদারদের হস্তেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে এই সব জমিদার প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনী লইয়া সামরিক সাহায্য প্রদানে বাধ্য থাকিতেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে ইঁহারা নাজিমকে[১১] সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করেন। অপর দশটি সরকার খিরাজি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে এই সরকারগুলির উপর সূক্ষ্ম পরিমাপের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব দিবার দায়িত্ব থাকিত এবং ইহাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব মোঘল সরকারী কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। তবে এই ধরনের সরকারগুলির মধ্যেও এমন কিছু কিছু জমি, গ্রাম এবং পরগনাও ছিল যাহাদের জমিদার মাল-ওয়াজিবের পরিবর্তে রাজাসরকারকে পেশকাশ প্রদান করিতেন। যে জমিদারি কতিপয় গ্রাম অথবা একটি সম্পূর্ণ পরগনা লইয়া গঠিত হইত এবং যাহার জমিদার পেশকাশ প্রদান করিতেন, সেইসব জমিদারবর্গ ইর্জমি জমিদার নামে পরিচিত ছিলেন।[১২]

অতঃপর দেখা যাইতেছে তদানীন্তনকালে তিন প্রকারের পেশকাশী জমিদার ছিল, যথা-একটি সম্পূর্ণ সরকারের জমিদার, একটি সম্পূর্ণ পরগনা অথবা যথেষ্ট সংখ্যক গ্রামসমষ্টির জমিদার (ইর্জমি জমিদার) এবং স্বল্প সংখ্যক গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পরগনার পেশকাশী জমিদার ও সরকারের পেশকাশী জমিদার সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যাহা হইতে মনে হয় যে সরকারের জমিদারদের তুলনায় পরগনা জমিদারের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব ও আধিপত্য অনেক বেশী ছিল। মনে হয়, সরকার স্তরের জমিদারবর্গের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ছিল এবং মোঘল সরকার সাধারণত তাহাদের এলাকার অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিত না। কিন্তু পরগনা জমিদার (ইর্জমি জমিদার) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইতেন। ইর্জমি জমিদার শ্রেণীভুক্ত রাজপিপ্‌লার জমিদারের উপর যে সংক্ষিপ্ত টীকা আছে তাহা হইতেই আমাদের এই অনুমান। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, রাজ-পিপ্‌লার জমি-দারিতে একজন কাজী, একজন ওয়াকাই নিগার এবং একজন দেশাই কেন্দ্র কর্তৃক

নিযুক্ত করা হইয়াছিল। দেশাই-এর নিয়োগে জমিদার ক্ষুব্ধ হইয়া দেশাই-এর প্রাণনাশ করেন। এই ঘটনার ফলে জমিদারের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান পাঠান হয় এবং তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া পেশকাশ বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।[১৩] আমাদের মনে হয় যে এইসব জমিদারির মধ্যে মোঘল বিচার-পদ্ধতিও বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করা হইত। দেশাই-এর নিয়োগ হইতে মনে হয় যে, দেশাই রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজন হইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। উপরন্তু ইর্জমি জমিদারের পরগনা সাধারণত কোন বাদশাহী ফৌজদারের এলাকার মধ্যে নিহিত থাকায় জমিদাব ঐ ফৌজদারের তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকিতেন।[১৪] স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারি গুলি তাঁহাদের আঞ্চলিক প্রশাসনিক সংস্থার ফৌজদারী এলাকার নিয়ন্ত্রণে থাকিত।

সব পেশকাশী জমিদারই যে রাজা উপাধি ধারণ করিতেন অথবা সকলেই যে হিন্দু ছিলেন তাহা বলা যায় না।[১৫] সঙ্গতভাবে একথাও মনে করিবার কোন কারণ নাই যে প্রতিটি পেশকাশী জমিদারি বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। একদিকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় কিছু অথবা অধিকাংশ জমিদারি অক্ষত অবস্থায় একটি রাজ্য হিসাবে বংশপরম্পরায় একই পরিবারের কর্তৃত্বে থাকিয়া যাইত, অপর দিকে একথাও মনে হয় যে এমন কিছু জমিদারিও ছিল যাহা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনানুযায়ী বিভাজ্য বলিয়া গণ্য হইত।[১৬] কখনও কখনও কতিপয় 'ঘায়ের আমালি' গ্রাম একাধিক জমিদারের কর্তৃত্বে থাকিত।[১৭] সুতরাং যে সকল জমিদার পেশকাশ প্রদান করিতেন, তাঁহাদেরও একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং জমিদার বিশেষের উৎপত্তি ও তাহার ঐতিহাসিক পরিণতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

পেশকাশী জমিদারের উপরোক্ত বিবরণ আহমেদাবাদ সুবার অন্তর্গত বিভিন্ন সরকার ও পরগনার তথ্যজ্ঞাপক বিবরণ দ্বারা সমর্থিত। এই তথ্য হইতে দেখা যায় যে খিরাজী বলিয়া যে সব সরকার বর্ণিত হইয়াছে সেই সব সরকারের সীমানার মধ্যেও এমন গ্রামের (যাহাদের সংখ্যা ৭ হইতে কমবেশী ২৯০) অথবা পরগনার সমবায় ছিল যাহাদের কর্তৃত্ব পেশকাশ প্রদানের অধিকারী ঘায়ের আমালি জমিদারের উপর ন্যস্ত থাকিত।[১৮] ঘায়ের আমালি বলিয়া বর্ণিত গ্রামগুলির নিদর্শন নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা চিহ্নিত করা হইত ঃ

১। রাজস্ব ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী গ্রামের কৃষিভূমি জরিপ করিতেন না।

২। জমিদার রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্র (রেকর্ড) স্থানীয় প্রশাসনিক রাজ কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিতেন না।

৩। একটি সম্পূর্ণ পরগনা জমিদারের অধিকারে থাকিলে ঐ পরগনায় কতগুলি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত, তাহার কোন লিখিত বিবরণ মহাফেজখানায় থাকিত না।

৪। জমিদারের দেয় পেশকাশ কখনও নির্দিষ্ট পরিমাণে ধার্য করা হইত, আবার কখনও তাহা রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী ও জমিদারের মধ্যে দরকষাকষির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত।

৫। যে পরগনায় কয়েকটি মাত্র গ্রাম ঘায়ের আমালি জমিদারের অধিকারে থাকিত, সেখানে কেবলমাত্র রায়তারি গ্রামগুলির জমা-দামি হিসাব-নিকাশ করা হইত।

৬। ঘায়ের আমালি ধারায় কোন সম্পূর্ণ পরগনা অধিকৃত থাকিলে জমা-দামির সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ দেওয়া হইত বটে, কিন্তু ঐ হিসাব বাবদ যাহা আদায় হইত তাহা পেশকাশ হিসাবেই আদায় হইত।

আলোচ্য বিবরণে খিরাজি সরকারের অন্তর্ভুক্ত তিন ধরনের পরগনারও উল্লেখ আছে। যথা ঃ

১। সেই সকল পরগনা, যাহার মধ্যে কোন ঘায়ের আমালি গ্রাম অথবা পেশকাশী জমিদারি নাই।

২। সেই সকল পরগনা, যেগুলি সম্পূর্ণভাবে ঘায়ের আমালি জমিদারের অধিকৃত এবং ঐসকল পরগনায় গ্রামের সংখ্যা কত তাহার কোন লিখিত বিবরণ মোঘল রাজস্ব-দলিলপত্রে পাওয়া যায় না।

৩। সেই সকল পরগনা, যাহাদের অন্তর্গত কিছু সংখ্যক ঘায়ের আমালি গ্রাম জমিদারের দখলে থাকিত এবং এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বিভিন্ন পরগনায় বিভিন্ন হইলেও মোটামুটি ঐ সংখ্যা ৭ হইতে ২৯০ বা তদধিক হইত।[১৯]

তালুকদার বর্গ ঃ তালুকদারেরাও জমিদারশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তালুক ও তালুকদার শব্দ দুইটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত একটি পুঁথিতে ঐ শব্দ দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এইরূপ প্রয়োগের সমর্থন আমরা অন্যান্য পুঁথিপত্রেও পাইয়া থাকি। যে সকল ভিন্ন ধরনের তালুকের কথা ও সংজ্ঞা উক্ত পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি হইল ঃ[২০]

১। প্রশাসনিক সুবিধার প্রয়োজনে সরকারী কর্মচারিবৃন্দ তালুকের সৃষ্টি করে।

২। ইহার দ্বারা একধরনের জমির স্বত্ব বুঝাইতে যাহার দ্বারা একজন বিত্তশালী ব্যক্তি কোন গরিব জমিদারের জমিদারি পরিচালনা এবং ঐ জমিদারির ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে সরকারের নিকট বাধ্য থাকিত।

৩। এক ধরনের জমির স্বত্ব, যাহার দ্বারা সরকারের উপর প্রভাব আছে এমন কোন ক্ষুদ্র জমিদার অন্যান্য জমিদারের তরফ হইতে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ ও তাহা রাজকোষে জমা দিবার অধিকার লাভ করিত।

৪। তালুকদার তাঁহাকেই বলা হইত যে ব্যক্তি একাধিক গ্রামের সমষ্টিগত ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতেন, কিন্তু ঐ সকল গ্রামে কোন একজন ব্যক্তির পরিবর্তে একাধিক অংশীদারের কর্তৃত্ব থাকিত।

৫। সেই ধরনের ব্যক্তি যিনি কয়েকটি গ্রাম ক্রয় করিয়া জমিদারি পত্তন করিতেন কিন্তু যাঁহার জমিদারির কোন কৌলিন্য ছিল না।

সুতরাং তালুক বলিতে বুঝাইত সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সৃষ্ট কোন প্রশাসনিক মণ্ডলী, অথবা সাম্প্রতিক কালে ক্রীত জমিদারি অথবা এমন এক জমির

স্বত্ব যাহার অধিকারী অন্যান্য জমিদারের তরফ হইতে ভূমি-রাজস্ব দিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেন।[২১]

গুজরাটে 'তালুক' শব্দটি যে-সব বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইত সে সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু কিছু তথ্য 'মীরাট-ই-আহমদী' নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে গুজরাটে তালুক বলিতে বুঝাইত সেইসব গ্রামের সীমানা যে সব গ্রাম কোলি ও রাজপুত প্রধানেরা তাঁহাদের বান্থ্-জমি হিসাবে রাখিতেন। এই ধরনের জমির রাজস্ব সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সরাসরি ধার্য হইত না, ইহাদের মালিক তালুকদারের পরিবর্তে জমিদার বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এবং ইঁহারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পেশকাশ প্রদান করিতেন।[২২] বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত একটি তথ্যে তালুক বলিতে ক্ষুদ্র জমিদারি এবং তালুকদার বলিতে ক্ষুদ্র জমিদারকে বুঝানো হইয়াছে।[২৩] তারপর কোন একটি পুস্তকে উক্ত প্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তালুকদারকে মুস্তাজির বা জোতদারের সমপর্যায়ে ফেলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে ইঁহারা কোন চিরস্থায়ী বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন না।[২৪]

পারসী দলিলে উল্লিখিত এই সকল তথ্যাদির অনুমোদন, সংশোধন এবং সংযোজন প্রাচীন ইংরেজ শাসকবর্গ কর্তৃক লিখিত পুস্তকাদিতে বর্ণিত তথ্য-সমূহ হইতে পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে সরকার সৃষ্ট প্রশাসনিক বিভাগকে তালুক বলা হইত। ম্যালকমের মতে "অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জিলাকে (পরগনা হইতে ক্ষুদ্র) তালুক বলা হয়।"[২৫] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তালুক বলিতে এমন এক ধরনের জমির স্বত্বাধিকার বুঝাইত যাহার দ্বারা অপরাপর জমিদারের অনুমতিক্রমে একজন জমিদার তাঁহাদের তরফে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিবার অধিকার লাভ করিতেন। পূর্বে যাহাকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বলা হইত সেই প্রদেশের তালুকদার বর্গ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[২৬] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজস্ব দলিলে তালুকদারী ভোগ স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত অনুসন্ধানের যে সকল ফলাফল লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ প্রদেশের অনেক তালুকদারের উৎপত্তি হয় অতি সাম্প্রতিক কালে এবং পূর্বে ইঁহারা জোতদারই ছিলেন।[২৭] মনে হয়, তালুকদারী স্বত্ব বন্ধক অথবা বিক্রয় মারফৎ হস্তান্তরিত করা যাইত না। তবে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় যে সাধারণত উক্ত স্বত্ব বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগ করা হইত। সামগ্রিক ভাবে বলা চলিতে পারে যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তালুকদার বর্গ তাঁহাদের তালুকে পুরুষ পরম্পরায় ভোগ স্বত্ব দাবি করিতেন কিন্তু ভূস্বত্ব দাবি করিতেন না।[২৮]

কাজেই দেখা যাইতেছে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তালুকদারি এবং জমির রাজস্ব সংগ্রহকারী প্রথার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল। তবে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। তালুকদারি স্বত্ব বংশানুক্রমে দাবি করা যাইত, কিন্তু এমন দাবি সাধারণ রাজস্ব সংগ্রহকারীর করা চলিত না। দ্বিতীয়ত যদিও তালুকদার, রাজস্ব সংগ্রহকারীর কাজ করিতেন (কারণ অন্যান্য

জমিদারের পক্ষ হইতে তিনি রাজস্ব প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন) তিনি কিন্তু নিজেও ছিলেন একজন জমিদার। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, জমিদার ও তালুকদারের মূল পার্থক্য হইল যে তালুকদার কেবলমাত্র জমিদারই ছিলেন না, উপরন্তু অপরাপর জমিদারের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামের রাজস্ব আদায় ও জমা দিবার দায়িত্বও তাঁহার উপর আরোপিত থাকিত।[২৯] তৃতীয়ত রাজস্ব সংগ্রহকারী, সরকার অথবা জায়গীরদারের প্রতিনিধিত্ব করিতেন, পক্ষান্তরে তালুকদার প্রতিনিধিত্ব করিতেন জমিদারের। কৃষি সংক্রান্ত ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে অযোধ্যা প্রদেশে বৃহৎ তালুকগুলি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার জন্য তালুকদারী স্বত্বের এই বিশেষ ধারাটি অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কি করিয়া একটি বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ জমিদারবর্গের অধিকার বিনষ্ট হইয়া তাহা তালুকদার শ্রেণীর অধিকারে পর্যবসিত হইল, সমসাময়িক দলিলপত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে উচ্চতর পদমর্যাদার সুযোগ লইয়া গ্রামীণ জমিদারের আমূল বিনাশ এবং নিজের তালুকদারী স্বত্বকে জমিদারী স্বত্বে রূপান্তরিত করিবার প্রক্রিয়াটি তালুকদারেরা কিভাবে সাধন করিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পরবর্তীকালে বৃটিশ রাজকর্মচারীদের অনুসন্ধানের ফলাফল হইতে জানা যায়।[৩০] তবে বঙ্গদেশে 'তালুক' শব্দটি দ্বারা ক্ষুদ্র জমিদারি বা জমিদার বোঝানো হইত এবং এইসব ক্ষুদ্র জমিদারিগুলি অতি সাম্প্রতিক কালে ক্রয় করা হইয়াছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা ও তাহার সংলগ্ন গ্রামগুলি ক্রয় করিবার সময় যে বিক্রয়-দলিল তৈয়ারি হয় সেই দলিলের ধারাগুলি দেখিলে আমাদের উক্ত অনুমানের সপক্ষে যথেষ্ট সমর্থন মিলিবে। এই বিক্রয়দলিলে কোম্পানীকে তালুকদার বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।[৩১] বঙ্গদেশে তালুককে হুজুরী বা মাজকুরী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। হুজুরী তালুকের রাজস্ব সরাসরি সরকারকে প্রদান করা হইত এবং মাজকুরী তালুকের রাজস্ব জমিদার বা ভূস্বামী, এই ধরনের কোন উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মারফৎ প্রদান করা হইত। উক্ত প্রথম শ্রেণীর তালুকদার, জমিদার অথবা ভূস্বামী-শ্রেণীর সমমর্যাদায় গণ্য হইতেন। যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিলে মাজকুরী তালুক হস্তান্তরিত করা এবং বংশপরম্পরায় ভোগ করা চলিত, কিন্তু উত্তরাধিকারী না থাকিলে ঐ তালুক কোন ঊর্ধ্বতন ভূস্বামীর দখলে চলিয়া যাইত।[৩২]

—দুই—

ভূমি-রাজস্ব (মাল ওয়াজিব) প্রদানকারী জমিদারঃ অনেকে মনে করেন জমিদারশ্রেণীর উপস্থিতি মূলত হিমালয় অঞ্চল, রাজপুতানা, গুজরাট, উড়িষ্যা এবং বেরার ইত্যাদি সাম্রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইঁহারা সামন্ত প্রধান।[৩৩] এই মতবাদে সামন্ত প্রধান ব্যতীত অন্যান্য জমিদারদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি নাই; বরং ইহাতে এই ধারনাই প্রচ্ছন্ন যে, যেখানে সামন্ত প্রধানের অস্তিত্ব নাই সেখানে

সরকার প্রচ্ছন্নভাবে কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এই অস্বীকৃতির মূলে আছে 'আইনের' মুদ্রিত সংস্করণে প্রাদেশিক পরিসংখ্যানের ভ্রান্ত পরিবেশন এবং ইহার ত্রুটিপূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ। ইহার মুদ্রিত ও অনুদিত সংস্করণে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যেন প্রতিটি মহালের তালিকায় জাতের যে উল্লেখ আছে তাহা ঐ মহালের জনসংখ্যারই নির্দেশ। আলিগড় মুসলিম বিদ্যালয়ের মৌলানা আজাদ লাইব্রেরীতে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে [৩৪] সুবা সম্বন্ধীয় যে সব পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত পাণ্ডু-লিপিতে বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র কলম আছে, যথা : জরিপ জমি, দামি, সিয়ারখুল, বামি ও জমিদার। বিভিন্ন মহালের জাতিগুলি জমিদার শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবুল ফজল শুধুমাত্র সেই সব জাতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা নিজ নিজ মহালে জমিদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য যে সকল জাতি ঐ মহালগুলিতে বাস করিতেন তাঁহাদের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। আমাদের এই বিশ্লেষণের সমর্থন নিম্নলিখিত তথ্য হইতে পাওয়া যায়। আলোচ্য ছক্‌গুলিতে যে সব জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়, কয়েকটি ব্যতিক্রম ভিন্ন তাঁহাদের সকলেই উচ্চবর্ণের হিন্দু অথবা মুসলমান, যাঁহারা কদাচ কৃষিকর্মে নিয়োজিত জনসমষ্টির বৃহদংশ ছিলেন না। সুতরাং এ কথা সহজেই বলা যায় যে সাম্রাজ্যের সকল মহালেই—এমন কি কেন্দ্রের নিকটস্থ মহালগুলিতেও—জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। আমরা জানি কয়েকটি অঞ্চলে এক শ্রেণীর জমিদার ছিলেন, যাঁহারা পেশকাশ প্রদান করিতেন এবং অভ্যন্তরীণ শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায় স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ মহালে জমিদার বলিয়া যাঁহাদের উল্লেখ আছে, তাঁহারা পেশকাশী জমিদার ছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। অপরদিকে আকবরের রাজত্বের প্রশাসনিক ইতিহাস সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলের খালিসা ভূমিতে রূপান্তর, পরগনান্তরের রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি সরকারী আদেশ এবং গ্রামকে রাজস্ব পরিমাপের একক ধরিয়া রাজস্ব নিরূপণ ও তাহার সংগ্রহ সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশ হইতে অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে এই সকল মহাল কখনই পেশকাশ প্রদানকারী সামন্ত প্রধান-দের অধীনে ছিল না। এই সব প্রাসঙ্গিক প্রমাণ ব্যতিরেকেও আকবর ও মহম্মদ শাহ্-এর অন্তবর্তী যুগ সম্পর্কে এমন কিছু কিছু সদর্থক সাক্ষ্য আছে যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পেশকাশী জমিদার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক শ্রেণীর জমিদার ছিলেন যাঁহারা উৎপন্ন শস্যের বিস্তারিত নিরিখের উপর ধার্য রাজস্ব মাল-ওয়াজিব বা ভূমি-রাজস্ব হিসাবে প্রদান করিতেন। সর্বাপেক্ষা যে পুরাতন দলিলটি এ বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারে তাহা হইল একটি কবালা। ইহা লিখিত হয় ৯৯৪ হিজরিতে (১৫৮৫ খৃঃ)।[৩৫] এই কবালায় অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত সাণ্ডিলা পরগনার জরহা নামক সমগ্র গ্রামটির ভূস্বত্ব (সাতাহ্‌রি), ১৫৬৮ টাকার বিনিময়ে আধামের পুত্র মিয়া আম্মানের নিকট হস্তান্তরকরণ অনুমোদিত হয়। ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নারায়ণ, আশা, নাথু, ভাক্কন ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির পক্ষ হইতে উক্ত বিক্রয়ের দলিলটি সম্পাদিত হয়। আরও কয়েকটি বিক্রয় কবালা

হইতে দেখা যায় যে, যে সব ভূস্বত্বের হস্তান্তর আইনসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইত, সেগুলি যথাক্রমে বিস্‌ওয়াই, সাতাহ্‌রি জমিদারি এবং মিল্‌কিয়াত স্বত্ব বলিয়া পরিচিত এবং এই সব স্বত্বাধিকারীদের জমিদারই বলা হইত।[৩৬]

ইহা সুবিদিত যে, কলিকাতা সহ তিনটি গ্রামের জমিদারি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে ক্রয় করা হয় এবং ১,১৯৪ টাকার [৩৭] মাল্‌-ওয়াজিব বা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে কোম্পানীকে ওই গ্রামগুলির তালুকদার বলিয়া স্বীকার করা হয়। আজমীর প্রদেশেও এরূপ জমিদার ছিলেন যাহাদের মাল্‌-ওয়াজিব প্রদান করিতে হইত।[৩৮] বিহার প্রদেশে টিকারী, ভোজপুর এবং নামদারখান মিয়ার জমিদারেরা যদিও বড় বড় জমিদার ছিলেন, তবুও তাঁহাদের মাল্‌-ওয়াজিব প্রদান করিতে হইত।[৩৯] 'দস্তুর উল অমাল-ই বেকাস্‌' গ্রন্থের একটি দলিলে সরকার মুরাদাবাদের এক জমিদারের উল্লেখ আছে। যাঁহাকে বিশদ পরিমাপের ভিত্তিতে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে হইত এবং যাঁহার নান্‌কার ও দাহ্‌ইয়াক্‌ নামক কয়েকটি স্বত্ব ভোগ করিবার অধিকার ছিল। বঙ্গদেশ সরকারের দলিলপত্রে জেলাপুর ও ঢাকা প্রদেশে ১৭৬৯-১৭৭০ সালের বন্দোবস্তের (বিলি ব্যবস্থা) যে সব প্রতিলিপি রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে প্রথমতঃ বঙ্গদেশের এই অঞ্চলের জমিদারেরা মাল্‌-ওয়াজিব প্রদান করিতেন। দ্বিতীয়তঃ এইসব দলিলপত্রে বিভিন্ন আয়তনের জমিদারির (যথাঃ একাধিক পরগনা, একটি পরগনা, একটি অথবা একাধিক তালুক অথবা শুধুমাত্র একটি টাপ্পা [৪০] লইয়া গঠিত জমিদারির) উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পেশকাশী জমিদার ব্যতিরেকে অন্য শ্রেণীর জমিদারও ছিলেন এবং আজমীর, দিল্লী, অযোধ্যা, বিহার ও বঙ্গদেশে এই ধরনের জমিদারের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহেই বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ইংরেজী দলিল-পত্রগুলি এই অনুমানের কেবল সমর্থনই করে না, উপরন্তু এইরূপ প্রচুর জমিদারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে।[৪১] অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠান হিসাবে জমিদারির স্বরূপ কি ছিল, তাহা জানিবার জন্য মূল উৎস হিসাবে আমরা ব্যবহার করিয়াছি এলাহাবাদে উত্তর প্রদেশের সরকারী মহাফেজ-খানায় রক্ষিত দলিল-পত্রাদি, আনন্দরাম মুখ্‌লিস্‌ প্রণীত মিরাট-উল্‌-ইস্‌-তিলাহ্‌ পুস্তকে সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য সাবুদ এবং 'দস্তুর উল-আমাল-বেকাস্‌' গ্রন্থ। এইসব প্রামাণ্য দলিলাদির সহিত, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রচিত বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও পুস্তকাদি বিশ্লেষণ করিলে আলোচ্য যুগের জমিদারী প্রথার মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো গঠন করা সম্ভব।

জমিদারি শব্দটির ব্যাখ্যা (সংজ্ঞা)ঃ আনন্দ রাম মুখলিস্‌-এর (যিনি মহম্মদ শাহ এর দরবারে যুক্ত ছিলেন) ব্যাখ্যা অনুসারে, আদিতে জমিদার বলিতে বুঝাইত সেই ব্যক্তিকে যাহার জমিতে অধিকার ছিল, কিন্তু তাঁহার নিজের আমলে জমিদার শব্দে সেই ব্যক্তিকে বোঝাইত যাঁহার কোন গ্রাম বা শহরে নিজস্ব জমি ছিল এবং যিনি কৃষিকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতেন।[৪২] জমির মালিক রাজা অথবা জমিদার, এই প্রশ্নের উত্তরে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে সংকলিত একটি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে প্রাচীনকালে দেশের

সমস্ত অঞ্চলে জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন রাজা এবং জমিদার। তিমুর শাহ্-এর রাজত্বকাল হইতে (ইহার দ্বারা গ্রন্থের রচয়িতা সম্ভবতঃ মোঘল যুগের গোড়া পত্তনির কথা বুঝাইতে চাহিতেছেন) রাজাই জমির মালিক বলিয়া গণ্য হইতেন এবং জমিদার নিয়োগ এবং জমিদারি কাড়িয়া নেওয়ার ক্ষমতা রাজার স্বাধিকার বলিয়া গণ্য করা হইত।

জমিদারের ক্ষমতা ও স্বত্ব কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে কৃষিকার্যে নিয়োজিত কৃষকের উপর তাঁহার দাবির ভিত্তি হইল জমিদারী স্বত্ব, যাহার ফলে তিনি নান্‌কার জমি ভোগ করিতেন। কৃষিকার্যের সম্পাদনায় সাহায্য করিবার পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে এই নান্‌কার দান করা হইত।[৪৩] ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ কর্মচারীদের সুবিধার্থে সংকলিত অপর একটি গ্রন্থে জমিদারের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে জমির দেখাশুনা বা যত্ন যে ব্যক্তি করেন তাঁহাকেই জমিদার বলা হয়।[৪৪] উক্ত গ্রন্থের মতে ইসলামের আবির্ভাবে এই শ্রেণীর ব্যক্তি জমিদার নামে আখ্যাত হয়। একাধিক অংশে ভূসম্পত্তি ভাগ করা হইত এবং প্রত্যেক জমিদারকে একটি সনদ এবং একটি নান্‌কার প্রদান করা হইত। জমিদারকে তাঁহার জমিদারি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইত। কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে এক ব্যক্তির জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া অপর ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করিবার ক্ষমতা রাজার ছিল। তবে সুবাদার অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের এই ক্ষমতা ছিল না। জমিদারকে তাঁহার স্বত্ব ও দস্তুরি[৪৫] বাবদ নান্‌কার[৪৬], সেয়ারচৌথ[৪৭] এবং মালিকানা[৪৮] প্রদান করা হইত।

যে-সকল জমিদার বিশদ হিসাবের ভিত্তিতে রাজস্ব প্রদান করিতেন, তাঁহাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত এক শ্রেণীর জমিদার যাঁহারা পাত্তিদারী, ভাইয়াচারী এবং বিন্যাদারী নামে পরিচিত সহ-উত্তরাধিকারী স্বত্বভুক্ত জমিদারির সহ-অংশীদার ছিলেন।[৪৯] এই ধরনের জমিদারির অস্তিত্ব যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকেও ছিল, তাহার নজির আছে এবং ইংরেজী দলিল হইতে নিছক এই তথ্যই পাওয়া যায় যে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এই সকল জমিদারি এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত হইত কিন্তু এইরূপ জমিদারীর একাধিক অংশীদার থাকিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা একই বংশোদ্ভব। উদাহরণস্বরূপ, সাণ্ডিলাহ্ পরগনার অন্তর্ভুক্ত পাটওয়ারিপুর মইতুন গ্রামের জমিদারী স্বত্ব সাবা, সাহা এবং গোবিন্দী নামক তিন ব্যক্তি ভোগ করিতেন। তাঁহারা উক্ত গ্রামের তাঁহাদের সকল অংশ মাত্র ৫০৮ টাকা ১৩ আনায় বাজিওয়ারী লাল সেন নামক এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করেন।[৫০] ১১৪১ ফসলী (১৭৩৪ খৃঃ অঃ) তারিখের একটি দলিলে বাকার নগর ও পাত্তি সরযূপুর দুইটি গ্রামের সহ-উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট জমিদারী স্বত্বের সকল অংশ বিক্রয়ের উল্লেখ আছে।[৫১] ঠিক একই ভাবে অপর একটি দলিলে দেখা যায় যে, একাধিক সহ-অংশীদার সরকার খয়রাবাদের অন্তর্ভুক্ত সিরা পরগনার সিকন্দরপুর, মাখানপুর ও লোঙ্গিয়া নামক তিনটি গ্রামে তাঁহাদের সহ-উত্তরাধিকারী স্বত্বের অংশ বিক্রয় করিতেছেন।[৫২] দ্বিতীয়ত অপর এক ধরনের জমিদারি ছিল যাহার মালিকানা

কোন একক ব্যক্তি বা পরিবার ভোগ করিতেন। এইরূপ জমিদারি একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত হইত এবং অনেক সময় ইহাকে তালুক বলিয়া চিহ্নিত করা হইত।[৫৩] সরকার মোরাদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ঝাঙ্গরের জমিদার শোভা সিং একাধিক গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ভোগ করিতেন বলিয়া কথিত আছে এবং তিনি নিজ জমিদারিকে তালুক বলিয়াই বর্ণনা করিতেন। সর্বশেষে অপর এক শ্রেণীর বৃহৎ জমিদারি ছিল যাহাদের সীমানা বহুসংখ্যক গ্রাম বা তালুক এবং এক বা একাধিক পরগনা লইয়া গঠিত হইত। বঙ্গদেশে এক বা একাধিক পরগনা অথবা একাধিক তালুক লইয়া গঠিত বৃহৎ জমিদারির প্রচুর নজির আছে।[৫৪] কিন্তু এই প্রদেশেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত সহ-উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট জমিদারির নিদর্শন পাওয়া যায়।[৫৫] একই রূপে বিহার-প্রদেশেও এক বা একাধিক পরগনা লইয়া গঠিত বৃহৎ জমিদারির অস্তিত্ব ছিল।[৫৬] কোন একান্নবর্তী পরিবার পঞ্চাশটি গ্রামের স্বত্ব ভোগ করিতেন, এরূপ সাক্ষ্য 'দুর-উল-উলুম গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই নিবন্ধেই লিখিত আছে যে সরকার সম্ভল্ এর অন্তর্ভুক্ত মা'ডুই পরগনার জমিদারী স্বত্ব মুলচাঁদ ও সাখ্ওয়ান্দ দুই ব্যক্তি (একত্রে) ভোগ করিতেন।[৫৭]

এই শ্রেণীর জমিদারের ন্যায্য অধিকার ও কর্তব্য কর্ম কি ছিল সে বিষয়ে এখন কিছু বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর দলিলপত্রের ভিত্তিতেই গ্রামীণ জমিদারদের দাবি-দাওয়া ও কার্য কি কি ছিল তাহার মূল্য-নিরূপণের চেষ্টা করা হইবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দলিলপত্রের নজির দেখাইবার পিছনে আমাদের যুক্তি এই যে (এবং এই কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি) সমগ্র মোঘল ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় গ্রামীণ জমিদার শ্রেণীর স্থান আইনত প্রায় একই ছিল এবং এই নিরবচ্ছিন্নতার কোন ব্যতিক্রম বর্তমান লেখকের নজরে আসে নাই। ইহা অনস্বীকার্য যে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইজারা প্রথার ব্যাপক প্রচলন যাহার ফলে বহু প্রাচীন জমিদার বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জমিদার শ্রেণীর বিধিসঙ্গত অধিকার, দস্তুরি ও দায়িত্বের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বর্তমান লেখক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

জমিদারের পদ-মর্যাদা : শ্রেণীগতভাবে, ভূমি-রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারের সংখ্যা রাষ্ট্রের ভূমিস্বত্বভোগী অন্যান্য প্রজাদের তুলনায় সর্বাধিক ছিল। তদানীন্তন অবস্থায় বাদশাহী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন অব্যাহত রাখিতে জমিদারশ্রেণী অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সরকার-জমিদার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইত জমিদারের দ্বিবিধ সত্তার ভিত্তিতে; একদিকে তিনি ছিলেন ভূমি-স্বত্বভোগী প্রজা এবং অন্যদিকে তিনি ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী, যে ভূমিকায় তাঁহার দায়িত্ব ছিল সরকারী কর্মচারী নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহ এবং পূর্ণ সাধ্য অনুযায়ী ফলন ফলানো হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করা। মনে হয় আইনের চক্ষে এই দুই সত্তার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্য

স্বীকৃত ছিল। ফলে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকিলেও জমিদারির মালিকানা স্বত্ব হইতে উদ্ভূত দস্তুরি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা চলিত না।[৫৮] বস্তুতঃ উপরোক্ত বিশেষ পদমর্যাদাই তাঁহাকে সাধারণ মধ্যস্বত্বভোগী হইতে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহারই ফলে জমিদারকে সাধারণ জোতদারের পর্যায়ে ফেলা যাইত না এবং জমিদারী প্রথা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাইত। তবে, যেহেতু জমিদারির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আবাদী জমির উপর ধার্য খাজনা সংগ্রহ ও তাহা জমা দিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিতেন, সেইহেতু মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবেও তাঁহাকে গণ্য করা হইত। সমগ্র গ্রামের উপর এককভাবে অথবা বিভিন্ন কৃষকের ব্যক্তিগত জমির উপর পৃথকভাবে ঐ রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারবর্গ জমিদারন-ই-রায়তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অপর এক শ্রেণীর জমিদার পরিচিত ছিলেন জমিদারন-ই-জোরতলব বলিয়া, কারণ ইঁহারা প্রায়শঃই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিত্ব অস্বীকার করিতেন এবং একমাত্র রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের হুমকির দরুনই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতে সম্মত হইতেন। উপসংহারে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে জমিদারকেও কৃষক বলা চলিত, কারণ অন্যান্য কৃষকের মতই শ্রমিক নিয়োগ করিয়া তিনিও জমি চাষ করিতেন এবং ইহারই ফলে যে গ্রামে তিনি বাস করিতেন এবং যে জমি তিনি চাষ করিতেন, সেই গ্রাম ও জমির সঙ্গে তাঁহার সত্তা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকায় ইহাদের সম্পর্কে তাঁহার এক স্থায়ী মমত্ববোধ গড়িয়া উঠিত। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং উহার ফলে জমিতে কোন প্রকার স্বার্থ আছে এরূপ বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা জানিতে হইলে জমিদারের এই কৃষক রূপটির কথা মনে রাখা প্রয়োজন। জমিদার নিছক একজন প্রবাসী ভূস্বামী যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য জমিদারি হইতে জোরজবরদস্তিতে যথাসম্ভব নিঙড়াইয়া নেওয়া, গ্রামীণ জমিদার সম্পর্কে এই ধরনের বিশ্লেষণ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে পারে।

জমিদারের প্রাপ্য এবং উপরিপ্রাপ্য ঃ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে গ্রামীণ জমিদারের প্রধান কর্তব্য ছিল দুটি ঃ নিজস্ব জমিদারির সমস্ত জমিতে চাষের ব্যবস্থা ও নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করা। রাষ্ট্রের প্রতি এই দুটি কর্তব্য পালনের পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁহাকে নান্‌কার অর্থাৎ খোরপোশ বাবদ কিছু চাষের জমি ভোগ করিবার স্বত্ব দেওয়া হইত।[৫৯] বস্তুত ইহাকে মোট সংগৃহীত রাজস্বের উপর দালালি বা পাওনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে এবং এই দালালি বা পাওনা নগদ অথবা জমি প্রদান মারফৎ মিটানো হইত। অন্যত্র কৃষিকার্যের সুষ্ঠু পরিপালনের প্রতিদানে বিঘা প্রতি দুই বিশা জমি প্রদানকে নান্‌কার বলা হইয়াছে এবং কোন কোন প্রদেশে মোট সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ উপরি পাওনা, নান্‌কার বলিয়া ধার্য করা হইত,[৬০] যে জমিতে তাঁহার স্বত্বাধিকার ছিল, সেই জমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত হইলে জমিদার নান্‌কার বাদেও কিছু পাইবার অধিকারী হইতেন। এই স্বত্বাধিকার বাবদ যে আয়[৬১] হইত তাহা মালিকানা[৬২] নামে পরিচিত ছিল। রাজস্ব সংগ্রহ ও তাহা সরকারকে

দিবার কাজে নিযুক্ত থাকিতে রাজী না থাকিলেও জমিদারের বরাদ্দ মালিকানায় অধিকার থাকিত।[৬৩] মালিকানা প্রদানের ধারা এবং মালিকানা হিসাবে মোট আয়ের অংশ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ছিল। কৃষিতে নিযুক্ত মোট জমি বা মোট সংগৃহীত রাজস্বের অথবা মোট উৎপন্ন ফসলের কোন নির্দিষ্ট অনুপাতে ওই মালিকানা ধার্য হইত।[৬৪] উক্ত উপরি পাওনাগুলির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারির স্বত্বাধিকারে বংশগত অধিকার স্বীকৃত হইত এবং জমিদারের অবর্তমানে এই অধিকার তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত হইত।[৬৫] উপসংহারে গ্রামীণ জমিদারের জামদারী স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল এবং বিক্রয়কালে মূল্য নির্ধারিত হইত ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক স্বীকৃত মূল্যে।[৬৬]

জমিদার যুগপৎ জমির মালিক ও আধা সরকারী কর্মচারী (যাহা কোন কোন সময়ে আহিল্‌কার[৬৭] বলিয়া পরিচিত হইত) হিসাবে গণ্য হইতেন এবং জমা অর্থাৎ নির্ধারিত রাজস্ব-দপ্তরে যে হিসাব রক্ষিত থাকত তাহা হইতে জানা যায় যে মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ এই দুইটি খাতে দেখানো হইত ঃ এক, ফতাদারের তহবিলে যে অঙ্ক জমা পড়িত এবং দুই, রাজস্ব নির্ধারণ ও তাহা আদায় করিবার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির পারিশ্রমিক বাবদ যাহা ব্যয় হইত। শেষোক্ত অংশ আক্রাজাত (ব্যয়) বা মাজকুরাত বলিয়া পরিচিত এবং অন্যান্য খরচের মধ্যে জমিদারের প্রাপ্য বা যে পরিমাণ জমিদার ব্যয় করিয়াছেন তাহার হিসাবও ধরা হইত।[৬৮] সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে জমিদারের পাওনা নির্ধারিত রাজস্ব বা জমা হইতে মিটাইয়া দেওয়া হইত। 'রিসালা-ই-জিরাত' পুস্তকে একটি পঙ্‌ক্তি আমাদের উক্ত অনুমান সমর্থন করে।

ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ এক টাকা ধরিয়া উক্ত পুস্তকের লেখক মোট রাজস্ব সরকার, পাটোয়ারী এবং জমিদারের মধ্যে কি হারে বণ্টন করা হইত তাহার একটি হিসাব এইভাবে করিয়াছেন ঃ[৬৯]

(১)	পাটোয়ারী ও তরফদার	০ ১—০
(২)	জমিদার	০—৫—৬
(৩)	রাজকোষে প্রেরিত	০—৯—৬
		১—০—০

আলোচ্য হিসাবে যাহা বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করিয়াই ধরা হইয়াছে জমিদারের অংশ মোট রাজস্বের প্রায় ৩৩% হইবে। তবে দেশের অন্যান্য অংশে (যাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে) জমিদারের প্রাপ্য অঙ্ক ১০% হইতে ২০% মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত।

কর্তব্য ও দায়িত্ব ঃ স্থানীয় রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং বহুবিধ দায়দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। প্রথমত জমিদারির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আবাদী জমিতে চাষ করা হইতেছে কিনা, তাহার উপর লক্ষ্য রাখা জমিদারের দায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হইত।[৭০] কৃষককে স্বেচ্ছায় অথবা প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করিয়া কৃষিকার্যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা জমিদারের ছিল। কৃষকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত

না থাকায়, তদানীন্তন অবস্থায় কৃষককে কৃষিকার্যে নিয়োগ করা সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁহারা কোনমতেই একজন অপরিচিত ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। কিন্তু বংশ পরম্পরায় একই গ্রামে বাস করিবার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় জমিদারের পক্ষে তাঁহার স্বগ্রামবাসীদের, যাঁহাদের সহিত তিনি বিভিন্ন সূত্রে আবদ্ধ অথচ নিবিড় জীবনের অংশীদার, তাঁহাদের স্বার্থ উপেক্ষা করা সম্ভব হইত না।

বস্তুত জমি ও গ্রামের সমৃদ্ধির সঙ্গে জমিদারের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গি ও অপরিহার্যভাবে জড়িত ছিল। গ্রামের সমৃদ্ধি তাঁহার জীবনে আনিত প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য। ইহার সঙ্গে উপরি পাওনা যাহা লাভ হইত, তাহা হইল রায়তের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক কর্মোদ্যোগ। সুতরাং স্থানীয় প্রশাসনিক কার্যে জমিদারের স্থান অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বস্তুতঃ তাঁহার অবদান সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং সেই কারণেই অধিক পরিমাণ জমির কৃষিকার্যে নিয়োজিত করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে রায়তের সহযোগিতা লাভ করা যে জমিদারের কর্তব্য, তাহা প্রায়শঃই তাঁহার গোচরে আনা হইত। তাঁহার অপর এক প্রধান কর্তব্য ছিল মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে ধার্য ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করা ও সরকারী খাজাঞ্চীখানায় তাহা পাঠাইয়া দেওয়া। কৃষক ও সরকার, উভয়ের পক্ষেই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, অথচ জমিদারের নিজের যথেষ্ট লাভ থাকিবে, এরূপ রাজস্ব নির্ধারণ করিতে নিঃসন্দেহেই যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হইত।

উক্ত কর্তব্যকর্মের সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কাজেও জমিদার সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। যথা, কোন দুষ্কৃতকারী বা তস্কর তাঁহার জমিদারিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ হইলে, সেই সম্পর্কে তাঁহাকে খবরাখবর দিতে হইত।[৭১] সামরিক কর্মেও তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত এবং প্রতিবেশী কোন জমিদার রাজস্ব প্রদানে অসম্মত অথবা অন্য কোনরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিলে, বিদ্রোহী হিসাবে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চালান হইত, জমিদারকেও সেই অভিযানে যোগ দিতে হইত।[৭২]

১৮শ শতকের অবস্থা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজস্ব ~~প্রদানকারী জমিদারের অবস্থা~~ মোটেই সুবিধাজনক অথবা নিরাপদ ছিল না। অনেকগুলি গ্রামের মালিকানা যে সব জমিদার ভোগ করিতেন এবং আমিল, জায়গীরদার অথবা ইজারাদারের অত্যাচার প্রত্যাহত করিবার মত যথেষ্ট লোকবল ও শক্তি যাঁহাদের ছিল, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশই ক্ষীয়মান হইয়া উঠিতেছিল এবং রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও রাজপরিষদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় সরকার এতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল যে ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাহাদের যথাযথ আইন সম্মত অধিকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে অপারগ হইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়শঃই রাজধানীর সান্নিধ্যে অবস্থিত অবাধ্য ও উদ্ধত জমিদারের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইত। সুতরাং পরগনা স্তরের সরকারী আইনকানুন লঙ্ঘনকারীদের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাধারণত এই দায়িত্ব আমিল,

জায়গীরদার, ফৌজদার প্রভৃতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব সঙ্গতি অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে তাহাই মানিয়া লইতে হইত। সাধারণত স্থানীয় গোলযোগের সহিত মোকাবিলা করিবার কাজে রাজ্যপরিষৎ কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিত না; আবার স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা উৎপীড়ন করিলেও তাঁহাকে কোন জবাবদিহি করিতে হইত না। এইরূপ পরিবেশে আমিল অথবা ফৌজদার শক্তিশালী জমিদারের উপর উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হইতেন না। অবস্থা চরমে উঠিলে তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ নিজ স্বার্থেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উৎপীড়নের পরিবর্তে শক্তিশালী জমিদারের প্রতি সম্ভ্রম জানানোই যুক্তিযুক্ত মনে করিত। কিন্তু এই উক্তি তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতি ভ্রাতা, অসহায় ক্ষুদ্র জমিদারের (যাঁহারা ঐ শ্রেণীর প্রধান অংশ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত না। পক্ষপাতদুষ্ট কোন আমিল অথবা উৎপীড়িত জায়গীরদারের পক্ষে, জমিদারের ধার্য রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার লোভ সম্বরণ করা সম্ভব হইত না। স্বভাবত গ্রামীণ জমিদার বে-আইনী ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন। নির্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত হারে জমিদার জমির বন্দোবস্ত লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় গ্রামীণ সমাজে অত্যাচারী জমিদারের পদার্পণের পথ সৃষ্ট হইল। কাজেই জমিদারের নিকট দুইটি সংকটময় বিকল্প খোলা থাকিত: বর্ধিত হারে খাজনা দিতে স্বীকৃত হওয়া অথবা যথেচ্ছাচারী ইজারাদারের হাতে তাঁহার গ্রামটি তুলিয়া দেওয়া। এইরূপ বাস্তব অবস্থায় আসন্ন ধ্বংসের ছায়া তাঁহার সর্বাঙ্গে নামিয়া আসিত। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ওই অতিরিক্ত করের বোঝা কৃষকের উপর চাপাইয়া দিতে হইত; ফলে কৃষকের সর্বনাশ হইত, না হয় তিনি ঐ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে জমিদারের গ্রামটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অপরদিকে ইজারাদারদের হস্তে গ্রামটিকে সমর্পণ করিবার ফলে সামান্য মালিকানা স্বত্ব ব্যতীত জমিদারের অন্যান্য সকল প্রকার জীবিকা অর্জনের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইত। এক্ষেত্রেও শেষপর্যন্ত কৃষকদের সর্বনাশ ঘটিত এবং গ্রামটি পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে অধিকাংশ স্বল্প রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারের অবস্থাই এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তদানীন্তনকালের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ জমিদারদের যে মূল্যায়ন আমরা করিয়াছি তাহার সমর্থন 'দস্তুর-উল-অমাল্-ই বেকাস' নামক পুস্তকে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যাদিতেও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সরকার সামভাল-এর অন্তর্ভুক্ত ঝাঙ্গরের জমিদার শোভা সিং ও এক সরকারী কর্মচারীর মধ্যে দুইটি পত্রালাপের উল্লেখ আছে। রাজস্ব প্রদান না করায় শোভা সিংকে পরগনার রাজস্ব আধিকারিক অভিযুক্ত করেন[৭৩] এবং ইহার কারণ হিসাবে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ও সরকারের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইবার হুমকি দেওয়া হয়। ইহার উত্তরে জমিদার এক আবেদনপত্র প্রদান করেন এবং সেই পত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে, সেইগুলি অস্বীকার করিয়া রাজস্ব প্রদান না

করিবার কারণ স্বরূপ বিগত কয়েক বৎসর তাঁহার তালুকে কৃষি উৎপাদনের দুরবস্থার তথা ইজারাদারের উৎপীড়নের কথা উল্লেখ করিয়া পরিশেষে ন্যায্য রাজস্ব হার গঠনের এক প্রস্তাব পেশ করেন। যেহেতু এই আবেদন পত্রের বক্তব্যগুলি আমাদের বিশ্লেষণকে সমর্থন করে, সেইহেতু ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

শোভা সিং তাঁহার আবেদন পত্রে[৭৪] যথেষ্ট জোর দিয়া বলেন যে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সকল সময়েই পূর্ববর্তী হাকিমদের প্রতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যকর্ম এবং নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রদান করিয়া আসিতেছেন।[৭৫] যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তাঁহারা আইন লঙ্ঘনকারী ও উৎপীড়কের বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার উৎপীড়ন হইতে কৃষকদের রক্ষা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ববর্তী আমিলগণ তাঁহাদের এই কর্তব্য পালনে এবং নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট রাজাস্ব প্রদানে সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তৎকালে এই জেলা যথাযথভাবে শাসিত হইত এবং তাহার ফলে এখানে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত। বিগত চার বা পাঁচ বৎসরের মধ্যে সদর হইতে এমন কিছু অনভিজ্ঞ বিত্তশালী জোতদার এই জেলায় আসিয়াছেন, যাঁহারা দেশ বা কৃষকশ্রেণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক রাজস্ব আদায় করিয়া দেশ ও কৃষককুলের সর্বনাশ ডাকিয়া আনা। এই কারণে ইঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যেই শোভা সিং বর্ধিত হারে রাজস্ব দিবার অঙ্গীকার করিয়া জমিদারি ডাকিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী যতদূর সম্ভব তিনি অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া শেষে অপারগ হইয়া, এই প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হন। আলোচ্য আবেদন হইতে মনে হয় যে এই ঘটনার কিছুদিন পরে জোতদারগণ ঐ জেলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান কিন্তু ইত্যবসরে জেলাটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত হয়। ফলে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলি সরজমিনে তদন্ত করিয়া তথায় রাজস্ব-ব্যবস্থার যথাযথ পুনর্বিন্যাস করিবার জন্য আমিল স্বয়ং গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন।

উক্ত আবেদনের বিবরণ অনুযায়ী আমিল স্বয়ং গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন এবং কৃষকের প্রতি সহানুভূতিশীল ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইহার ফলে শোভা সিং পুনরায় তাঁহার তালুকে ফিরিয়া কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদের কৃষিকার্যে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত করেন। জেলায় তৎকালীন দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও তিনি ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তবে, আবেদনে বলা হইয়াছে জমিদার নিজেই যে রাজস্ব দিতে উৎসুক আমিল তাহা বিবেচনা করেন নাই উপরন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির প্ররোচনায় আমিল জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সঙ্কল্প করেন। আবেদনের শেষে জমিদার আমিলকে এই অনুরোধ করেন যে যেন 'মুয়াজনা-ই-দাহসালা' [৭৬] অনুযায়ী নানকার এবং দাহইয়াক [৭৭] বাবদ যাহা বিয়োগ করিবার তাহা করিয়াই তাঁহার তালুকের উপর জমা নির্ধারণ করেন। যদি তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করা হয়, তবে জমিদার

নিজেই আমিলের সঙ্গে দেখা করিতে রাজি আছেন। কিন্তু কিছু স্বার্থপর ও দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় আমিল যদি অনমনীয় ভাব গ্রহণ করেন, তবে জমিদার আলোচ্য পরিস্থিতির সঙ্গে যথাযোগ্য মোকাবিলা করিতে বাধ্য হইবেন। একথা আমিলদের অজানা নয় যে বিনা যুদ্ধে কোন জমিদার তাঁহার পৈত্রিক বসতবাটি পরিত্যাগ করেন না। কারণ, ইহাতে তাঁহার সম্মান হানি হয়। জমিদার তাঁহার পরিস্থিতির যথাযথ বিবরণ পেশ করিয়া এই আশা প্রকাশ করেন যে তাঁহার প্রতি ন্যায্য বিচার করা হইবে।

আলোচ্য আর্জির উপরোক্ত সারাংশ হইতে জানা যায় যে জমিদার তাঁহার দেয় রাজস্ব প্রদান করেন নাই বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অবাধ্যতা বা বিদ্রোহের অভিযোগ আনিবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণের ত্রুটি সংশোধন করিয়া জমিদার যদি রাজস্ব প্রদান করিতে ও আমিলের সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত না হন তবে আমিল তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। জমিদার স্বীকার করেন যে রাজস্ব দেওয়া হয় নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানাইবার চেষ্টা করেন যে তাঁহার উপর অত্যধিক রাজস্বের ভার চাপানো হইয়াছে এবং বিগত কয়েক বৎসর যখন তাঁহার জমিদারি ইজারাদারদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হয় তখন এই রাজস্বের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। নিলামে ইজারাদারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে অপারগ হওয়ায় তিনি রাজস্বের চুক্তি হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। দৃঢ়তার সঙ্গে জমিদার ঘোষণা করেন, যে তাঁহার সঙ্গে চুক্তি করিতে হইলে রাজস্বের হার "মুয়াজানা-ই-দাহ্‌সালা" অনুযায়ী বাঁধিতে হইবে এবং জমিদার হিসাবে তাঁহার সর্বপ্রকার অধিকার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ আমরা ইহাও জানিতে পারি যে ইজারাদারী ব্যবস্থায় ইজারাদার গ্রামের কৃষি ও কৃষকের সর্বনাশ করিয়া এক বা একাধিক অজুহাতে ঘটনাস্থল হইতে সরিয়া পড়িত। আমিল সেই জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে রাজী হইলেন কারণ জমিদার অনেক চেষ্টায় কৃষকদিগকে কৃষিকার্যে পুনরায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্জির বিবরণে ঐ তালুকের যে রাজস্ব-ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং ইহার সাহায্যে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা সম্ভব। প্রথমত আলোচ্য যুগে ইজারাদারীর ভয়াবহ প্রচলন ব্যাপক হওয়ায় জমিদার ও কৃষকশ্রেণীর সর্বনাশ হয় এবং জমি পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত এই তথ্যের সমর্থন উপরোক্ত আর্জি হইতেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত জমিদার সর্বদাই ইজারাদারের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। কারণ, ইজারাদার একদিকে তাঁহার রাজস্ব সরাসরি সংগ্রহের অধিকার হরণ করিবার হুমকি দেখাইতেন এবং অন্যদিকে ইজারাদারের উপস্থিতির সুযোগ লইয়া অধিক রাজস্বে বন্দোবস্ত লইবার জন্য জমিদারকে উৎপীড়ন করা হইত। ইহার ফলে জমিদার এবং তাঁহার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য হয় রাজস্বের ন্যায্য বন্দোবস্তের অঙ্গীকারে সাবেক জমিদারের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করা হইত, অথবা নূতন জমিদার নিয়োগ করা হইত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কৃষিজীবনে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি

বারংবার লক্ষ্য করা যায়। এই অনিষ্টের মূল নিহিত ছিল জায়গীর প্রথার সংকট, যে সংকট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। জায়গীর প্রথার সংকটের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিল ইজারাদারী পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন যাহার দ্বারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় জমিদার ও কৃষক এই দুই শ্রেণী, জমিতে যাহাদের স্বার্থ সর্বাধিক স্থায়ী। ইহার ফলে নিঃসন্দেহে উৎপাদনও হ্রাস পায়।

উপরের আলোচনায় রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারশ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া গেল এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহার সমর্থন পূর্ববর্তী এক লেখকের বিবরণে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই লেখকের রচনা রচিত হয়। জমিদারী প্রথার বিবরণে [৭৮] লেখক বলেন যে পূর্বে সরকারী আধিকারিকগণ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিতেন। ফলে যাহাতে অধিকতর জমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয়, জমিদারগণ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতেন এবং বিনা অভিযোগে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন। কিন্তু লেখকের জীবদ্দশায় স্বল্প পদমর্যাদাসম্পন্ন মনসবদারদিগকে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ও উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয় এবং রাজস্ব প্রশাসন চালাইবার জন্য তাহাদের স্বল্প সংখ্যক সেনাবাহিনী নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া হয়। শক্তিশালী ও বিদ্রোহী জমিদারগণকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে এইরূপ স্বল্প সংখ্যক সেনাবাহিনী অক্ষম ছিল। তাঁহাদের নিজস্ব খরচ চালাইবার জন্য মনসবদারগণ প্রতিবৎসরই রাজস্বের হার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং স্বভাবত ক্ষুদ্র জমিদারবর্গের উপর অত্যাচার চালাইতেন। অন্যদিকে জমিদারগণ অত্যাচার চালাইতেন রায়তের উপর। অত্যাচার চরমে উঠিলে এইসব রায়ত রায়তারী এলাকা ত্যাগ করিয়া সেই সকল জমিদারের জমিদারিতে বসতি স্থাপন করিতেন, যাঁহারা কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের ফলেই নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করিতে সম্মত হইতেন। ইহার ফলে একদিকে সামন্ত-প্রধান ও পেশকাশী জমিদারের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি লোকসংখ্যা ও কৃষিকার্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং অপরদিকে অবাধ্য জমিদারবর্গের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রায়তারী জমিদারশ্রেণী দুর্বল হইয়া ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের কবলে চলিয়া গেল। তাঁহারা রাজস্ব প্রদান করিতে অপারগ হইয়া মিথ্যা অজুহাতের দোহাই দিতে শুরু করিলেন সুতরাং জমিদারী পেশা নিন্দনীয় বা অপমানজনক হইয়া পড়িল।

জমিদারবর্গের নিয়োগ ঃ আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে সকল জমিদার কৃষকের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণের ভিত্তিতে রাজস্ব প্রদান করিতেন, তাঁহারা বংশানুক্রমিক ভাবে জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এইরূপ জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের মাধ্যমেও অর্জন করা যাইত। ইহা ছাড়াও অপর এক শ্রেণীর রাজস্ব প্রদানকারী জমিদার ছিলেন যাঁহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সাধারণত এই ধরনের নিয়োগ সেই সকল এলাকায় করা হইত, যে সকল এলাকায় বংশানুক্রমিক জমিদারবর্গ অবাধ্য ও দুর্দান্ত হইয়া রাজস্ব প্রদান

বন্ধ করিতেন[৭৯]। বিদ্রোহী জমিদারকে বিতাড়িত করিয়া যথাসময়ে ঐ এলাকার রাজস্ব প্রদান করিতে সক্ষম[৮০] এরূপ একজন বাধ্য জমিদার অথবা কোন উপযুক্ত রাজকর্মচারীকে[৮১] জমিদার নিযুক্ত করা হইত। সাধারণত এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সম্মান পাইবার অধিকারী হইতেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত নজরানা প্রদান করিতে হইত[৮২]।

মনে হয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এইরূপ জমিদারকে—যিনি নির্দিষ্ট সম্মানের অধিকারীও ছিলেন—'দাগ' এবং 'তাসিহা' নিয়মাবলীর অধীনে কাজ করিতে হইত, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের এই নিয়মাবলী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত[৮৩]। তবে এইরূপ আহৃত জমিদারি ও সাধারণ জমিদারির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ ছিল। এইগুলির মালিকানা বংশানুক্রমে বর্তাইত না। জমিদারের মৃত্যুর পর নতুন পদপ্রার্থীর নিকট হইতে আবেদন গ্রহণ করা হইত এবং উপযুক্ত নজরানা পাইবার সুযোগ থাকিলে ঐ আবেদন গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়া তাহা করানো হইত[৮৪]।

পাদটীকা

(১) 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস', রঙপুর, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৭৮৬-৮৭, পৃঃ ৩২, ৮২, ৮৩ ; 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস', দিনাজপুর, ১৭৮৬-৮৮, পৃঃ ১৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫ ; 'রেকর্ডস অফ দি গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল', ১৭৬৯-৭০, পৃঃ ৬৮, ৭৮ ; 'রেভিনিউ চীফ্স অফ বিহার', পৃঃ ২২-৩১। 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস', পৃঃ ৫০ক-৫১খ; 'রিয়াজ-উস-সালাতিন', পৃঃ ৩০৫-৩০৬।

(২) 'প্রভিন্সিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ'দি মোগলস্', সারন, পৃঃ ১১৪, ১৩৩, ১৩৬; 'মিরাট-ই-আহ্মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৯৯, ২২৪, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০।

(৩) 'মিরাট-ই-আহ্মদি'—ক্রোড়পত্র, ২৩৯ ; 'ইক্বাল নামা', পৃঃ ১১৯।

(৪) 'তারিখ-ই-শাকির খানি', পৃঃ ২৭ক ; 'মিরাট-ই-আহ্মদি', ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১২৮।

(৫) 'মুন্তখব্-উল-লুবাব'—২ পৃঃ ৭৬৮ ; 'সিয়ার-উল-মতাখ্খিরিন'—পৃঃ ৩০৫।

(৬) মিরাট-ই-আহ্মদি—পৃঃ ১৯০, ১৯২, ২০০, ২০৩, ২০৭। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে সকল গ্রাম, পেশকাশ স্বত্বে জমিদারগণ ভোগ করিতেন সেই সকল গ্রামগুলিকে ঘয়ের আমালি বলা হইয়াছে। বিশেষণটির দ্বারা সেইরূপ জমিদারিকে বোঝানো হইয়াছে, যে জমিদারি হইতে পেশকাশ প্রদান করা হইত। 'আদাব্-ই-আলমগিরি', পৃঃ ১১৯খ-১২০ক দ্রষ্টব্য।

(৭) 'সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন', পৃঃ ৩০৫।

(৮) 'মিরাট-ই-আহ্মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৮৮।

(৯) খিরাজী সরকারের তাৎপর্য হইল, এই সকল সরকারের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ জমির রাজস্ব গ্রামের হিসাবপত্রের ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারণ করা হইত এবং জমার অঙ্ক দাখিলে উল্লিখিত থাকিত। পেশকাশী সরকারগুলি, সেই সকল জমিদারের দখলে থাকিত, যাঁহারা কেবলমাত্র চাপে পড়িয়াই পেশকাশ দিতেন।

(১০) 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৮৮।

(১১) 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৮৮।

(১২) এই বিশেষ ধরনের ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা গুজরাটের সুলতানী আমলের জের হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল। মনে হয়, মুসলমানগণ যখন গুজরাট অধিকার করেন তখন ঐ প্রদেশে কলি ও রাজপুত জাতির সুদৃঢ় উপনিবেশ ছিল। সুলতানী আমলে রাজপুত ও কলিগণ পরাজিত হন এবং তাঁহারা সামরিক সাহায্য ও মালগুজারী বা ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হন। উৎপন্ন ফসলের যে অংশ সরকারের প্রাপ্য ছিল তাহা সংগ্রহ করা হইত এক বিশেষ পদ্ধতিতে। স্থির হয় তাঁহাদের বাসভূমি ও গ্রামের এক-চতুর্থাংশ তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (ইহাকে বান্‌থ্‌ বলা হইত)। তবে বান্‌থ্‌ জমি হইতে তাঁহারা যে আয় করিতেন তাহার একটি নির্দিষ্ট অংশ সেলামি হিসাবে তাঁহাদের দিতে হইত। ফলে, বিভিন্ন আকারের জমিদারির সৃষ্টি হয়, কোনটি গঠিত হয় একটি গ্রাম লইয়া, কোনটি একাধিক গ্রাম আবার কোনটি একটি পরগনা লইয়াও গঠিত হইত। যে সকল জমিদার একাধিক গ্রাম অথবা একটি সম্পূর্ণ পরগনার অধিকারী থাকিতেন তাঁহাদের ইজমি জমিদার বলা হইত, এবং তাঁহাদের সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইত। মনে হয়, আকবর পুরাতন প্রথার প্রচলন রাখিয়াছিলেন এবং পেশকাশ নামে সেলামির পুনঃপ্রচার করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে ইজমি জমিদারগণ সামরিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন এবং পেশকাশ নিজামকে দিতে লাগিলেন। ('মিরাট-ই-আহ্‌মদি', ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২২৪, ২২৫)

(১৩) 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২৩৩।

(১৪) 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২০০, ২০১, ২১০, ২১১, ২১৪।

(১৫) 'রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন—পৃঃ ৩০৫, ৩০৬; 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২০১।

(১৬) 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২০১।

(১৭) একই গ্রন্থে, ক্রোড়পত্র, ১৯১, ১৯২।

(১৮) 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি'—ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৮৮-১৯৮।

(১৯) পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

(২০) অতিরিক্ত, ৬৬০৩ পৃঃ ৫৪খ, ৫৫ক।

(২১) অতিরিক্ত, ৬৬০৩ পৃঃ ৫৪খ, ৫৫ক।

(২২) প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২৩) 'দপ্তর ই-খালিসা'—পৃঃ ৯খ, ১০ক।

(২৪) অতিরিক্ত ১৯, ৫০৪, পৃঃ ১০০ক।

(২৫) 'মেমোয়ারস্‌ অফ্‌ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া'—ম্যালকম্‌, পৃঃ ৫ (পাদটীকা)।

(২৬) এই প্রদেশের তালুকদারি স্বত্বের বিশেষ লক্ষণগুলি সংক্ষেপে আমরা এইভাবে চিহ্নিত করিতে পারি:—

(ক) তালুক এইরূপ একটি সম্পত্তি ছিল, যাহার অধিকারী বিবিধ—ইঁহাদের কেহ ঊর্ধ্বতন কেহ বা অধস্তন। ভূসম্পত্তির লভ্যাংশ দুইদলের মধ্যে ভাগ করা হইত।

(খ) উর্ধ্বতন অধিকারীকে তালুকদার বলা হইত এবং তিনি জমিদারের সম্মতি লইয়া একজন মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রদান করিতেন। এই পদের বিলি-ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সম্রাটেরও ছিল।

(গ) মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে কিছু লভ্যাংশ অথবা দস্তুরি তাঁহার প্রাপ্য ছিল, তবে সাধারণত তালুকদার যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন তাঁহাদের মালিকানা স্বত্ব এবং বংশানুক্রমিক স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না (উইলসনের গ্লসারি দ্রষ্টব্য)। 'গার্ডেন অফ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৩৩ দ্রষ্টব্য।

(২৭) 'সিলেক্শন্স : রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ৮৯।

(২৮) একই গ্রন্থে।

(২৯) অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৫৪খ ৫৫ক।

(৩০) 'সিলেকশন্স : রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ৯১, ১৮৮।

(৩১) অতিরিক্ত ২৪, ০৩৯, পৃঃ ৩৬ ক, খ।

(৩২) 'উইলসন্স গ্লসারি' ; পৃঃ ৪৯৮ ; 'ফিফ্থ্ কমিটি রিপোর্ট', তৃতীয় খণ্ড, 'গ্লসারি টু ফিফ্থ্ রিপোর্ট', পৃঃ ৫১।

(৩৩) 'প্রভিন্সিয়াল এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন অফ দি মোগলস', পৃঃ ১১১-১১৩।

(৩৪) 'আইন-ই-আকবরি', সুলেমান ৬৩৬/১৪ মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী এ. এম. উ, আলিগড়।

(৩৫) 'এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্' ২১৯, ২২৪, ৩৭০, ৩৭৫, ৪১৮, ৪৩৫।

(৩৬) তালুকদার কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হইত। এখানে ইহার দ্বারা সম্প্রতি ক্রীত জমিদারীর অধিকারীকে বোঝাইতেছে এবং এক অর্থে এই অধিকারীর পদমর্যাদা জমিদার হইতে নিকৃষ্ট, কারণ পরোক্ত অধিকারী পৈতৃক-স্বত্বের ভিত্তিতে জমির স্বত্ব ভোগ করিতেন।

(৩৭) অতিরিক্ত ৬৬০৩ পৃঃ ৩৬ ক খ, অতিরিক্ত ২৪০ ; ৩৯ পৃঃ ৩৬, ক খ ; ৩৯ক ও গ।

(৩৮) 'ওয়াকা-ই-সুবা-আজমির', পৃঃ ৮৮, ৮৯ ; এবং পৃঃ ১২, ১৩, ৪৯, ৬১ দ্রষ্টব্য।

(৩৯) 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন', পৃঃ ২৯৩ ; এবং 'রেভিনিউ চিফস্ অফ বিহার', পৃঃ ২২-৩১ দ্রষ্টব্য ; 'মুন্তাখব্-ই-চাবর', 'গুলজার-ই-সুল্জাই', পৃঃ ১০৭খ, ১০৮ক খ।

(৪০) 'বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট রেকর্ড' : পৃঃ ৬৮, ৭৮ এবং 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড', রঙপুর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২, ৪৪, ৬০, ৬১, ৮২, ৮৩, ৮৬, ১০৪ দ্রষ্টব্য ; 'ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস্', দিনাজপুর, পৃঃ ১৭৫ ; একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে টপ্পা গঠিত হইত এবং ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের একক হিসাবে তালুক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ছিল।

(৪১) 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড' : 'ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস্', দিনাজপুর পৃঃ ১৭৫, 'ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস', রঙপুর, পৃঃ ৩২-১০৪ ; 'রেভিনিউ রেকর্ডস', পৃঃ ১৯-২৪, ১১২-১৩৪ ; 'ল্যাণ্ড রেভিনিউ সিস্টেমস্ অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৫৪-১৭০।

(৪২) 'মিরাট-উল্-ইস্তিলাহ্' ; পৃঃ ১২২খ।

(৪৩) অতিরিক্ত ১৯, ৫০৪, পৃঃ ১০০ক।

(৪৪) অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৬৫।

(৪৫) অতিরিক্ত ৬৬০৩ পৃঃ ৬৫ ক।

(৪৬) কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মের জন্য ১০% দস্তুরি, অতিরিক্ত ১৯, ০৫৪, পৃঃ ১০ক।

(৪৭) সেয়ার অথবা অন্যান্য করের খাতে (ভূমি-রাজস্ব ব্যতিরেকে) আদায়াকৃত পরিমাণের ১/২ জমিদারের প্রাপ্যাংশ (অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৬৫ক)।

(৪৮) জমিদারের অধিকারী স্বত্ব বাবদ ১০% নির্দিষ্ট দস্তুরি (এই অধিকারী স্বত্ব নগদ অথবা উৎপন্ন ফসলে নির্ধারিত হইত)। অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৬৫, ৭৭ ক খ; 'রেভিনিউ রেকর্ড্‌স্‌', পৃঃ ৫।

(৪৯) 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-মাহ্‌দি আলিখান', পৃঃ ৫খ; এবং 'ল্যাণ্ড রেভিনিউ সিস্টেমস্‌ অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৬৮-৮৭ দ্রষ্টব্য।

(৫০) 'এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্‌'—৪১৮।

(৫১) 'এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্‌'—২২৪।

(৫২) একই গ্রন্থে, ২২৯ নং, এইরূপ জমিদারিকে তালুকও বলা হইত। অতিরিক্ত ৬৬০৩ পৃঃ ৫৪, ৫৫ দ্রষ্টব্য।

(৫৩) আক্ষরিক অর্থে তালুক বলিতে অধীনতা বুঝাইত; রাজস্ব প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা একটি জমিদারি অথবা একাধিক জমিদার পরিবারের সম্পত্তিভুক্ত একাধিক গ্রামকে বুঝাইত; টপ্পার মত, পরগনা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ভূমি-রাজস্ব পরিচালন এককও তালুক বলিতে বোঝানো হইত।

(৫৪) 'বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট রেকর্ড্‌স্‌'—১৭৬৯-১৭৭০; পৃঃ ৬৮-৯৭; 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড্‌স্‌', দিনাজপুর, দ্বিতীয় খণ্ড—(১৭৮৬-৮৮) পৃঃ ১৭১, ১৮৩।

(৫৫) অতিরিক্ত ২৪৩৯, পৃঃ ৩৯ক ও গ।

(৫৬) 'দুর-উল-উলুম', পৃঃ ৫২খ, ৫৩ক, আমরা দেখিয়াছি যে বিহার প্রদেশে কান্দাহ, মাকসুদপুর, দাউদপুর ইত্যাদি মোট পঞ্চাশটি গ্রামের ফসলও অন্যান্যের হস্তে ছিল।

(৫৭) 'দুর-উল-উলুম', পৃঃ ৪৩ক।

(৫৮) ভূমি-রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অসম্মত থাকিলেও একজন গ্রামীণ জমিদার মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিবার অধিকারী হইতেন। 'রেভিনিউ সিলেক্‌শন্‌স্‌', পৃঃ ৫; 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি,—১ পৃঃ-২৬৮; 'দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-মেহ্‌দি-আলিখান', পৃঃ ৩ক, ৪খ।

(৫৯) অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৭৯খ।

(৬০) অতিরিক্ত ১৯,৫০৪ পৃঃ ১০০ক।

(৬১) মালিকানা স্বত্ব বাবদ জমিদারের প্রাপ্য দু-বিশ্‌ওয়াই এবং দাহ্‌-ইয়াক বলিয়াও পরিচিত ছিল। ইহার দ্বারা বিঘা প্রতি দুই বিশ্‌ওয়া দস্তুরি বুঝান হইত। চাষাবাদে লিপ্ত থাকিলে জমিদার নান্‌কার পাইবার অধিকারী হইতেন, কিন্তু মালিকানা ইত্যাদি পাওনার অধিকারী ছিলেন না। অতিরিক্ত ৬৬০৩ পৃঃ ৫১ক; 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস', পৃঃ ৫২ক দ্রষ্টব্য।

(৬২) অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৫১ক।

(৬৩) 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-মেহ্‌দি-আলিখান', পৃঃ ৩খ, ৪ক।

(৬৪) অতিরিক্ত ৬৬০৩ পৃঃ ৭৯কখ।

(৬৫) 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস', ২২৯, ৪৩৫ নং।

(৬৬) 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস'—৩১৭, ৩১৯ (আকবরের রাজত্বকাল), ৩৭৫, ৪৩৬ (আওরঙ্গজেবের রাজত্ব), ২২৫ (বাহদুর শাহ্ এর রাজত্ব) ; অতিরিক্ত ২৪০৩৯ ; পৃঃ ৩৬ক খ, ৩৯খ এবং গ ; 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস', ২২৪, ২৯৯, ৩৭০, ৪১৮ দ্রষ্টব্য।

(৬৭) 'রিজালা-ই-জিরাত'—৮ক।

(৬৮) 'দস্তুর-উল-অমাল-ই-আলমগিরি', পৃঃ ৪৬খ ; 'সিয়াক্ নামা', পৃঃ ৬১, ৬২।

(৬৯) 'রিজালা-ই-জিরাত', পৃঃ ১১ খ।

(৭০) 'এলাহাবাদ ডকুমেন্টস', ৩১৭,৩১৯ (আকবরের রাজত্ব) ; ৩৭৫, ৪৩৫ (আওরঙ্গজেবের রাজত্ব), ২২৫ (বাহাদুর শাহ্ এর রাজত্ব); অতিরিক্ত ২৪০৩৯ পৃঃ ৩৬ক খ ; ৩৯ক এবং গ।

(৭১) 'ওয়াকা-ই-সুবা-আজমির', পৃঃ ৬৬।

(৭২) 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস্', পৃঃ ৫৬ক খ।

(৭৩) 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস্', পৃঃ ৫০ক-৫১খ।

(৭৪) 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস্', পৃঃ ৫১খ-৫২খ।

(৭৫) হাকিম : একজন সরকারী কর্মচারী ; বিশেষ অর্থে ইহার দ্বারা ফৌজদারকে বুঝাইত, যিনি একই সঙ্গে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন।

(৭৬) 'মুয়াজানা-ই-দাহ্-সালাহ্', অথবা তক্সিন কানুনগোর হাতে থাকিত। কোন পরগনার বিগত দশ বৎসরে কৃষির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার একটি সম্মিলিত বিবরণ ইহাতে থাকিত। নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ ইহাতে থাকিত : গ্রামের সংখ্যা, হাসি জমির পরিমাণ, কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমি, আবাদী, অরণ্য, বাগিচা, নালা, জলাশয় এবং মাদাদ্ মাস ভূমির পরিমাণ ; বিভিন্ন খারিফ ও রবিশস্য এবং প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য ; জমার অঙ্ক, রাজস্ব নির্ধারণের হার এবং বকেয়া পাওনার বিবরণ। ('দস্তুর-উল-অমাল-ই-আলমগিরি'—পৃঃ ৪১ক ; 'ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল'—পৃঃ ১৬৫ ; 'দেওয়ানি পসন্দ', পৃঃ ৭৭ দ্রষ্টব্য)।

(৭৭) মনে হয় দাব্-ইয়াক বলিতে মালিকানা অথবা দু-বিশ্‌ওয়াই অথবা $\frac{১}{১০}$ অংশ বুঝাইত। অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৫১ক দ্রষ্টব্য।

(৭৮) 'হিদায়াত-উল্-কোয়াইদ্', পৃঃ ৬৪খ-৬৬খ।

(৭৯) 'দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস্', পৃঃ ৪৫ক, ৮৮খ, ৮৯ক; 'মিরাট-ই-আহ্মদি'—১, পৃঃ ২৩০।

(৮০) একই গ্রন্থে, পৃঃ ৮৮-৮৯।

(৮১) 'আখ্বরাত্', ৩৮/১৩৭।

(৮২) 'আখ্বরাত্', ৪৪/১৪২।

(৮৩) 'মিরাট-ই-আহ্মদি', ১, পৃঃ ২৮৪, ২৮৫।

(৮৪) 'আখ্বরাত্', ৪৪/১৪২ ; 'আখ্বরাত্', ৩৮/১৩৭।

তৃতীয় অধ্যায়

ভুমি-রাজস্বের দাবি এবং রাজস্ব নিরূপণ পদ্ধতি

—এক—

কৃষকসমাজ এবং রাজস্ব নিরূপণ ও সংগ্রহকর্মে সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেন এবং জমিতেও তাঁহাদের কিছু অনিরূপিত অধিকার থাকিত। গ্রামের অন্তর্ভুক্ত জমি হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহার কিছু অংশের উপর কৃষক, জমিদার, কানুনগো, চৌধুরী ও পাটোয়ারগণের দাবি স্বীকৃত ছিল এবং ইঁহারা তাহা পাইয়া থাকিতেন। এইগুলিকে আমরা আঞ্চলিক স্বত্ব ও অধিকার বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। তবে, জমির ফসলে সম্রাটের দাবি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তাঁহার আমলা ও গোমস্তাদিগের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের একটি বৃহৎ অংশ তিনি আত্মসাৎ করিতেন। আবুল ফজলের মতে পণ্যের একাংশ "প্রভুত্বের পারিশ্রমিক" হিসাবে তিনি আত্মসাৎ করিতেন, কারণ মানুষ যাহাতে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে, তাহার জন্য তাঁহাকে আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইত।[১] বস্তুত প্রভুত্বের অধিকার কেবলমাত্র জমির ফসলের উপর সীমিত ছিল। যে-কোনও প্রকার সম্পত্তি এবং জীবিকার উৎস অথবা পণ্যের উপর কর চাপাইবার বিশেষ ক্ষমতাও রাজচক্রবর্তী প্রয়োগ করিতেন।[২] কৃষি ও গোচারণ-ভূমি, নদী ও পুষ্করিণী হইতে প্রাপ্ত পণ্য, কারিগরী পণ্য ও পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ধার্য বিভিন্ন কর এবং প্রশাসনিক খরচ চালাইবার জন্য ধার্য শুল্কসমূহ যথাক্রমে এই তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল: মাল, জিহাত এবং সায়ের-জিহাত্ অথবা সায়ের-উল্-জিহাত্। প্রশাসনিক ও হিসাবরক্ষকের যে সকল (রাজস্ব সংক্রান্ত) দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত ধারা অনুযায়ী পৃথক পৃথক কর ধার্য করা হইত এবং গ্রামের উপর মোট ভূমি-রাজস্ব বা জামা বলিয়া যাহা ধার্য করা হইত তাহা উক্ত বিভিন্ন করের সমষ্টি।

জামা অথবা ভুমি-রাজস্ব: ১৬ শতক হইতে ১৯ শতকের গোড়ায় বা প্রথম কয় বৎসর পর্যন্ত যে সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে এই সব করের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা হয় এবং ইহার সাহায্যে মোট ভূমি-রাজস্বের ধার্য পরিমাণ কত ছিল তাহা নিরূপণ করা সম্ভব। 'মাল' কথাটি পণ্য হার অথবা মূল্য হার অনুযায়ী কৃষিকার্যে নিয়োজিত জমির উপর আসল যে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত করা হইত, তাহাকেই বলা হইত। এই নির্ধারণে প্রয়োজনীয় খরচ যোগাড় করিবার জন্য যে সকল কর ধার্য করা হইত, সেইগুলি জিহাত্ বলিয়া চিহ্নিত হইত এবং মাল ও জিহাত্ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল কর ধার্য করা হইত সেইগুলি সায়ের-উল্-জিহাত্ অথবা সায়ের-জিহাত্ নামে পরিচিত ছিল। মনে হয় সায়ের-জিহাত্ কথাটি ব্যাপক এবং বিশেষ অর্থেও

ব্যবহৃত হইত। ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইলে, ইহা সায়ের-উল্-ওয়াজের প্রতিশব্দ হিসাবে মাল ও জিহাত্ বাদে একাধিক প্রকার কর বুঝাইত। বিশেষ অর্থে যখন গ্রামের রাজস্ব হিসাবের খাতায় ইহা ব্যবহৃত হইত, তখন ইহা বলিতে কেবলমাত্র সেই সকল করই বুঝাইত, যাহা মাল ও জিহাত্ আদায় করিবার এবং কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য ধার্য করা হইত।[৩] মনে হয়, তালবানা[৪], সাহ্নাগী[৫], টম্পাদারী[৬] ও সাদির-ও-ওয়ারিদ[৭] ইত্যাদি করগুলি ইহাদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণঃ মাল, জিহাত্ এবং সায়ের-জিহাত্ এই তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে সংগৃহীত রাজস্বের মোট সমষ্টির দ্বারা প্রাপ্য ভূমি-রাজস্ব গঠিত হইত। এখন দেখিতে হইবে যে উৎপন্ন ফসলের কত অংশ মোট রাজস্ব খাতে সংগ্রহ করা হইত এবং উক্ত তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন খাতের কোনটিতে কত পরিমাণ কর আদায় করা হইত। আকবরের আমলে মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ আসল রাজস্ব বা মাল হিসাবে ধার্য ছিল।[৮] এতদতিরিক্ত উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ ওয়াজুত (বা জিহাত্) ও সায়ের-জিহাত্ খাতে সংগৃহীত হইত। আইন-ই-আকবরী পুস্তকে সংগৃহীত তথ্য হইতে ইহা অনুমিত হয়।[৯] তবে মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে সরকারের পাওনা বলিয়া যে সব সাক্ষ্য রহিয়াছে, সেইগুলি কেবলমাত্র সেইসব অঞ্চল সম্পর্কেই প্রযোজ্য, যেখানে পণ্য-হারকে মুদ্রা হারে রূপান্তর পদ্ধতির প্রচলন ছিল। অর্থাৎ ইহা সেইসব অঞ্চলকে বুঝাইত যেখানে 'জাব্ত্'এর প্রচলন ছিল। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে যেসব অঞ্চলে নগদ প্রথার প্রচলন ছিল, সেইখানে ভূমি-রাজস্বের দাবি এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইত।[১০] তবে মাল ব্যতীত অন্যান্য খাতে অর্থাৎ জিহাত্ ও সায়ের-জিহাত্-এ উৎপন্ন ফসলের কত অংশ রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হইত তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত তথ্যাদিতে নাই। যে সকল অঞ্চলে নাসাক্[১১], কান্কুট[১২] অথবা ভাওয়ালি[১৩] (শস্যের ভাগাভাগি) সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল, সেই সব অঞ্চলে এই তিনটি খাতে পৃথক ভাবে রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত বলিয়া সরাসরি কোন সাক্ষ্য আমাদের হাতে আসে নাই। তবে আমরা জানি যে কাশ্মীরে যেখানে শস্য ভাগের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল মোট শস্যের অর্ধেক ভাগ রাজস্ব হিসাবে ধার্য ছিল[১৪] এবং আজমীরে ইহার পরিমাণ ছিল মোট শস্যের এক-সপ্তমাংশ বা এক অষ্টমাংশ।[১৫]

আকবরের পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারীর আমলে আলোচ্য বিষয়ের উপর বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যাহার সাহায্যে এই বিষয়টি লইয়া আরও বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এইসব তথ্য তিনটি ধারায় সাজানো যাইতে পারেঃ

(১) জাব্ত্ ভূমির উপর আরোপিত রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্য।

(২) কানকুট ও ভাওয়ালি প্রথায় আরোপিত ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্য।

(৩) ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশ সম্পর্কিত তথ্য।

কয়েকটি হিসাবনিকাশী দস্তাবেজে জাবত্-প্রথার অন্তর্ভুক্ত এলাকার ধার্য রাজস্বের হিসাবনিকাশ পাওয়া যায়। তবে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় 'সাইয়াক্নামা' পুস্তকে লিখিত গণেশপুর গ্রামের রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবনিকাশে। রাজস্ব দাবির পরিমাণ কিরূপ ছিল এবং ফসলের কত অংশ মাল, জিহাত্ ও সায়ের-জিহাত্, এই তিনটি খাতে উস্থল করা হইত তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য আমরা এখানে উক্ত তথ্যটির আলোচনা করিব। পূর্বোক্ত রাজস্ব বিবরণে 'মাল' হিসাবে যাহা নির্ধারিত হইত এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে কত পরিমাণ জমি নিযুক্ত হইত ও বিভিন্ন শস্যের মুদ্রামান কিরূপ ছিল, তাহার হিসাব পাওয়া যায়।[১৬] তবে যেহেতু বিঘাপ্রতি ফলনের কোন হিসাব এখানে নাই, সেই হেতু উৎপন্ন শস্যের কত অংশ 'মাল' বলিয়া লওয়া হইত তাহার হিসাব করা সম্ভব নয়। তাহা সত্ত্বেও আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে আকবরের আমলের মত মোট ফসলের এক-তৃতীয়াংশ মাল হিসাবে সংগৃহীত হইত। আমাদের এই অনুমানের সপক্ষে যুক্তি হইল যে আকবরের উত্তরাধিকারীদের আমলে 'মাল' হিসাবে নির্দিষ্ট অংশের কোন বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছিল, এমন প্রামাণ্য তথ্য আমরা পাই নাই।

হিসাবের খাতা পরীক্ষা কারলে দেখা যায় যে 'মাল' বলিয়া যে পরিমাণ-রাজস্ব দেখানো হইয়াছে তাহার শতকরা ৫ অংশ জিহাত্ খাতে নির্ধারিত হইয়াছে এবং মাল-ও-জিহাত্ বাবদ মোট পরিমাণ যাহা দেখানো হইয়াছে তাহার শতকরা ১৫ অংশ সায়ের-জিহাত্ খাতে নির্ধারিত হইয়াছে।[১৭] ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 'মাল' হিসাবে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হইত, তাহা বাদেও শতকরা ২০ হইতে শতকরা ২১ ভাগের মত রাজস্ব আদায় করা হইত। আমরা অনুমান করিয়াছি যে 'মাল' বলিয়া শস্যের উপর প্রথম যে রাজস্ব ধার্য করা হইত, তাহার পরিমাণ ছিল মোট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ। 'মাল' এর উপর শতকরা ২০ ভাগ হারে অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করিবার অর্থ হইল মোট ভূমি-রাজস্ব পরিমাণ অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের উপর সরকারের দাবি ছিল মোট উৎপন্নের $\frac{২}{৫}$ অংশ অথবা শতকরা ৪০ ভাগ।

ভাওয়ালি বা কান্কুট এলাকার জন্য আমাদের আলোচ্য হিসাবে মাল, জিহাত্ ও সায়ের-জিহাত্ এই তিনটি খাতে রাজস্বের পরিমাণ পৃথক করিয়া দেখানো হয় নাই। ইহাতে শুধুমাত্র সেই মোট উৎপন্নের পরিমাণ এবং তাহাতে সরকার ও রায়তের অংশ দেখানো হইয়াছে।[১৮] মোট উৎপাদন সরকার ও রায়তের মধ্যে সমাহারে বণ্টন করা হইত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, যেসকল এলাকায় শস্য ভাগ অথবা কান্কুট প্রথা চালু ছিল, সেই সকল এলাকায় মোট উৎপন্নের অধিকাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে নির্দিষ্ট হইত। এই অনুমানের সপক্ষে অন্যান্য দলিলপত্রেরও উল্লেখ করা যায়, কারণ এই সকল দলিলে লিখিত আছে যে ভূমি-রাজস্ব এরূপ ভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যে মোট উৎপন্নের অর্ধেক অংশ "সরকার লইবে এবং অপর অর্ধেক অংশ সম্পূর্ণ ভাবে কৃষকের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।"[১৯]

উপরোক্ত সাক্ষ্য হইতে অনুমান করা যায় যে, ফসল ভাগ ও কানকুট প্রথায় সরকারের প্রাপ্য সকল ক্ষেত্রেই মোট উৎপাদনের অর্ধেক অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। তবে সেই সব ফসল-ভাগের[২০] ক্ষেত্রে এই অনুমানের সপক্ষে কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না, যে-সব ক্ষেত্রে ফসল-ভাগের হার জমির উৎপাদনী শক্তি, উৎপন্ন শস্যের প্রকার ভেদ এবং কৃষকের অবস্থার উপর নির্ভর করিত। রসিকদাসের নিকট প্রেরিত ফরমানের একটি ধারায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে সকল গ্রামের কৃষকগণ গরীব ও দুঃস্থ সেখানে ফসল-ভাগের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করা হইবে এবং সেক্ষেত্রে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব হইবে মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ অথবা তাহারও কম।[২১] মহম্মদ শাহের আমলে সংকলিত একটি সরকারী নির্দেশ নামায় উল্লিখিত আছে যে, ফসল-ভাগের ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্বের সর্বনিম্ন হার মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ অথবা তাহা অপেক্ষাও কম পরিমাণে এবং সর্বোচ্চ হার উৎপাদনের অর্ধাংশ পর্যন্ত উঠিতে পারে।[২২] 'তারিখ-ই-সাকির খানিতে' সংরক্ষিত একটি পাট্টায়[২৩] দেখা যায় যে ফসল-ভাগের ক্ষেত্রে কৃষক ও সরকারের অংশ যথাক্রমে তিন-পঞ্চমাংশ ও দুই-পঞ্চমাংশে নির্দিষ্ট ছিল।[২৪] সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়টির উপর যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ফসল ভাগের ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ উৎপন্নের এক-চতুর্থাংশ হইতে অর্ধেক অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত এবং সরকারের প্রাপ্য অংশ কোন নির্দিষ্ট হারে বাঁধা হইত না। সরকার প্রাপ্য-রাজস্ব হারের এই বৈষম্য বিভিন্ন কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেমন জমির উর্বরা, কোন এক বিশেষ শস্য উৎপাদনের জন্য শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণ, জলসেচের সুযোগ-সুবিধা ও কৃষকের সাধারণ আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি। যে সকল অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া ফসল-ভাগ নীতিতে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইত, "মাসিরুল-উমারা" পুস্তকের একটি অনুচ্ছেদে[২৫] তাহার কয়েকটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই পুস্তকে আমরা দেখি যে বাতাই বা ফসল-ভাগের ক্ষেত্রে মুরশিদ কুলী খাঁ তিনটি বিভিন্ন রাজস্ব হারের বিধান দিয়াছিলেন। যে সকল এলাকায় বৃষ্টি ফসল পাকিবার কাজে সাহায্য করে সেই সকল এলাকায় উৎপন্নের অর্ধেক অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। যে সকল এলাকায় কূপের সাহায্যে সেচ কার্য চলিত, সেই সকল এলাকায় উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে সরকারের এবং দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের প্রাপ্য ছিল। তবে যে সকল এলাকায় খালের সাহায্যে জলসেচ হইত সেই সকল এলাকায় রাজস্ব হারের মান ভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারিত হইত। ইক্ষু বা আঙ্গুর জাতীয় পণ্যের জন্য ঐ হার এক-নবমাংশ হইতে এক-চতুর্থাংশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। একদিকে সর্বাধিক উর্বর জমির ক্ষেত্রে—যেখানে অল্প পুঁজি ও শ্রমে কৃষিকার্য সম্পাদিত হইত—উৎপন্নের অর্ধেক অংশ রাজস্বের হার হিসাবে নির্দিষ্ট হইত, অপরদিকে যেসকল জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করিতে হইত, সেই সকল এলাকার জন্য রাজস্ব অপেক্ষাকৃত স্বল্প হারে নির্ধারিত হইত। ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণে কৃষকের আর্থিক অবস্থার বিচারও করা হইত।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র ফসল-ভাগ প্রথার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল না। বস্তুত রাজস্ব-ধার্যের অন্যান্য সকল প্রণালীর ক্ষেত্রেই এই নিয়মাবলী কার্যকর হইত। এই অনুমানের সপক্ষে আমরা সাক্ষ্য পাইতেছি কয়েকটি সাধারণ নিয়মাবলী হইতে। উৎপন্নের কি পরিমাণ অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গণ্য করা হইবে, উক্ত নিয়মাবলীতে তাহার নির্দেশ আছে। এই বিষয়টির উপর সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ও স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় 'মিরাট-ই-আহ্‌মদি' পুস্তকে উল্লিখিত একটি ফরমানে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বলবৎ করার উদ্দেশ্যেই এই ফরমানের বিধিগুলি রচিত হইয়াছিল, এবং ইহাদের বয়ান ছিল এমন যাহাতে ভূমি-রাজস্ব নিরূপণ ও সংগ্রহে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা যায়। সেইজন্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে যথোচিত বিধিগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সরকারের প্রাপ্য অংশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। বিধিগুলিতে নির্দেশিত আছে যে, ভূমি-রাজস্বের দাবির সর্বোচ্চ পরিমাণ মোট উৎপন্নের অর্ধেক রাখিতে হইবে এবং কোন অবস্থাতেই তাহা অর্ধেকের বেশী হইতে পারিবে না। যে সকল এলাকায় ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকাংশ অতিক্রম করিয়াছে, সেই সকল স্থানে উহা কমাইতে হইবে। বস্তুতঃ কৃষকের রাজস্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা অনুযায়ী ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নীতি নির্ধারিত হইত।[২৬] ইহাও বলা হইয়াছে যে স্থানীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হইবে এবং কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে ভূমি-রাজস্বের প্রচলিত হার যতদূর সম্ভব বজায় রাখিতে হইবে। যে সকল অঞ্চলে কৃষকেরা দুঃস্থ ও কর্মহীন সেই সকল অঞ্চলে পাল্লাহ্-বখ্‌লি বা ফসল ভাগের প্রচলন দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে সত্যসত্যই স্থানীয় পরিবেশের উপর যথাযথ নজর দেওয়া হইত। এই সকল অঞ্চলে রাজস্বের হার অপেক্ষাকৃত কম ধার্য করা হইয়াছিল এবং এই দাবি এক তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেকাংশের মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।[২৭]

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, প্রথমতঃ বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ও কৃষির অবস্থা অনুযায়ী ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইত এবং এই পরিমাণের অঙ্ক এক-চতুর্থাংশ হইতে অর্ধেকাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। দ্বিতীয়ত, অর্ধাংশ হারই সর্বনিম্ন নয়, সর্বাধিক বলিয়া গণ্য হইত। তৃতীয়ত, ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করিবার সময় সাধারণত স্থানীয় কৃষি-অবস্থা ও কৃষকের রাজস্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা বিচার করিয়া দেখা হইত। যে ক্ষেত্রে রাজস্ব বৃদ্ধি করিলে কৃষকের ভূমি হইতে উৎক্ষিপ্ত ও কৃষিকার্যের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইত, সেইরূপ রাজস্ব বৃদ্ধি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হইত।[২৮]

নিগার-নামা-ই-মুন্সি ও দস্তুর উল অমাল-ই-বেকাস-এর কয়েকটি সাক্ষ্য আমাদের উক্ত অনুমানগুলি সম্পর্কে কিছু সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে। দুইটি পুঁথিতে বারংবার বলা হইয়াছে যে ভূমি-রাজস্ব এরূপ ভাবে ধার্য করিতে হইবে যাহাতে উৎপন্নের অর্ধেকাংশ সরকারের প্রাপ্য বলিয়া সংগ্রহ করা যায় এবং বাকি অর্ধেকাংশ সম্পূর্ণভাবে কৃষকের হস্তে থাকিয়া যায়।[২৯] এই সাক্ষ্য হইতে মনে

হইতে পারে যে রাজস্ব দাবির পরিমাণ উৎপন্নের অর্ধেকাংশ বলিয়া সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। আমরা উল্লিখিত পঙক্তিগুলিতে যথেষ্ট বিশদভাবে দেখাইয়াছি যে মোঘল যুগে কোন এক সুনির্দিষ্ট হারে ভূমি-রাজস্ব ধার্য করা হয় নাই, তাহা হইলে উপরোক্ত দুইটি পুঁথিতে যে সাক্ষ্য রহিয়াছে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? নিগার-নামা-ই-মুন্সি গ্রন্থে যে সাক্ষ্য আছে, তাহা হইল রাজকুমাররা যে জায়গীর ভোগ করিতেন, তাঁহাদের কর্মচারীবৃন্দ সেইসব জায়গীরের কর আদায়ের জন্য যে হুকুমজারি করিতেন, সাধারণভাবে সেই হুকুমনামাই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই হুকুমনামা কেবলমাত্র সেই কয়েকটি অঞ্চলের ক্ষেত্রেই নিবন্ধ ছিল, যেগুলি রাজকুমারগণ জায়গীর হিসাবে ভোগ করিতেন। এই অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব সাম্রাজ্যের কোন অংশে নিবন্ধ ছিল, আলোচ্য সাক্ষ্যে তাহার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। তবে আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই অঞ্চলগুলি কৃষিকার্যে যথেষ্ট উন্নত ও উর্বর ছিল। কাজে কাজেই উৎপন্নের অর্ধেকাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে দাবি করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। দ্বিতীয় যে বিষয়টির উপর আমাদের আলোচনা করা দরকার তাহা হইল, ভূমি-রাজস্বের হার উৎপন্নের অর্ধেকাংশ বলিতে কি বোঝানো হইত? উহা কি সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন হার বলিয়া গণ্য হইত? এই পুঁথির একটি অনুচ্ছেদে বিষয়টির পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে মোট উৎপন্নের অর্ধেকাংশ ভূমি-রাজস্বের সর্বোচ্চ হার বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন অবস্থাতেই রাজস্বের হার এই মাত্রা অতিক্রম করিতে পারিবে না।[৩০]

দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস পুঁথির সাক্ষ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে এই সাক্ষ্য মুরাদাবাদের 'সরকার' অন্তর্ভুক্ত জায়গীর-ভূমি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। উর্বরতার জন্য এই অঞ্চল ছিল বিখ্যাত এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহা এক অতি সমৃদ্ধশালী অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইত। সেইজন্যই এই অঞ্চলে ভূমি-রাজস্বের হার সর্বাধিক মাত্রায়, অর্থাৎ মোট উৎপন্নের অর্ধেকাংশ, নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল।

অতএব উল্লিখিত পুঁথিগুলিতে যে নিয়মাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইগুলি কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের সকল অংশেই প্রযোজ্য হইবে ভূমি-রাজস্বের এইরূপ কোন সাধারণ নিয়মাবলীর উল্লেখ এই পুঁথিগুলিতে নাই। দ্বিতীয়ত, ভূমি-রাজস্বের সর্বোচ্চ হার মোট উৎপন্নের অর্ধেকাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

সমসাময়িক কালের পুঁথিপত্রে আমরা যে সব প্রাসঙ্গিক তথ্য পাইয়াছি, তাহাদের আলোচনা এইখানেই শেষ করা হইতেছে। আমাদের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে জাব্‌ত্‌ প্রথায়, উৎপন্নের দুই-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ৪০ হারে মোট ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করা হইত। ফসল ভাগ এবং কান্‌কুট প্রথায় ভূমি-রাজস্বের সর্বোচ্চ হার মোট উৎপন্নের অর্ধেকাংশ হিসাবে দাবি করা হইত। সর্বনিম্ন হারের মান বিভিন্নভাবে এক-নবমাংশ, এক-চতুর্থাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৩১] ভূমি-রাজস্ব হারের এই তারতম্যের বিবিধ কারণ ছিল; যথা জমির উর্বরতার মান, কোন শস্যের উৎপাদন হয়, জলসেচের

প্রয়োজনীয়তা, শস্য উৎপাদনে কি পরিমাণে পুঁজি ও শ্রম প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সাধারণভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা। তবে ভূমি-রাজস্ব দাবির প্রকৃত চাপ প্রধানতঃ নির্ভর করিত আলোচ্য যুগে সাধারণভাবে রাজস্ব ধার্যের যে পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল তাহার উপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে সমগ্র একটি গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টির উপর রাজস্ব ধার্য করা হইত এবং ভূমি-রাজস্ব প্রদানের চুক্তি জমিদার ও তালুকদারবর্গের সহিত সম্পাদিত হইত। প্রাপ্য তথ্য হইতে দেখা যায় যে ভূমি-রাজস্বের কোন নির্ধারিত চুক্তিতে পৌঁছাইবার পূর্বে রাজস্ব নির্ধারক কর্মচারী ও জমিদার পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইবার কৌশলে লিপ্ত থাকিতেন এবং সময় বিশেষে বিবাদী পক্ষের দর কষাকষি করিবার শক্তির উপর রাজস্ব দাবির পরিমাণ নির্ভর করিত। সুতরাং ভূমি-রাজস্বের প্রকৃত বোঝা কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করিবার পূর্বে রাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতির যে উল্লেখ আমাদের আলোচ্য পুঁথিগুলিতে পাওয়া যায়, সেইগুলির যথাযথ অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন।

—দুই—

রাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতিঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল বিবরণ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে আলোচ্য যুগের রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রায় কোন তথ্যই নাই। সমসাময়িক কালের একমাত্র পুস্তক যাহাতে এই বিষয়ের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা হইল দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১১৪৪ হিঃ/১৭৩১—৩২ খৃঃ মুরাদাবাদ-স্মাভাল জেলার জওহর মল্ বেকাস কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। বৃটিশ কর্মচারীদের সুবিধার্থে ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের প্রথম যুগে যে সকল রিপোর্ট ও কাগজপত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে আকবরের সময় হইতে রাজস্ব নির্ধারণের প্রথা হিসাবে নাসাক, জব্‌ত্, কান্‌কুট এবং ভাওয়ালি, এই কয়েকটি অতি পরিচিত প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ইহাদের কয়েকটি প্রথা উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত থাকিয়া গিয়াছিল। তবে যে সকল অঞ্চলে ইহাদের প্রচলন ছিল, কালক্রমে সেই সকল অঞ্চলের আয়তন যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টাইয়া যায়। তৎকালীন যুগের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং আওরঙ্গজেবের আমলে রাজস্ব পরিচালন পদ্ধতির কয়েকটি নূতন ধারার প্রবর্তনের জন্যই অনেকাংশে উক্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। জায়গীর প্রথার ক্রম বিলোপের সহিত ইজারা পদ্ধতির বহুল প্রচলনের ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থায় পুরানো আমলের রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি অচল হইয়া পড়ে।

হস্ত্-ও-বুদ্ঃ জ্যেষ্ঠ মোঘলদিগের আমলে হস্ত্-ও-বুদ্ নামে পরিচিত রাজস্ব ধার্যের পদ্ধতি সুপরিচিত ছিল। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন শস্যের প্রকৃত পরিমাণ পরিদর্শন করিয়া সেই ভিত্তিতে আসল ফসল কিরূপ হইতে পারে তাহা

অনুমান করা হইত।[৩২] দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস গ্রন্থে হস্ত্-ও-বুদ্ এর যে সংজ্ঞা আছে তাহা ফারহাঙ্গী-ই-কারদানী পুস্তকের বর্ণনার সহিত অভিন্ন। দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস-এর মতে এই পদ্ধতিতে রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারী উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া চৌধুরী ও কানুনগোদিগের পরামর্শানুযায়ী 'জামা' নির্ধারণ করিতেন।[৩৩] পরবর্তীকালের একটি পুঁথিতে এই শব্দটির সংজ্ঞা মুহম্মদ ইয়াসিন দিয়াছিলেন। এই লেখকের মতে, প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটির দ্বারা কৃষিকার্যে নিয়োজিত মোট জমির ক্ষেত্রফলের পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুযায়ী রাজস্ব ধার্যই বুঝাইত। হালের সংখ্যা অথবা কি পরিমাণ জমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া 'জামা' নিরূপণের যে পদ্ধতি আলোচ্য পদ্ধতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।[৩৪] মনে হয় অত্যাচারী রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীগণ ফসল উঠিবার পূর্বেই জমিতে যে সকল ক্ষয়ক্ষতি হইতে পারে অথবা যে সকল জমিতে কর্ষণের কাজ সম্পন্ন হইলেও ফসল বোনা হয় নাই অথবা পতিত থাকা আবাদী জমির কোনরূপ হিসাবনিকাশ না করিয়াই জমিদার অথবা কৃষকের নামে চিহ্নিত সমস্ত আবাদী জমির উপর রাজস্ব ধার্য করিতেন। এইসব ক্ষেত্রে জমিদার প্রকৃত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া রাজস্ব নির্ধারণ করিবার দাবি জানাইতে পারিতেন।[৩৫] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তিনটি আকর গ্রন্থের সাক্ষ্য হস্ত্-ও-বুদ্ পদ্ধতি সম্পর্কে একই মত প্রকাশ করিয়াছে। হস্ত্-ও-বুদ্ বলিতে কি পরিমাণ জমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত আছে অথবা কৃষক বা জমিদারের নামে কি পরিমাণ জমি চিহ্নিত আছে, তাহার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ না করিয়া, প্রকৃত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের অনুসন্ধান করিয়া তাহার উপর রাজস্ব নির্ধারণ করাকেই বুঝাইত। দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস গ্রন্থে একথাও বলা হইয়াছে যে প্রকৃতই কি পরিমাণ জমির উপর ফলন হইয়াছে, তাহা সঠিক নিরূপণের পর 'জামার' পরিমাণ হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা হইত। রাজস্ব ধার্যের এই পদ্ধতি জোত জমির মালিকদিগের প্রতি পক্ষপাতবিহীন সুবিচার করিত তাহার প্রমাণ জমিদার নিজেই এই পদ্ধতিতে রাজস্ব নির্ধারণ করিবার আগ্রহ জানাইতেন। রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীর রাজস্ব নিরূপণের কাজটিও এই পদ্ধতি মারফৎ অপেক্ষাকৃত সহজ ও ঝঞ্ঝাট মুক্ত হইয়া উঠিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও ইহার মারফৎ জমি জরিপের ব্যয় সাপেক্ষ ঝামেলা হইতে মুক্তি পাইতেন। কিন্তু এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা গুণ যাহা ছিল তাহা হইল এই যে, ইহা জমিদার ও রায়তকে লোভী ও স্বার্থপর রাজস্ব-নির্ণায়ক কর্মচারীগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিত। ইহা পরোক্ষভাবে সরকারের স্বার্থও রক্ষা করিত, কারণ কৃষকশ্রেণী সুখী ও সমৃদ্ধিশালী থাকিলে আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইত এবং তাহার ফলে সাম্রাজ্যের রাজস্ব-অঙ্কও বৃদ্ধি পাইত। বস্তুতঃ দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস-এর গ্রন্থকার বিভিন্ন রাজস্ব-নির্ধারণ পদ্ধতির উপর লিখিত অধ্যায়টি শেষ করিয়া ভবিষ্যতের কৃতী 'আমিল'এর প্রতি কয়েকটি উপদেশ দিবার কালে উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। 'আমিল'কে তিনি এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার নিজ স্বার্থেই কৃষক সমাজ যাহাতে সুখী ও

সমৃদ্ধশালী থাকে তাহা দেখা উচিৎ এবং তাহা করিবার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ হইল হস্ত্-ও-বূদ্ পদ্ধতির প্রচলন করা। কারণ ইহাই রাজস্ব ধার্যের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি।[৩৬]

সুতরাং 'আমিল'কে হস্ত্-ও-বূদ্ পদ্ধতি মারফৎ সমগ্র পরগনার রাজস্ব নির্ধারণ ও ফার্দ-ই-চৌসান নামক দলিল তৈয়ারি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[৩৭] তবে রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারী কি পরিমাণে তাহার ক্ষমতা সরকারী স্বার্থ বিরোধী কর্মে অথবা নিজস্ব স্বার্থে নিয়োগ করিত, তাহা অনুমান করা শক্ত।

কানকূটঃ রাজস্ব নির্ধারণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হইল কান্কূট প্রথা এবং কোন কারণে রায়ত হস্ত্-ও-বূদ্ প্রথায় স্বীকৃত না হইলে প্রথম বিকল্প হিসাবে এই কান্কূট প্রথার সুযোগই তাহাকে দেওয়া হইত। আকবর বা আওরঙ্গজেবের আমলে অন্ততঃ যে ভাবে দেখা গিয়াছে সেইভাবে বলিতে গেলে, এই প্রথায় ফসল বোনা জমির মোট পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া সেই অনুপাতে মোট উৎপন্নের অঙ্ক নিরূপণ করা হইত। জব্ত্-ই-কানকূট-এর খসড়ায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল ঃ

(১) আসামী বা কৃষকের নাম,
(২) জমির দৈর্ঘ্য,
(৩) জমির প্রস্থ,
(৪) কৃষিতে নিযুক্ত জমির মোট আয়তন,
(৫) ক্ষতিগ্রস্ত শস্য উৎপাদনের জমির আয়তন,
(৬) উদ্বৃত্ত জমির (যাহাতে প্রকৃত ফলন হইয়াছে) আয়তন,
(৭) বিভিন্ন শস্য উৎপাদিত জমির আয়তন।[৩৮]

মনে হয়, মোট কি পরিমাণ জমিতে শস্য ফলনশীল এবং স্থানীয় বিঘা বা বিশা প্রতি ফলনের পরিমাণ মনে রাখিয়াই একজন কৃষকের ব্যক্তিগত জোত জমির উৎপাদন কত তাহা অনুমান করা হইত। যে ক্ষেত্রে জামা অন্যায়ভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া কৃষক অভিযোগ করিতেন[৩৯] সেই ক্ষেত্রে উৎপন্নের কিছু নমুনা ওজন করিয়া তাহাতে কি পরিমাণ শস্য আছে তাহা দেখা হইত। ফলনশীল জমির এক বিশা 'আমিল'কে এবং অপর এক বিশা কৃষককে বাছিয়া লইতে হইত। এই দুই বিশা হইতে উৎপন্ন শস্য কাটিয়া মাড়িয়া লওয়া হইত। পরে এই শস্য ওজন করা হইত এবং নির্ধারিত ফলনশীল জমির মোট উৎপাদনও হিসাব করা হইত। এইভাবে মোট উৎপন্নের যে হিসাব পাওয়া যাইত তাহার ভিত্তিতেই রাজস্ব পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হইত।[৪০] 'খেয়াত্'[৪১] দলিলে যে সকল দফার উল্লেখ থাকিত তাহাদের ভিত্তিতেই 'জমাবন্দী'র হিসাব তৈয়ারি করিতে হইত। শস্যের হিসাবে ধার্য জামা প্রচলিত মুদ্রার হারে নগদে রূপান্তরিত হইত এবং প্রতিটি আসামীর উপর ধার্য রাজস্বের অংশ তাহার নামের পাশে দেখানো হইত।[৪২] সুতরাং জব্ত্ ও কান্কূট, উভয় প্রথাতেই ফলনশীল জমির জরিপ এবং জমাবন্দী তৈয়ারি করিবার সময় নগদ হারের প্রয়োগ করা হইত। উভয় প্রথাতেই রাজস্বের পরিমাণ নগদহারে দেখানো হইত। এই দুই প্রথার মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ ছিল তাহা হইল

কানকুট প্রথায় সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষ বিঘা প্রতি ফলনের পরিমাণ সম্পর্কে পারস্পরিক মতৈক্যে উপনীত হইতেন অথবা নমুনা হিসাবে কয়েক বিশা জমির উৎপন্ন শস্য ওজন করিয়া লওয়া হইত। অর্থাৎ কানকুট প্রথায় মোটামুটি ভাবে প্রকৃত উৎপন্নের উপর রাজস্ব নির্ধারিত হইত এবং শস্যের ক্ষতি হইলে রাষ্ট্র এবং কৃষক সমভাবে সেই ক্ষতির অংশীদার হইতেন। কিন্তু জবত্ প্রথায়, বিঘা প্রতি গড় ফলনের তালিকার ভিত্তিতে আনুমানিক ও সম্ভাব্য ফসলের উপর রাজস্ব ধার্য করা হইত। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে ফসলের গুরুতর ক্ষতি হইলে, নির্ধারিত রাজস্ব হইতে কিছু ছাড় অনুমোদন করা হইত ; তবে যথোপযুক্ত সেচের অভাব, নিম্নমানের বীজ অথবা প্রয়োজনের তুলনায় নিরেস জমি, ইত্যাদি কারণে গড় ফলনের তুলনায় যথেষ্ট কম ফলন হইলে এই প্রথায় রাজস্ব ছাড় দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং দৃশ্যতঃ কানকুট প্রথায় কৃষকদের সুবিধা হইত। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে জবত্ ও কানকুট প্রথার মধ্যে কোনটির প্রচলন হইবে তাহা নিরূপণের পূর্বে রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারী ও জমিদারবর্গ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যথেষ্ট দর কষাকষি চলিত। তৎকালীন যুগের রাজস্ব-নির্দেশনামা গুলিতে রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীদের প্রতি সকল সময় এই নির্দেশ থাকিত যে তাঁহারা যেন রাজস্ব প্রদানকারীদের যে কোন একটি রাজস্ব ধার্যের প্রথা বাছিয়া লইতে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু সরেজমিনে যে সকল কর্মচারী কাজ করিতেন তাঁহারা রাজস্ব মন্ত্রকের নির্দেশ কতটা মানিয়া চলিতেন তাহা সঠিক জানা যায় না।

ভাওয়ালি : রাজস্ব-ধার্যের তৃতীয় প্রথা 'ভাওয়ালি' নামে পরিচিত। এই প্রথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন নির্ধারিত হারে শস্য ভাগ করিয়া লইতে সম্মত থাকিতেন। 'ভাওয়ালি' বন্দোবস্ত 'খুসাবাতাই' ও 'ঘাল্লাবাতাই' এই দুই ভাবে করা চলিত। খুসাবাতাই প্রথায় শস্যের আঁটি ১/২, ১/৩, ১/৪ অথবা ১/৫ ভাগ সরকার এবং কৃষকের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইত, এবং এইভাবে খসড়াও তৈয়ারি করা হইত। 'ঘাল্লা ভাওয়ালি' অথবা ইহার হিন্দী সংস্করণ 'চুণার বাটাই' প্রথায় বাস্তবিকই শস্যের ভাগ বাঁটোয়ারা করা হইত।[৪৩]

খসরা-ই-ভাওয়ালি পত্রে নিম্নলিখিত ফর্দগুলির উল্লেখ থাকিত :[৪৪]

(১)	আসামীর নাম	(৫)	মোট উৎপাদন
(২)	জমির দৈর্ঘ্য	(৬)	রায়তের অংশ
(৩)	জমির প্রস্থ	(৭)	সরকারের অংশ
(৪)	মোট আয়তন	(৮)	মোট ব্যয়

মনে হয়, কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিবার পরই শস্য ভাগ করা হইত[৪৫] এবং সেই ভাবেই জমাবন্দী তৈয়ারি করা হইত। এমন দৃষ্টান্ত আছে যে, কৃষকের অনুরোধে ভাওয়ালি প্রথা, বৎসরের প্রথম হইতেই কার্যকর করা চলিত। এইরূপ ক্ষেত্রে পাট্টা-ই-ভাওয়ালিও অনুরূপ ভাবে লিখিত হইত এবং তাহা কৃষকের নিকট দেওয়া হইত। ইহাতে বলা হইত যে উল্লিখিত গ্রামের মোকাদ্দাম, রায়ত ও কৃষকদের অনুরোধে বিগত বৎসরের নিরূপিত জমার ভিত্তিতে রাজস্ব

ধার্য করা যাইতেছে, তবে ইহার সঙ্গে এই শর্তও আরোপিত হইতেছে যে শস্য পাকিলে নির্ধারিত শর্ত সম্পূর্ণভাবে পালিত হইবে।[৪৬] ভাওয়ালি প্রথার প্রতি সরকারী মনোভাব অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই প্রচলিত বাক্যটিতে ঃ "বাট্টাই লুটাই আস্ত"[৪৭] অর্থাৎ "ভাগ-বলিতে লুঠই বোঝায়" (অবশ্য কৃষকের ক্ষেত্রে)। ভাগের কাজে যথেষ্ট সতর্কতা ও অবিরাম তদারকির প্রয়োজন থাকায় কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হইত এবং সম্ভবত এই ব্যয় সরকার ও কৃষক, উভয়েই আংশিক ভাবে বহন করিতেন। ফলে সরকারের মোট প্রাপ্য রাজস্ব কমিয়া যাইত। তাহা ছাড়া, স্থানীয় কর্মচারীবৃন্দের যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও প্রকৃত শস্যভাগের পূর্বে উৎপন্নের কিছু অংশ বেহাত হইত। এই কারণে উক্ত বাক্যটির যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে হয় এবং বোঝা যায় কেন সরকার ভাগ করিবার পদ্ধতিটি পারতপক্ষে গ্রহণ করিতেন না। এই পদ্ধতি চালু করিবার আগ্রহ কৃষকদের মধ্যেই বেশী দেখা যাইত এবং সাধারণ ভাবে, কৃষকদের এই আবেদন পূরণ করা রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীর কর্তব্য ছিল। তবে, বাস্তব ক্ষেত্রে অন্যরূপ পদ্ধতি চালু করিবার মত অবারিত ক্ষমতাও উক্ত কর্মচারীর থাকিত এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগের সপক্ষে তাঁহার যুক্তি হইত যে ইহাতে সরকারের রাজস্ব হ্রাস পাইতে বাধ্য।

আমল-ই-খেওয়াত ঃ রাজস্ব নির্ধারণের এই পদ্ধতি অনুসারে জরিপের সাহায্যে আবাদী জমির পরিমাণ স্থির করা এবং মুন্তা খাব[৪৮] দলিল তৈয়ারি করা হইত। সমগ্র পরগনার 'খেওয়াত-ই-আজনাস' ভিত্তিতে জমাবন্দী তৈয়ারি করা হইত।[৪৯] 'খেওয়াত-ই-আজনাস' কথাটির অর্থ খুব স্পষ্ট নহে। তবে মনে হয় ইহা এক প্রকার দলিল যাহাতে শস্যের পরিমাণ অথবা খাজনার হার নিরূপণের অঙ্ক উল্লিখিত থাকিত।[৫০] এই অনুমান যদি সঠিক হয় তবে ধরিতে হইবে যে, খেওয়াত বলিয়া পরিচিত রাজস্ব নিরূপণের পদ্ধতিটি জব্‌ত্‌ পদ্ধতিরই অপর একটি রূপ। মুন্তাখাব দলিল হইতে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত জোত-জমার পরিবর্তে সমগ্র গ্রামের উপরই রাজস্ব ধার্য করা হইত।

আমল-ই-জিন্‌সি ঃ এই পদ্ধতিতে শস্য মাড়াই করিবার জমিতে যত শস্য জমা হইত, তাহার উপর সরাসরি রাজস্ব ধার্য করা হইত। রাজস্বের পরিমাণ রায়তের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত থাকিত এবং উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে রাজস্ব আদায় করা হইত।[৫১]

সরবাস্তা ঃ মনে হয় এই পদ্ধতিতে সরাসরি রাজস্বের পরিমাণ নিরূপিত হইত এবং রাজস্ব-নির্ণায়ক কর্মচারী সমগ্র পরগনার উপর সরাসরি রাজস্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে না বলিয়া ইহার নিয়মাবলীতে নির্দেশ থাকিত। কোন কারণে তাহা করা হইলে বিভিন্ন গ্রামের ওপর আরোপিত 'জামা', চৌধুরী অথবা কানুনগোদিগের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল।[৫২] ইহার কারণ হিসাবে মূল পুঁথিতে[৫৩] বলা হইয়াছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীগণ তাঁহাদের নিজস্ব গ্রামের সমস্ত আয়কর তাঁহারা স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন।[৫৪] তবে কোন একটি বিশেষ গ্রামের উপর সরাসরি রাজস্ব নির্ধারণ করিবার বিপক্ষে কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে গ্রাম-প্রতি

অথবা পরগনা-প্রতি সরাসরি রাজস্ব নির্ধারণ প্রথার প্রচলন ছিল, তবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহেই অনুমোদন করিতেন না।

তস্‌খিস্‌-ই-নক্‌দি ঃ আকবরের আমলে নক্‌দি বলিতে এককালীন ধার্য রাজস্ব বুঝাইত এবং ইহা নগদ মুদ্রাতেই আদায় করা হইত। আলোচ্য পঙক্তিতে নিঃসন্দেহে ইহার দ্বারা রাজস্ব নির্ধারণের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝানো হইতেছে। আলোচ্য যুগে নক্‌দি প্রথা এতই পরিচিত ছিল যে ইহার বিশদ বিবরণ অপ্রয়োজনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, যে অধ্যায়ে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে, সেই অধ্যায়ে জব্‌ত্‌ প্রথার কোন উল্লেখ নাই। নক্‌দি কথাটির ব্যাখ্যার জন্য আমাদের অন্যান্য পুঁথিপত্র দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ ১৯ শতকের প্রথম যুগের একটি পুঁথিতে নক্‌দি কথাটির ব্যাখ্যা আছে। এই পুঁথিতে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, নক্‌দি হইল রাজস্ব নির্ধারণের এক বিশেষ পদ্ধতি। এই প্রথায় আবাদী জমির পরিমাণ, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কৃষি উৎপাদন হইতেছে তাহার অনুসন্ধান, এবং মুদ্রাহারের সঠিক মান নির্ণয় করিবার জন্য প্রচলিত দ্রব্য মূল্যের তালিকা বিশ্লেষণ করা হইত। ১৯ শতকের প্রথম যুগের একটি দলিলে 'নক্‌দি'র যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে জব্‌ত্‌ প্রথারই অপর এক নাম ছিল 'নক্‌দি'। ইহা সেই ভাওয়ালি প্রথারই প্রতিরূপ, যে প্রথায় রাজস্ব সংগৃহীত হইত নগদ মুদ্রায়।[৫৫]

বিভিন্ন রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত তথ্য উপরে দেওয়া হইল, তাহার পরিপূরক হিসাবে ১৯ শতকের প্রথম যুগে সংকলিত দেওয়ান-ই-পসন্দ-এর সাক্ষ্য আমরা এইখানে উল্লেখ করিতে পারি। ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত এই পুস্তকে জব্‌ত্‌ ও ভাওয়ালি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে এমন আর একটি প্রথার উল্লেখ আছে যাহার বিবরণ পড়িয়া বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে তাহা স্পষ্টতঃই নাসাক্‌ প্রথা। খুলাসাত উস্‌-সিয়াক্‌ পুস্তকে জব্‌ত্‌, কান্‌কুট ও ভাওয়ালি প্রথার খসড়া যেরূপ বিশদভাবে লিখিত হইয়াছিল, এই পুস্তকেও তাহাই করা হইয়াছে। দেওয়ান-ই-পসন্দ পুস্তকে আলোচ্য গ্রামটির সিয়াহা-ই-তক্‌শীস্‌ তালিকা পুনঃ প্রদর্শন করাইবার পূর্বে যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির কাজ কিরূপে চলিত তাহা বুঝা যায়।[৫৬] কৃষির অবস্থা ও রাজস্বপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল করিবার উদ্দেশ্যে লেখক বলিয়াছেন যে একটি গ্রামের ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত (আক্ষরিক অর্থে, কার্যাবলী) জমিদারগণের সহিত করা হইত। 'জামা' তৈয়ারি করিবার সময় রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীকে আবাদী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া তাহার মুস্তাখাব, অর্থাৎ প্রত্যেক শস্য মোট কত পরিমাণ জমিতে বপন করা হইত তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈয়ারি করিয়া তাহার ভিত্তিতেই 'জামা' বন্দীর (খাজনা ফর্দ) হিসাব ও প্রস্তুতি নির্ধারণ করিতে হইত।[৫৭], জমিদারগণ সমগ্র গ্রামের উপর ধার্য 'জামা' মানিয়া লইতেন এবং লিখিত চুক্তির (কাবুলিয়ত) মাধ্যমে ঐ হারে রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত থাকিতেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে যে রাজস্ব নির্ধারণ নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে, মনে হয়

তাহা সমগ্র গ্রামের উপর নির্ধারিত জব্‌ত্‌ প্রথা এবং ইহা জমিদারের সঙ্গেই সম্পাদিত হইত। মনে হয়, অন্য এক প্রকারেও জব্‌ত্‌ প্রথা আরোপিত হইত। এই পদ্ধতিতে 'খসড়া-ই-খাতাবন্দী'র (প্রত্যেক কৃষকের হাতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের জন্য কি পরিমাণ জমি থাকিত, তাহার হিসাবনামা) ভিত্তিতে প্রতিটি কৃষকের ব্যক্তিগত জোত-জমার উপর পৃথক ভাবে রাজস্ব নির্ধারিত হইত। এই প্রথাকে 'অমাল-ই-খাস' বলা হইত। এই প্রথায় কৃষকের ব্যক্তিগত জোত-জমার উপর রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত এবং তাঁহার কাছ হইতে সরাসরি রাজস্ব উসুল করা হইত। এই প্রথা তখনই চালু করা হইত, যখন জমিদারগণ জব্‌ত্‌ প্রথা মানিতে অস্বীকার করিতেন অথবা রায়তের নিকট হইতে রাজস্ব উসুল করিতে অপারগ বলিয়া জানাইতেন। তবে, রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারিগণ যদি মনে করিতেন যে এই দুই রাজস্ব প্রথার প্রচলনে জমিদারগণের সর্বনাশ হইবে অথবা যদি জমিদারগণ জানাইতেন যে এই পদ্ধতি তাঁহাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটাইবে, তবে তৃতীয় কোন রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির সাহায্য লওয়া চলিত। এই নূতন প্রথায়, সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তৈয়ারী চলতি বৎসরের সম্ভাব্য জমা, বিগত বৎসরের বাকি আদায়, বিগত দশ বৎসরের সংখ্যানুপাতিক জমার হিসাব, এবং গ্রাম সংক্রান্ত সকল তথ্যের কাণ্ডারী কানুনগো ইত্যাদির মতে সম্ভাব্য জমার অঙ্ক, এই সব তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামের উপর রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত। এই রাজস্বের বন্দোবস্ত জমিদারগণের সহিত করা হইত এবং জমিদারগণকে নির্ধারিত জমা স্বীকার করিয়া সেই হারে সরকারকে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব প্রদান করিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতে হইত। এই ধরনের পদ্ধতি দুই বা তিন বৎসরের জন্য কার্যকর হইত। বিলি-চুক্তি (পাট্টা) জমিদারের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইত। অপরদিকে জমিদারও অঙ্গীকার পত্র (কাবুলিয়ত্‌) দাখিল করিতেন।[৫৮] উল্লিখিত রাজস্ব-নির্ধারণ পদ্ধতির সম্যক বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জ্যেষ্ঠ মোঘলগণের আমলে নাস্‌ক বলিয়া যে রাজস্ব-নির্ধারণ প্রথার প্রচলন হইয়াছিল, তাহার মূল উপাদানগুলি ঐ প্রথায় নিহিত ছিল। 'দেওয়ান-ই-পসন্দ্‌' পুঁথিতে যে রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির উল্লেখ আছে, তাহা নাস্‌ক প্রথার মতই বিগত দশ বৎসরের দলিলপত্রাদি এবং পূর্ববর্তী সালের দেনা-পাওনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে এই বন্দোবস্ত সাধারণতঃ মুকাদ্দাম ও জমিদারদিগের সহিত করা চলিত এবং তাহা করাও হইত। কিন্তু ইহার মেয়াদ সকল সময়ই এক বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত। 'দেওয়ান-ই-পসন্দ' পুঁথির উল্লিখিত রাজস্ব পদ্ধতির মেয়াদ দুই বা তিন বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত। সুতরাং এই বন্দোবস্তকে বাৎসরিকের পরিবর্তে সাময়িক বলা চলে। 'দেওয়ান-ই-পসন্দ' পুঁথিতে রাজস্ব নির্ধারণের তৃতীয় যে পদ্ধতির বিবরণ আছে তাহাকে নাসাক্‌ প্রথা বলা চলে এই অর্থে, যে পূর্ববর্তী দলিলের ভিত্তিতে এই প্রথার চুক্তিও জমিদারগণের সহিত করা হইত, আবার নাসাক্‌-এর সহিত ইহার এই প্রভেদ ছিল, ইহার মেয়াদ বাৎসরিক না হইয়া সাময়িক হইত। সুতরাং ধরা যাইতে পারে 'দেওয়ান-ই-পসন্দ্‌' পুঁথির এই রাজস্ব নির্ধারণ-পদ্ধতি

নাসাক্ প্রথারই এক রূপান্তর এবং উক্ত প্রথাই ইংরাজ আমলের সাময়িক ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

১৮ শতক ও ১৯ শতকের বিভিন্ন পুঁথিপত্রে যে সকল বিভিন্ন রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির বিবরণ আছে তাহাদের পুনরুল্লেখ এইখানেই শেষ করা হইতেছে। ১৭৮৮ খৃঃ লিখিত এবং 'বৃটিশ মিউজিয়াম'এ রক্ষিত একটি স্মারকলিপি হইতেও বিভিন্ন রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির আঞ্চলিক বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ভূমির পরিমাপের বিভিন্ন একক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল ভূমি-রাজস্ব-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, এই স্মারকলিপিতে তাহার বিবরণ আছে।[৫৯] ইহাতে বলা হইয়াছে যে অযোধ্যা প্রদেশে এক বিঘার পরিমাপ একাধিক হারে করা হইত এবং রায়তের উপর বিঘা প্রতি রাজস্ব ধার্য করা হইত। এই তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে অযোধ্যায় জব্‌ত্ প্রথার সর্বাধিক প্রচলন ছিল।[৬০] বোধহয় এলাহাবাদ প্রদেশেও জব্‌ত্ সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। পাঞ্জাবের জমিদার অধিকৃত অঞ্চলে 'খাল্লাবখ্‌সী' প্রথায় রাজস্ব নিরূপিত হইত এবং মোট উৎপন্নের অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ জমিদারের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যে সকল অঞ্চল রাজার অধীনে ছিল, সেই সকল অঞ্চলে জব্‌ত্ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং বিঘার পরিমাপ ৬০ × ৬০ গজ বলিয়া গণ্য হইত। পরিমাপ সম্পন্ন হইলে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব নির্ধারণ ও তাহা সংগ্রহ করা হইত। শাজাহানাবাদ প্রদেশে পরিমাপ ও শস্য ভাগ প্রথা একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধহয় এবং মোট উৎপন্নের অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ সরকারের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

১৭৭৭ সালে লিখিত একটি রিপোর্টে প্রাক্-বৃটিশ যুগে বঙ্গদেশের ভূমি-রাজস্ব-পরিচালন[৬১] পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে বিহারের অধিকাংশ মহালে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব ধার্য করা হইত। প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া ইজারা প্রদান করা হইত, এবং ঐ রাজস্ব প্রচলিত প্রথায় আবওয়াব সহ আদায় করা হইত।[৬২] কোন কোন গ্রামে কান্‌কুট প্রথার প্রচলন ছিল এবং আমিন, ইজারাদার ও জমিদারগণের মারফৎ রাজস্ব আদায় করা হইত।

যে সকল তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইল তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জব্‌ত্, কান্‌কুট, খাল্লাবখ্‌সী ইত্যাদি রাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল। আবার একই সঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম কয়েকটি নূতন রাজস্ব নির্ধারণ প্রথার পরিচয় পাই, যথা সর্বাস্ত, অমাল-ই-খেওয়াত, অমাল-ই-জিন্‌সী এবং অপর একটি প্রথা যাহাকে নাসাক্ প্রথারই ভিন্ন একটি রূপ বলিয়া গণ্য করা যায়। রাজস্ব নির্ধারণের এই প্রথাগুলি হয়ত ১৬শ ও ১৭শ শতকে প্রচলিত ছিল, কিন্তু দলিলপত্রে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই। এই প্রথাগুলি হয়ত কোন কোন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেইজন্য কেন্দ্রে রচিত নথিপত্রে ইহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাও হইতে পারে যে পরবর্তী যুগের পরিবর্তিত কৃষি অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, ১৭শ শতকের শেষ চতুর্থাংশে ও ১৮শ শতকের প্রথমার্ধে এই প্রথাগুলি রচিত হয়। এইখানে

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, যদিও হস্ত্-ও-বুদ্ প্রথা জ্যেষ্ঠ মোঘলদিগের আমলে বিশেষ পরিচিত ছিল না, তা সত্ত্বেও কয়েকটি অঞ্চলে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বস্তুতঃ ইহা রাজস্ব নির্ধারণ প্রথার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া অনুমোদিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইত যে তাঁহারা যেন, কৃষক ও জমিদারগণকে, যে সকল রাজস্ব নির্ধারণ প্রথা সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাদের যে কোনটি বাছিয়া লইবার সুযোগ দিতে কুণ্ঠিত না হয়। বিভিন্ন আদেশনামায় এই অনুমানের সপক্ষেই তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই সকল আদেশনামার সাক্ষ্যকে বাস্তব প্রয়োগ অপেক্ষা তত্ত্বের প্রতি অধিকতর প্রবণতার লক্ষণ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। কৃষক বা জমিদারের কোন বিশেষ রাজস্ব-নির্ধারণের প্রথা বাছিয়া লইবার ব্যক্তিগত অধিকার, স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রচলিত রাজস্ব প্রথার দ্বারা ব্যাহত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত। কোন অঞ্চলে কোন্ রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে তাহা অনেকাংশেই রাজস্ব নির্ণায়ক কর্মচারীর অবারিত ক্ষমতার দ্বারা নির্ণীত হইত। তৃতীয়তঃ, আমরা দেখিতে পাই যে জমাবন্দী দুইভাবে তৈয়ার করা চলিত ঃ 'মুস্তাখাব' এর ভিত্তিতে (যে দলিলে প্রত্যেকটি শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাপ দেখানো হইত) এবং এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রামের উপর রাজস্ব ধার্য করিয়া জমিদারের নিকট হইতে তাহা আদায় করা হইত। অন্যভাবে, 'খসড়া-ই-হাতাবন্দী'র (এই দলিলে বিভিন্ন শস্য উৎপাদক জমির পরিমাপ ও বিভিন্ন শস্য-উৎপাদক জমির কত অংশ কৃষকের ব্যক্তিগত জোত-জমা, তাহার উল্লেখ থাকিত) ভিত্তিতে জমাবন্দী নির্ধারণ করিয়া কৃষকগণের নিকট হইতে ব্যক্তিগত হারে রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত। অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রামের উপর এককালীন রাজস্ব ধার্য করা হইত এবং অপর ক্ষেত্রে তাহা করা হইত প্রতিটি কৃষকের ব্যক্তিগত জোত-জমার উপর। মনে হয়, প্রথম প্রথাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং দ্বিতীয় প্রথাটিকে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ জমিদারগণের নিকট হইতে অথবা তাঁহাদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হইত। যে ক্ষেত্রে রায়তের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া জমিদার স্বীকার করিতেন, এবং ধার্য ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিতেন, সেই ক্ষেত্রে জমাবন্দীর (যে হিসাবে প্রতি কৃষকের উপর একক ভাবে ধার্য রাজস্বের পরিমাণ উল্লিখিত থাকিত) ভিত্তিতে প্রতিটি কৃষকের নিকট হইতে পৃথক ভাবে রাজস্ব আদায় করা হইত। অতএব, গ্রাম-ভিত্তিক রাজস্ব ধার্য এবং জমিদারের নিকট হইতে অথবা তাঁহার মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করাই ছিল প্রচলিত রীতি। গ্রাম-ভিত্তিক রাজস্ব ধার্য করা যে সাধারণ রীতি ছিল তাহার সপক্ষে স্বল্প কিছু তথ্য আওরঙ্গজেব ও মহম্মদ শাহ্-এর রাজত্বে লিখিত কয়েকটি দলিলপত্রে পাওয়া যায়। এইসব দলিলপত্রে দেখা যায় যে রাজস্ব ধার্যের একক ছিল গ্রাম এবং জমিদার ও মোকাদ্দামগণ ধার্য রাজস্ব ও তাহা সরকারী কোষাগারে পাঠাইতে লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন।[৬৩]

এখন দেখিতে হইবে যে ধার্য-রাজস্বের বিশদ বিবরণ প্রতি বৎসর সরেজমিনে

তৈয়ারি করা হইত, না আবাদী-ভূমির পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ও উর্বরতা নিয়ামক উপাদানগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া লিপিবদ্ধ জমার নিছক পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা তাহা স্থির করা হইত। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিভিন্ন পুঁথিপত্রের যে সকল পরিচ্ছেদে রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির আলোচনা আছে, সেই পরিচ্ছেদগুলিতে সাধারণ ভাবে এই নির্দেশের কথা বলা আছে যে রাজস্ব-নির্ণায়ক কর্মচারী স্বয়ং বৎসরের প্রথমে গ্রামের প্রতিটি কৃষিক্ষেত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন এবং রাজস্ব-নির্ধারণ কার্যকলাপ তদারক ও বাৎসরিক জমা নির্দিষ্ট করিবেন। তবে 'খুলাসাত-উস্-সিয়াদ' ও 'দেওয়ান-ই-পসন্দ' পুঁথিতে যে তথ্য আছে তাহা হইতে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী দলিলাদির ভিত্তিতেই সাধারণতঃ জামা ধার্য করা হইত এবং রাজস্বের প্রকৃত বিশদ নির্ধারণ তখনই করা হইত যখন জমিদার অথবা কৃষক ঐরূপ দাবি করিতেন।

রাজস্বপ্রদানের প্রণালী ঃ আকবরের রাজত্বকালে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব সংগ্রহ করিবার প্রথাটি সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু আমিনের প্রতি আদেশ ছিল যে, কোন কারণে কৃষক নগদ মুদ্রায় রাজস্ব প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে নির্দিষ্ট কিস্তি দিবার সময় হইলে কৃষকেরা যাহাতে নগদ মুদ্রায় উহা প্রদান করেন, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইত এবং নগদ মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানের প্রবণতা প্রশ্রয় পাইত।[৬৪] রাজস্ব বাবদ যে শস্য পাওয়া যাইত তাহা কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে সেই সম্বন্ধে দলিলপত্রে কোন সুপারিশ না থাকায় মনে হয় যে শস্য বিনিময়ে রাজস্ব গ্রহণের পদ্ধতি অতি অল্প ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল এবং সেই কারণেই এই সম্পর্কে কোন সাধারণ নিয়মাবলী রচিত হয় নাই। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষাংশে ও তাহার পরবর্তী যুগে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই অনুমান দৃঢ় হয় যে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে সাধারণভাবে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানের প্রণালী প্রচলিত ছিল। প্রশাসনিক পুঁথিপত্রে রাজস্ব নির্ধারণের যে সকল হিসাব নিকাশের খসড়া আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, যে সকল অঞ্চলে কান্‌কুট ও ভাওয়ালি প্রথার প্রচলন ছিল, সেই সকল অঞ্চলেও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব শস্যের হারে নির্ধারিত হইলেও ঐ পরিমাণ নগদ মুদ্রার বিনিময়ে স্থির করা হইত।[৬৫] 'দেওয়ান-ই-পসন্দ্' এর লেখকের মতে ভাওয়ালি প্রথায় প্রতিটি কৃষকের উপর নির্ধারিত রাজস্ব শস্যের হারে নিরূপণ করা হইত বটে, কিন্তু তাহা নগদ মুদ্রার বিনিময়ে সংগ্রহ করিয়া শস্য কৃষকের হস্তেই সমর্পণ করা হইত।[৬৬] একইভাবে তদানীন্তন যুগের রাজস্ব প্রশাসনিক পুঁথিপত্রে মুকাদ্দাম, জমিদার ও চৌধুরীগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্রের যে সকল খসড়া পাওয়া যায় তাহাতেও দেখা যায় যে নগদ মুদ্রাতেই ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত এবং স্বাক্ষরকারীগণ চুক্তির নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিতেন।[৬৭] 'খুলাসাত-উস্-সিয়াক্' এর একটি উদ্ধৃতি অনুসারে ফিরতাপুর পরগনার অন্তর্ভুক্ত আওরঙ্গ-সাহপুর গ্রামের জন্য রাজস্ব ধার্য হইয়াছিল ৫২৫ টাকা এবং একটি লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়া মুকাদ্দাম ইজারা দলিলে স্বীকৃত অর্থ প্রদান

করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।[৬৮] ১৮ শতকের শেষার্ধে রচিত অপর একটি পুস্তকে দেখা যায় যে পাঞ্জাবের যে সকল অঞ্চল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই সকল অঞ্চলে পরিমাপ-প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইজারা-দলিলে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ যে ভাবে নগদ মূল্যের হারে লিখিত থাকিত, আমিল তাহা সেইভাবেই সংগ্রহ করিতেন।[৬৯]

সুতরাং প্রাপ্য সাক্ষ্য হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব-প্রদান-প্রথাই সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল। তবে স্থানীয় রীতি-নীতি ও প্রথা অনুযায়ী এবং কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রচলিত কৃষি-ব্যবস্থার ফলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত এবং সেই সকল ক্ষেত্রে শস্যের হারে রাজস্ব প্রদানের সম্ভাবনাকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া চলে না।

নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বৎসরে চার অথবা ছয়টি কিস্তিতে দেওয়া হইত এবং প্রতি কিস্তিতে কি পরিমাণে দিতে হইবে তাহা লিখিত চুক্তি এবং ইজারা দলিলেও বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকিত।[৭০]

পাদটীকা

(১) আইন-ই-আকবরি : II—পৃঃ ২০৫।

(২) ঐ গ্রন্থ : পৃঃ ২০৫।

(৩) বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'পরিশিষ্ট গ' দ্রষ্টব্য।
আইন-ই-আকবরি : II—পৃঃ ২০৫ ; খুলাসত্-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ১৩ খ, ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৪ খ, ৩৭ ক ; সিয়াকনামা, পৃঃ ৩৩, ৩৪, ৬২-৬৪, ৭৮, ৭৯ ; দস্তুর-উল্-অমাল-ই-মজুমলাই, পৃঃ ২৮ খ, ২৯ ক, খ, ৩০ ক, ৬৪ ক, খ, ৪৭ ক ; ফিফ্থ্ কমিটি রিপোর্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৪২, পৃঃ ২৬০ ; দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ২৯ খ, ৩০ ক ; মস্তখব-ই-চাহার গুলজার-ই-সুজাই, পৃঃ ৯৪ খ।

(৪) তলবানা : ভূমি-রাজস্ব প্রদানের পরওয়ানা যাহারা বহন করিত, খোরাকি বাবদ তাহাদের প্রাপ্য অর্থ।

(৫) সাহনাগি : শস্য রক্ষকের কর্মে নিযুক্ত সাহনাগণের প্রাপ্য মজুরী বাবদ সংগৃহীত কর।

(৬) টপ্পাদারী : টপ্পার রাজস্ব-আধিকারিকের দস্তুরি।

(৭) সাদির-ও-ওয়ারিদ্ : পর্যটক, তীর্থযাত্রী ও আগন্তুক হিসাবে যাঁহারা গ্রাম পরিদর্শনে আসিতেন তাঁহাদের অভ্যর্থনা বাবদ যে দস্তুরি সংগৃহীত হইত।

(৮) আইন-ই-আকবরি : পৃঃ ২০৫।

(৯) আইন-ই-আকবরি : II—পৃঃ ২০৫।

(১০) মোরল্যাণ্ডের অভিমতে আকবরের আমলে মোট উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বিধি নির্দিষ্ট রাজস্বের পরিমাণ হিসাবে স্বীকৃত ছিল।

(১১) পূর্ববর্তী যুগের দলিলপত্রের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট রাজস্ব নিরূপণের একটি পদ্ধতি।

(১২) রাজস্ব নিরূপণের একটি পদ্ধতি, যাহা জমির পরিমাপ ও বিঘা প্রতি উৎপাদনের হিসাবে মোট উৎপন্ন শস্যের হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইত।

(১৩) নালা-বখ্‌সি ও বাতাই হিসাবেও পরিচিত এবং ইহা রাজস্ব নিরূপণের একটি পদ্ধতি, যাহা উৎপন্ন শস্যের প্রকৃত বিভাজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত।

(১৪) আইন-ই-আকবরি-II, পৃঃ ১৭৫, ১৭৬।

(১৫) আইন-ই-আকবরি-II, পৃঃ ১২৮।

(১৬) সিয়াক-নামা, পৃঃ ৩৪। হিসাব সংক্রান্ত নথিপত্রে ধার্য মাল রাজস্বের হিসাব এইরূপে দেখানো হইয়াছে:

খারিফ শস্যের ক্ষেত্রে: মুদ্রাহারে মাল রাজস্ব	রবিশস্যের ক্ষেত্রে: মুদ্রাহারে মাল রাজস্ব
১৬ বিঘা ১৫ বিশ্বার জন্য ৪৫ টাঃ ৫ আঃ	১৮ বিঘার জন্য ৪২ টাঃ ১৩½ আঃ
	মোট ৮৮ টাঃ ২½ আঃ

খারিফ শস্য: রাজস্ব ধার্য	রাজস্ব বাবদ নির্ণীত ভূমির পরিমাণ		বিঘা প্রতি হার	ধার্য রাজস্বের পরিমাণ
	বিঘা	বিশ্বা		
সামাখ্ (এক প্রকার ধান)	৭	১৫	১-৪	৯-১১
সালি ,, ,,	২	०	২-৮	৫-০
ইক্ষু	৫	०	৫-১০	২৮-২
মাওয়া	২	०	১- ৪	২-৮
				মোট ৪৫-৫
রবিশস্য: রাজস্বধার্য				
ছোলা	২	०	১- ৯	৩- ২
অড়হর	২	०	১-১৪	৩-১২
গম	৭	১৫	৫০- ०	২৪-৪½
গম-বার্লি	৬	১৫	১-১৪	১১-১২
				মোট ৪২-১৪½
(খারিফ ও রবি)				মোট ৮৮- ৩½

পৃথক পৃথক শস্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অঙ্কের যোগফল ও মাল হিসাবে লিখিত মোট অঙ্কের পরিমাণের মধ্যে এক আনা হিসাবের গরমিল আছে।

(১৭) জিহাত ও সায়ের জিহাত বাবদ ধার্য রাজস্ব হারের সমর্থন মাল জিহাত ও সায়ের জিহাদ হিসাবে প্রদত্ত রাজস্বের প্রকৃত হিসাব হইতে পাওয়া যায়:

মাল:	টাকা	৮৮	আনা	২½
জিহাত:	,,	৪	,,	৭½
সায়ের জিহাত	,,	১০৩	,,	১৫
	টাকা	**১৯৬**	**আনা**	**৯**

(১৮) খুলাসত-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ২১ খ, ২২ ক; ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩২ খ; এই দুইটি পুঁথিতে ভাওয়ালি রাজস্বের হিসাব যেরূপ উল্লিখিত: রামপুর পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রামের ভাওয়ালি রাজস্ব।

	মোট উৎপন্ন	রায়তের অংশ	সরকারের অংশ
গম	৪৫০ মণ	২২৫ মণ	২২৫ মণ

কান্‌কুট রাজস্বের পরিমাণ: খুলাসত-উস্-সিয়াক (পৃঃ ২২ ক) অনুযায়ী—

গম	৩৭ মণ	১৮ মণ ২০ সের	১৮ মণ ২০ সের

(১৯) নিগারনামা-ই-মুন্সি: পৃঃ ১২৯ খ, ১৩১ ক; দস্তুর-উল্-অমাল-ই বেকাস: পৃঃ ৬৩ ক, খ, ৬৪ ক, ৭১ ক,

(২০) কান্‌কুট প্রথার ক্ষেত্রে আমাদের হাতে এরূপ কোন তথ্য নাই যাহার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, রাজস্বের হার অপরিবর্তনীয় ছিল না; অথবা, কান্‌কুট প্রথার সকল ক্ষেত্রেই রাজস্বের হার অর্ধাংশ পরিমাণ ছিল।

(২১) নিগারনামা-ই-মুন্সি: পৃঃ ১২৯ খ—১৩১ ক।

(২২) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস: পৃঃ ৬৩ ক, খ।

(২৩) এক ধরনের ইজারা দলিল; কিরূপ স্বত্বে জমির মালিকানা ভোগ করা হইত এবং উৎপন্নের মূল্য অথবা অংশ যাহা জমির প্রাক্তন মালিককে (যাহার নিকট হইতে জমি সংগ্রহ করা হইয়াছিল) দিতে হইত, তাহা এই দলিলে লিখিত থাকিত।

(২৪) তারিখ-ই-শাকির-কহানী: পৃঃ ১৫১ ক, খ, ১৫২ ক।

(২৫) মাসিকল-উমর III—প্রথম খণ্ড: পৃঃ ৪৯৭, ৪৯৮। পূর্ব যুগের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিবার কারণ হইল, যে নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের জমির জন্য বিভিন্ন হারে রাজস্ব ধার্য করা হইত, উক্ত সাক্ষ্যে সেই নীতির পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে।

(২৬) মিরাট-ই-আহ্‌মদি I: পৃঃ ২৭০—২৭১।

(২৭) নিগারনামা-ই-মুন্সি: পৃঃ ১২৯ খ—১৩১ ক।

(২৮) মিরাট-ই-আহমদি I: পৃঃ ২৭০।

(২৯) নিগারনামা-ই-মুন্সি: পৃঃ ৬২, ৯৮, ১৪৪, ১৪৫। দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস: পৃঃ ৬৩ ক খ, ৬৪ ক, ৭১ ক। এই পুঁথির এক অনুচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে যে মোট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ সরকারের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইত। দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস: পৃঃ ৩২ খ, ৩৩ ক।

(৩০) নিগারনামা-ই-মুন্সি: পৃঃ ১৫৪।

(৩১) সর্বোচ্চ ধার্য রাজস্বের পরিমাণ অর্ধাংশ এবং রাজস্ব হার সর্বদা এক রূপে নির্ধারিত হইত না; প্রথম যুগের বৃটিশ রাজকর্মচারীদের তথ্যানুসন্ধান হইতে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রগুলি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে জমির উর্বরতা বা অনুর্বরতা অনুযায়ী বিভিন্ন পরগনার, এমন কি বিভিন্ন গ্রামেরও নগদ মুদ্রায় ধার্য রাজস্বের হার ও উৎপন্নের বিনিময় ধার্য রাজস্বের হার বিভিন্ন ছিল। দলিল-পত্রে ভূমি রাজস্ব হারের বিভিন্ন পরিমাণ যেরূপ উল্লিখিত আছে, তাহা হইল:

১/৮, ১/৭, ১/৬, ১/৫, ১/৪, ১/৩, ২/৫, ১/২, [দ্রষ্টব্য: রেভিনিউ রেকর্ডস, পৃঃ ২৬০, ২৬২, ২৮৯]

(৩২) ফারহঙ্গ-ই-কারদানি : পৃঃ ৩৩ ক।

(৩৩) দস্তুর-উল্-অমাল-ই বেকাস : পৃঃ ৬২-৬৩।

(৩৪) অতিরিক্ত ৬৬০৩ : পৃঃ ৮৪ ক।

(৩৫) ঐ গ্রন্থ : পৃঃ ৮৪ ক।

(৩৬) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস : পৃঃ ৭৬ ক, খ।

(৩৭) এই দলিলে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণগুলি পাওয়া যায় :

(১) কৃষিতে নিযুক্ত জমির পরিমাণ; (২) দামি সাল-ই-কামিল, অর্থাৎ যে বৎসরে সমগ্র কৃষিযোগ্য জমির উপর রাজস্ব নিরূপণ করা হইত, সেই বৎসরের জমার অঙ্ক (দাম্-এ নির্ধারিত)। (৩) দামি-ই-সাল-ই-এক্সাল, অর্থাৎ যে বৎসর জমার অঙ্ক সর্বোচ্চ পরিমাণ হইত, সেই বৎসরের জমার পরিমাণ (রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাব্য খাজনা বা কর ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল) লিখিত থাকিত। উপরন্তু রায়ত এবং চৌধুরী ও কানুনগো-গণের সহিত আলোচনা করিয়াই উক্ত রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া এই দলিলে স্বীকৃত থাকিত। [দ্রষ্টব্য : দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৬৪ খ, ৬৫ ক]

(৩৮) দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস : পৃঃ ৭০ খ।

(৩৯) জমা : এইখানে জমা বলিতে ধার্য ভুমি রাজস্ব বোঝানো হইতেছে।

(৪০) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস : পৃঃ ৭০ খ এবং দস্তুর-উল্-অমাল-ই-মেহদি আলিখান : পৃঃ ২ ক দ্রষ্টব্য।

(৪১) খেওয়াত : ভূস্বামী, নিম্নশ্রেণীর ভূস্বামী এবং চিরস্থায়ী জোতদারগণের তালিকা। [দ্রষ্টব্য : উইল্‌সন্-এর গ্লোসারি : পৃঃ ৪৪৬-৪৪৭।]

(৪২) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস : পৃঃ ৭১ ক। ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩২ খ; খুলাসত্-উস্-সিয়াক, পৃঃ ২১ ক, খ।

(৪৩) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৭১ খ, ৭২ ক; আইন-ই-আকবরি—I, পৃঃ ১৯৯; ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩২ খ, খুলাসত্-উস্-সিয়াক, পৃঃ ১৩২ ক খ; অন্য অঞ্চলে রাজস্ব নির্ধারণের এই পদ্ধতি গাল্লা বখ্‌সি অথবা বাতাই নামে পরিচিত।

(৪৪) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৭২ ক।

(৪৫) দিওয়ান-ই-পসন্দ, পৃঃ ৮১।

(৪৬) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৬২ খ।

(৪৭) ঐ গ্রন্থ, ৭১ খ।

(৪৮) এই দলিলে গ্রামে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত মোট জমির পরিমাণ উল্লিখিত থাকিত এবং ইহার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত কৃষকের পরিবর্তে সমগ্র গ্রামের উপর ধার্য রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করা হইত। ব্যক্তিগত কৃষকের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার সময় একজন কৃষক কি পরিমাণ জমি চাষ করিতেন ও বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ কত তাহা জমা-বন্দীর হিসাব হইতে জানা যাইত। [দ্রষ্টব্য : দেওয়ান-ই-পসন্দ, পৃঃ ১২ খ, ১৩ ক]।

(৪৯) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৭২ ক খ।

(৫০) খিয়াত : এজমালী স্বত্বের গ্রামের অংশীদারগণের হিস্যা ; হিস্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন রায়তের সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত ; সেটেলমেণ্ট বা রাজস্ব নিরূপণের সময় নির্ধারিত খাজনার পরিমাণ ইত্যাদির লিখিত রেকর্ড [দ্রষ্টব্য : উইলসন-এর গ্লোসারি, পৃঃ ২৮৫, ৫৮৪]। সেটেলমেণ্ট বা রাজস্ব নিরূপণের সময় নির্ধারিত খাজনার সংজ্ঞা হিসাবে খিয়াত শব্দটি ব্যবহৃত হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, শস্যের বিনিময় ধার্য রাজস্বের পরিমাণ যে দলিলে উল্লিখিত থাকিত, তাহাকেই খিয়াত-ই-আজ্‌নাম বলা হইত।

(৫১) দস্তর-উল-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৭২ ক, খ।

(৫২) ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৬৬ ক, খ।

(৫৩) ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৬৬ খ।

(৫৪) ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৬৬ খ।

(৫৫) অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৭৯ ক।

(৫৬) দিওয়ান-ই-পসন্দ্‌, পৃঃ ৯ খ, ১০ ক, ১৮ ক খ, ২১ ক খ।

(৫৭) ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১৫ ক, খ।

(৫৮) দিওয়ান-ই-পসন্দ্‌, পৃঃ ১৫ খ, ১৬ ক।

(৫৯) অতিরিক্ত ৬৫৮৬, পৃঃ ১৬৪ ক খ।

(৬০) দস্তর-উল্‌-অমাল-ই-মেহদি আলিখান-এর বিবরণ অনুযায়ী, ১৯শ শতকের প্রথম যুগে অযোধ্যা প্রদেশের বাহ্‌রাইক সরকার-এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে রাজস্ব 'নরূপণ পদ্ধতি হিসাবে নগদি ও কান্‌কুট প্রথা প্রচলিত ছিল। [দস্তর-উল্‌-অমাল-ই-মেহদি আলি· খান, পৃঃ ২ ক, খ]

(৬১) রায়রায়ান ও কানুনগোর রিপোর্ট ৬৫৯২, পৃঃ ১১২ খ।

(৬২) ভূমি-রাজস্বের অতিরিক্ত ধার্য, প্রচলিত করসমূহ।

(৬৩) ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, ৩৪ খ ; দস্তর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৬৬ ক খ।

(৬৪) আকবর নামা II, পৃঃ ৩৮২, ৩৮৩ ; আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ১৯৯-২০১। 'আগ্রারিয়ান সিস্টেমস্‌ অফ মুসলিম ইণ্ডিয়া', মোরল্যাণ্ড—পৃঃ ১১৪।

(৬৫) খুলাসত্‌-উস্‌-সিয়াক, পৃঃ ১৩ ক খ, ১৫ ক ; ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৩ খ।

(৬৬) দিওয়ান-ই-পসন্দ্‌, পৃঃ ২১ খ।

(৬৭) দস্তর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৬৬, ৬৭, ৬৮ ; কহুলাসত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌, পৃঃ ১১ খ ; ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৪ ক।

(৬৮) খুলাসত্‌-উস্‌-সিয়াক : পৃঃ ১১ খ।

(৬৯) অতিরিক্ত ৬৫৮৬, পৃঃ ১৬৪ ক।

(৭০) ফারহঙ্গ-ই-কারদানি : পৃঃ ৩৪ ক খ, ৩৫ ক ; দস্তর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস : পৃঃ ৬৭।

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা

—এক—

রাজস্ব নির্ধারণ ও তাহার সংগ্রহের দায়িত্ব 'দেওয়ান-ই-উজিরত্' বা রাজস্ব মন্ত্রকের দপ্তরে ন্যস্ত ছিল। এই মন্ত্রকের কার্য যথাক্রমে কেন্দ্র, প্রদেশ, সরকার ও পরগনা এই চার স্তরে চলিত। দেওয়ান-ই-কুল বা উজীরের (অথবা দেওয়ান-ই-আলা) নেতৃত্বে ক্রমিক স্তরের বিভিন্ন রাজস্ব কর্মচারীর সমন্বয়ে এই মন্ত্রকের কর্ম সম্পাদিত হইত।[১]

একদিকে আকবর রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ-পদ্ধতির আমূল সংস্কার করিবার জন্য অবিরত প্রচেষ্টা করিতেন, অন্যদিকে ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের কর্ম যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তাহার জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি ও তাহার উন্নতির জন্যও সমানভাবে চেষ্টা করিতেন। অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় প্রদেশ সমূহের পুনর্গঠন, 'ওয়াকিল' হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন উজিরত্ বা রাজস্ব মন্ত্রক নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রকের সৃষ্টি এবং উজীরের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক দেওয়ান-এর পদ সৃষ্টি, ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় আকবরের মৌলিক অবদান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তাঁহার পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারীর আমলে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, সেই ব্যবস্থা ১৮ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অল্প বিস্তর সংস্কার যাহা করা হইয়াছিল, তাহা মূল কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে নাই।

উজীর ঃ 'দেওয়ান-ই-কুল' দপ্তরের সৃষ্টি হয় আকবরের রাজত্বের অষ্টম বৎসরে, যে বৎসর মুজাফফর খানকে 'দেওয়ান-ই-কুল' বা উজীরের পদে নিযুক্ত করা হয়।[২] আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিকাশনের যুগ বলা চলে। শাহ্‌জাহানের যুগে 'দেওয়ান-ই-কুল বা 'দেওয়ান-ই-আলা' দপ্তরের ক্রমবিকাশ সমাপ্তি লাভ করে। 'দেওয়ান-ই-কুল' এর সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে রাজস্ব মন্ত্রককে একাধিক দপ্তরে বিভক্ত করা হইত এবং মন্ত্রকের সমুদয় কর্ম নিখুঁতভাবে লিখিত ও ব্যাখ্যাত আইন-কানুনানুযায়ী সম্পন্ন হইত।[৩] আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজস্ব-মন্ত্রকের প্রধান কর্তাকে 'উজীর' অথবা 'উজীর-ই-আজম' বা 'উজীর-ই-মোয়াজ্জম'[৪] বলা হইত। তবে প্রশাসনিক ও হিসাব নিকাশের পুঁথিপত্রে তাঁহাকে 'দেওয়ান-ই-আলা'[৫] নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই দুইটি পদ পরস্পর পরিবর্তিত করা চলিত এবং যদিও বিভিন্ন ইতিবৃত্তে রাজস্ব মন্ত্রকের প্রধান উজীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, পারিভাষিক অর্থে তিনি 'দেওয়ান-ই-আলা' নামে পরিচিত ছিলেন। কনিষ্ঠ মোঘলদিগের যুগে রচিত ইতিবৃত্তগুলিতে তাঁহাকে উজীর বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে।

উজীরের ক্ষমতা ও পদ-মর্যাদা ঃ সাম্রাজ্যের প্রায় সকল স্তরের প্রশাসনিক কার্যকলাপের উপর 'দেওয়ান-ই-আলা'র ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত ছিল। সুবেদার, দেওয়ান, ফৌজদার, আমিন, করোরি এবং বিভিন্ন শাসন কার্য-নির্বাহক ও কোষাগার আধিকারিক নিয়োগের সুপারিশ করিবার এবং রাজস্ব-নির্ধারণ ও 'মাদাদ্-মাস্' ভূমি প্রদানের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থাকায় সরকারের সকল প্রকার কার্য-নির্বাহক, রাজস্ব ও আর্থিক ক্ষমতা 'দেওয়ান-ই-আলা'র হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। মনে হয় এই ঘটনাটির উপর গুরুত্ব দিবার জন্যই বিভিন্ন সরকারী দলিলপত্রে তাহাকে 'মাদার-উল-মাহ্মাই' এবং 'জুম্দাত্-উল্-মুল্কী'[৬] নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি যে প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব প্রকার রাজস্ব ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহার প্রমাণ বিভিন্ন প্রশাসনিক দলিলপত্রে তাঁহার দপ্তরের যে বিবরণ আছে তাহাতে পাওয়া যায়।

"ফারহঙ্গ-ই-কারদানি' গ্রন্থের লেখকের মতে মোঘল সাম্রাজ্য সর্বতোভাবে 'দেওয়ান-ই-আলার উপর নির্ভরশীল ছিল। সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হস্তে অর্পিত এবং সর্বপ্রকার রাজস্ব ও পরিচালন সমস্যার সমাধানের অধিকার তাঁহার ছিল।[৭] 'খুলাসত-উস-সিয়াক্' গ্রন্থে 'দেওয়ান-ই-আলা' সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিষয়ের সহিত ধর্মীয় ও ঐহিক বিষয়গুলির উপরেও এই ব্যক্তি কর্তৃত্ব করিতেন। তিনিই রাজকীয় শাসনবিধি ও আদেশসমূহ কার্যকরী করিতেন। তিনি রাজকোষের সম্পদ এবং সৈন্যসামন্ত ও রায়তদিগের সাচ্ছল্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি সেই ধরনের আমিল নিযুক্ত করিতেন যাঁহারা জনসাধারণের সমৃদ্ধি বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন এবং উৎপীড়নকারী আমিলদের বরখাস্ত করিতেন।[৮] অপর একটি সূত্রে আমরা জানিতে পারি যে দেওয়ানই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। বক্সী মির-ই-সামান, মুশরীয়, তহ্বীলদার ও জমিদার ইত্যাদি অন্যান্য সমস্ত কর্মকর্তা তাঁহার অধীনস্থ ছিলেন।[৯]

উপরে যে সকল তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে —

(১) দেওয়ান-ই-আলা সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক অধিকর্তা ছিলেন।

(২) তিনি যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করিতেন তাহার সীমানা রাজস্ব মন্ত্রকের বাহিরে ব্যাপক বিস্তৃত ছিল।

এবং (৩) সকল প্রকার প্রশাসনিক কর্ম তাঁহার শাসন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

'দেওয়ান-ই-আলা'র কর্তব্য ঃ প্রশাসনিক পুঁথিপত্রে 'দেওয়ান-ই-আলা' ও রাজস্ব মন্ত্রকের দায়দায়িত্ব বা কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের পূর্বোল্লিখিত অনুমান সমর্থন লাভ করে। এই সকল তথ্য হইতে দেখা যায় যে 'দেওয়ান-ই-আলা'র প্রভাব ও দায়িত্ব ছিল ব্যাপক এবং প্রশাসনিক কর্মের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সেই প্রভাব ছিল প্রকট। উদাহরণ হিসাবে, তাঁহার প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল,—কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নিয়োগ, দপ্তরের

বিভিন্ন সরকারী কর্মের তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন সরকারী নথিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান, জনসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ এবং মনসবদার ও অন্যান্য আমলাদের পক্ষ হইতে উকীলগণ যে সকল আর্জি পেশ করিতেন সেইগুলি যথাযথ ব্যবস্থা করা।[১০]

সরকারী চাকরীতে নিয়োগঃ মনে হয় তাঁহারই অনুমোদনে সকল প্রকার দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হইত। এইসব নিয়োগ-পত্রের দলিল 'দেওয়ান-ই-খালিসা' দপ্তরের হেফাজতে থাকিত। ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল[১১] ঃ—

(ক) সুবাদার, ফৌজদার, করোরি, আমিন ও বিভিন্ন মহালের মস্‌রিফ্।

(খ) রাজকীয় কোষাগারের বিভিন্ন কর্মচারী যথা ফতাদার, বারাম্‌দ-নবীশ, দারোগা, আমিন ও মস্‌রিফ্।

(গ) সাজাওয়াল বা বিশিষ্ট রাজকর্মচারী, যাঁহার কাজ ছিল বিভিন্ন আধি-কারিকের নিকট হইতে নথিপত্র সংগ্রহ করা।

(ঘ) সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত কিন্তু হস্তান্তর যোগ্য মহালের (পাইবাকি) আমিন ও করোরি।

(ঙ) তহ্‌শীলদার অর্থাৎ সরকারের বকেয়া পাওনা আদায়কারী।

(চ) জমিদার বর্গ।

স্বাক্ষরঃ তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র, রেজিষ্টারী বই[১২] ইত্যাদিতে স্বাক্ষর করিতেন। ইহা হইতে বিভিন্ন দপ্তরের কার্য-কলাপের উপর তাঁহার প্রভাব কত ব্যাপক ছিল বুঝা যায়। ফার্‌মান (যাহার ভিতর মাদাদ্-মাস্ ভূমিও অন্তর্ভুক্ত থাকিত), পরোয়ানা তমসুক (অর্থাৎ কর্মচারী ও তাহার জামিনদার কর্তৃক প্রদত্ত জামিন), যাদ্যশাত বা স্মারকলিপি এবং ফার্দ-ই-হাকিকত অথবা জায়গীর সংক্রান্ত সুপারিশ পত্র ইত্যাদির অপর পৃষ্ঠায় তিনি স্বাক্ষর দিতেন। বক্‌সী দপ্তরের 'সিয়াহা' অর্থাৎ কার্য বিবরণে তাঁহার স্বাক্ষর না থাকিলে উহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইত না। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেও তিনি স্বাক্ষর দিতেন ঃ

১। জায়গীর ও নগ্‌দি[১৩] সংক্রান্ত সিয়াহা ও দৌল[১৪]।

২। বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত মনসবদারগণের তৌজি[১৫]।

৩। পরগনা ও প্রাদেশিক রাজকোষে প্রেরিত অর্থ সংক্রান্ত রিপোর্ট।

৪। মাদাদ্-মাস্ ধারীগণের আবেদন পত্র।

দপ্তরের বিভিন্ন কাগজপত্রাদি লইয়া কার্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'দারোগা-ই-ফরিয়াদিয়ান্' (আবেদনকারীগণের তত্ত্বাবধায়ক) মারফৎ প্রেরিত জনসাধারণের অভিযোগ সমূহ তাঁহাকে শ্রবণ করিতে হইত। একই ভাবে মনসবদার ও অন্যান্য কর্মচারিগণের উকীলবর্গ তাঁহাদের মক্কেলদিগের মামলাসমূহ তাঁহার বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতেন।[১৬]

মনে হয়, সুবাদার, দেওয়ান ও ওয়াকা-ই নবীনাগণ সরাসরি তাঁহার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে এই সকল রাজকর্মচারিগণ সৌজন্য

প্রদর্শন করিবার জন্য উজীরের সহিত সাক্ষাত করিতেন এবং উজীরও তাঁহাদের যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন।[১৭]

দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগঃ রাজস্ব দপ্তর একাধিক বিভাগে সংগঠিত ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি হইল 'দেওয়ান ই-খালিসা', 'দেওয়ান-ই-তান', 'মুস্তাফি' ও 'দারুল ইন্‌সা' অর্থাৎ বিভিন্ন ফারমান ও রাজকীয় হুকুমনামা প্রস্তুত করিবার বিভাগ।[১৮] রাজস্ব দপ্তরের অন্যান্য বিভাগে 'মাদাদ্‌-মাস্‌' বিলি ও নগদ মুদ্রায় মাহিনা প্রদানের কর্ম সম্পাদিত হইত। 'দেওয়ান-ই-আলা'র অধীনে প্রধান কর্মচারী বলিয়া 'দেওয়ান-ই-খালিসা' ও 'দেওয়ান-ই-তান' পরিচিত ছিলেন।[১৯]

দেওয়ান-ই খালিসাঃ 'দেওয়ান-ই-আলা'র সুপারিশে এবং সম্রাটের প্রত্যক্ষ আদেশানুসারে 'দেওয়ান-ই-খালিসা' নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার দপ্তরে প্রচুর দলিলপত্রাদি থাকিত এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও পরগনা হইতে রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র তাঁহার দপ্তরে আসিত।[২০] বিভিন্ন পরোয়ানায় 'দেখা হইয়াছে' বলিয়া তিনি স্বাক্ষর প্রদান করিতেন। সুবেদার, দেওয়ান, কোতওয়াল, ফৌজদার ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদস্থ কর্মচারীগণের নিয়োগপত্রাদি তাঁহার দপ্তর হইতেই বিতরণ করা হইত। দেওয়ান, ফৌজদার ও আমিনের নিয়োগপত্রে তিনিই স্বাক্ষর দিতেন। খালিসা মহালের খাজনা সংক্রান্ত হিসাবপত্র (তুমার জমা) তাঁহার দপ্তরে প্রস্তুত করা হইত এবং রাজ পরিবারের পুরনারীগণের মাহিনা সংক্রান্ত নথিপত্র তাঁহার কাছে থাকিত। প্রাদেশিক দেওয়ান, আমিন, করোরি, মহল সেয়ার এর মুৎসুদ্দি ও খাজাঞ্চিখানার কর্মচারিগণ প্রচুর নথিপত্র তাঁহার দপ্তরে পাঠাইতেন।[২১] দেওয়ান-ই-খালিসা হইতে সাম্রাজ্যের খাজনা সংক্রান্ত হিসাব পত্র (তুমার-ই-জমা) প্রস্তুত করিয়া তাহা সম্রাটের নিকট পেশ করা হইত।[২২]

দেওয়ান-ই-তান্‌ঃ দেওয়ান-ই-তান এর উপর মনসবদার নিয়োগ ও জায়গীর বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। বিলি বন্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত স্মারক লিপি (ফার্ড-ই-হাকিকত্‌) তিনি প্রস্তুত করিতেন। বিলি বন্টন ব্যবস্থা পাইবাকি (ভূমি-ব্যবস্থা) জমিদারগণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ, সুবাদারের দউল-ই-জায়গীর, পাইবাকি ভূমির খাজনার হিসাব-নিকাশ, মনসবদারগণের পদমর্যাদা ইত্যাদি যাবতীয় নথিপত্রের তত্ত্বাবধান তাঁহাকে করিতে হইত।[২৩]

মনসবদারের তালিকা প্রতিবৎসরের 'হাসিল' অঙ্ক, 'সিয়াহা-ই-দাগ' ও 'তসিহা' (অর্থাৎ চিহ্নিত ও অঙ্কিত সংখ্যার বিশদ বিবরণ) এবং 'জামিলদার নামা' র (তমসুক) কাগজ পত্রাদি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত।[২৪]

মুস্তফীঃ আমিল প্রদত্ত হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিবার দায়িত্ব মুস্তফীর উপর ন্যস্ত ছিল। কি পরিমাণ মুদ্রা আমিল ও রায়তের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে তাহা এই পরীক্ষণে পৃথক ভাবে দেখানো হইত। আমিলের বকেয়া পাওনার একটি হিসাব দেওয়ানের নিকট পেশ করা হইত, এবং তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ পাওনা মকুফ করিতে পারিতেন। মকুফ করিবার পর বাকি পাওনা যাহা থাকিত তাহা অল্প সময়ের মধ্যে মিটাইয়া দিবার জন্য আমিলকে চুক্তিবন্ধ থাকিতে হইত।

রায়তের অনাদায়ী রাজস্ব বকেয়া পাওনা হিসাবে তাঁহাদের নামের পাশে উল্লিখিত থাকিত এবং নব-নিযুক্ত আমিল ঐ পাওনা আদায় করিয়া কোষাগারে পাঠাইয়া দিতে চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন।[২৫] বকেয়া পাওনা যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমিল-গণের নিকট হইতে আদায় হয়, তাহার ব্যবস্থা মুস্তফীকে করিতে হইত। কোষাগারে প্রেরিত মুদ্রার রসিদ আমিলগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া মহাফেজ্ খানায় তাহা জমা রাখিতে হইত।

আমিলগণের নিকট হইতে বহুবিধ কাগজপত্র মুস্তফীর দপ্তরে আসিত। অন্যান্য নথিপত্রের মধ্যে আমিলের জমা খরচের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ফতাদারের হেফাজাতে নগদ জমা খরচের হিসাবও এই দপ্তরে থাকিত।[২৬]

সম্রাট ও উজীরঃ আওরঙ্গজেবের অধীনে ফজিল খান, জাফর খান ও আসাদ খান প্রভৃতির মত উজীরগণের প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল।[২৭] রাজভক্তি, কর্মদক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রশংসনীয় কর্মের জন্য তাঁহারা সম্রাটের বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট নিজেই উজীরগণের কাজকর্ম তদারক করিতেন[২৮] সেই জন্য সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উজীরগণ কিছু করিবার কথা ভাবিতেন বলিয়া মনে হয় না। তবে বেসামরিক কর্মচারী হিসাবে উজীরগণই ছিলেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী এবং তাঁহাদের হস্তে রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্ব অর্পিত হইত।

বাহাদুর শাহ্-এর সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উজীরের পদমর্যাদার সুস্পষ্ট পরিবর্তন সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, পরবর্তীকালের মোঘল সম্রাটদিগের অধীনস্থ উজীরগণ সম্রাটকে সিংহাসনে বসানো অথবা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করার ব্যাপারে সামরিক সাহায্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ এই উচ্চাসনের দাবি জানাইয়াছিলেন। এই দাবিতেই মুনিম্ খান, জুল্ফিকর খান, আবদুল্লা খান এবং মহম্মদ আমিন খান[২৯] উজীরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কামার-উদ্-দীন খানের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বংশগত দাবি অগ্রাহ্য হইয়া উজীরের পদে নিজাম-উল্ মুলক্ এর দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০] উজীরী দপ্তর লইয়া, কামার উদ্-দীন খান ও খান-ই-দুরানের (সম্রাটের অনুমোদিত প্রার্থী) মধ্যে যে বিবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা বিনষ্ট করা উক্ত নিয়োগের আংশিক উদ্দেশ্য ছিল।[৩১] প্রকৃত পক্ষে উজীরপদে নিজাম-উল-মুলক-এর নিয়োগ হইয়াছিল, কারণ তিনিই ছিলেন সাম্রাজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজপুরুষ এবং দাক্ষিণাত্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সুবার সুবাদার। তাঁহার বিরোধিতা অথবা অসন্তোষ উদ্রেক করিলে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের আধিপত্য ক্ষুন্ন হইতে পারিত। ধ্বংসোম্মুখ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দরুন তাঁহার সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু, প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংশোধনের প্রশ্নে সম্রাটের সহিত সরাসরি সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে উজীরীপদে নিযুক্ত হইবার দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি দিল্লী ত্যাগ করেন। তাঁহার দিল্লী পরিত্যাগের পর ৭০০০ মোঘল সৈন্যের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে কামার উদ্দ-দীন ওই পদে নিযুক্ত হন।[৩২]

সুতরাং পরবর্তী আমলে নিম্নলিখিত কারণে উজীরী পদ দাবি করা হইত ঃ

(১) সম্রাটের সিংহাসন অর্জনে অথবা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করিতে উপযুক্ত সামরিক সাহায্য প্রদান।

(২) পদপ্রার্থী সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজপুরুষ এবং ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যের সংহতি ফিরাইয়া আনার জন্য তাঁহার সমর্থন অপরিহার্য এই দাবির স্বীকৃতি।

উপরোক্ত ভিত্তিতে উজীরীপদে নিয়োগের প্রথা, আওরঙ্গজেবের আমলে যে প্রথায় ঐ নিয়োগ হইত, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ঘটনা হইতে সম্রাট ও উজীরের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ফুটিয়া উঠে। পরবর্তী যুগে, প্রশাসনিক কার্যদক্ষতার নিদর্শন হিসাবে সম্রাটের অনুগ্রহের পরিবর্তে অধিকার ও স্বত্বের ভিত্তিতে ঐ পদে দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ঘটনা হইতে ইহাও মনে হয় যে উজীরী পদটি ক্রমশঃ বেসামরিক হইতে রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দেখি যে একদিকে উজীরের পদমর্যাদা ও প্রভাব বাড়িতে থাকে অপরদিকে সম্রাটের ক্ষমতা ও প্রাধান্য কমিতে থাকে। এই দপ্তর-ধারীকে নিছক রাজস্ব মন্ত্রকের প্রধানের পদমর্যাদায় আবদ্ধ রাখিবার জন্য আকবর দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে প্রচেষ্টা অবিরাম চালাইয়াছিলেন, উক্ত পরিণতির ফলে তাহা বাতিল হইয়া যায়।

এইখানে লক্ষ্য করিতে হয় যে নূতন পরিস্থিতিতে উজীর ও সম্রাট, উভয়েরই প্রভাব ও প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। যদিও বাহাদুর শাহ্ ও তাঁহার সৎ-প্রকৃতির উজীর মুনিম্-খান উভয়ের চারিত্রিক গঠনে সামঞ্জস্য থাকায় তাঁহাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অটুট ছিল, এবং সেই কারণে অপ্রীতিকর কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই। তবুও উজীরী দপ্তরের নূতন সাংগঠনিক বিকাশে এবং উজীর ও সম্রাটের পারস্পরিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার ফলে যে কোন মুহূর্তেই তাঁহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারিত; এবং সেই ক্ষেত্রে যেকোন উপায়েই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা দখল করিবার উদ্দেশ্যে উজীর সর্বাত্মক চেষ্টা করিতে পিছু হটিতেন না। এইরূপ সংঘর্ষে সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তি ও প্রশাসনিক স্থিতি অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাহত হইত এবং অচিরেই মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে পারিত। প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর শাহ্-এর আমলে এই ঘটনাই ঘটিয়াছিল এবং সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নজরেও তাহা ধরা পড়িয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ 'তারিখ সাকির-ই-খানি' পুস্তকের রচয়িতা বলিয়াছেন যে বাহাদুর শাহ্-এর আমলে সাম্রাজ্যের বিলোপ তখনই শুরু হয়, যখন সম্রাট রাজভক্ত আসাদ খানের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া উজীরী পদে মুনিম্ খানকে নিযুক্ত করেন। উজীরী পদের জন্য আসাদ খানই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ওয়াকিলের পদপ্রার্থী হইতে বলা হয়। নিজেকে একজন কর্তব্যপরায়ণ ও রাজভক্ত ভৃত্য প্রমাণ করিবার ছলে তিনি রাজাদেশ মানিলেন বটে, কিন্তু এই নূতন কার্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন না। মোঘল সাম্রাজ্যের পতন এই ঘটনার মাধ্যমেই শুরু হয় এবং কালক্রমে তাহার দ্রুত পরিণতি ঘটে।[৩৩]

অনিবার্য সংঘর্ষ ও তাহা হইতে যে সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়। অন্যান্য পুস্তকে তাহার বিবরণ আছে। আমাদের আলোচনায় যে বিষয়টি সম্পর্কে নজর দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইল এই, যে উক্ত সংঘর্ষ উজীরের দপ্তরকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় স্তরের রাজস্ব প্রশাসনিক কর্ম ব্যাহত হয়। বর্তমানে আমরা এই সংকটের আলোচনা করিব।

রাজস্ব দপ্তরের ক্রিয়াকলাপ: মুনিম খান ১৭০৭ খৃঃ উজীর পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭১১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার কার্যকালে এই দপ্তরে অপচার ও রাজকর্মে ঔদাসীন্য দেখা দেয় নাই। উপরন্তু, প্রশাসনের প্রতিটি কর্মে তিনি প্রচণ্ড ঔৎসুক্য দেখাইতেন এবং সরকারী কর্মের আইনসঙ্গত পদ্ধতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তাঁহার আমলে উজীরী দপ্তর সংস্কার করিবার প্রচেষ্টাও করা হইয়াছিল।[৩৪] ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল। কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল অশ্ব ও অন্যান্য ভারবাহী জন্তু পালন করিতেন, তাহাদের খাদ্য-ব্যয় বহন করিবার জন্য মনসবদারগণের উপর ধার্য করের পরিবর্তন সাধন। ধার্য কর সম্পূর্ণ তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্তে অত্যধিক চাপক্লিষ্ট মনসবদারগণ যথেষ্ট চাপ মুক্ত হইলেন। সকল প্রকার উৎপীড়ন হইতে জনসাধারণ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সেই কারণেই সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফি খান সশ্রদ্ধ ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৫] মোটের উপর একজন কৃতী উজীর বলিয়াই তিনি খ্যাত ছিলেন এবং সেইভাবেই তিনি সরকারী কার্য কৃতিত্বের সহিত নির্বাহ করিতেন।[৩৬]

জাহান্দার শাহ্-এর উজীর জুলফিকর খান সম্রাটের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তিনি ইন্দ্রিয় বিনোদনে সর্বসময় লিপ্ত থাকায় সরকারী কার্যে সময় দিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার সমস্ত দায়-দায়িত্ব দেওয়ান-ই-তান, সভা চাঁদের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। আমরা যে সকল তথ্য পাইয়াছি, সেইগুলি হইতে দেখা যায় যে উক্ত ব্যবস্থার ফলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সরকারী কার্যে এই সর্বপ্রথম অবহেলার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজস্ব বিলি ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অধীনস্থ কর্মচারীগণের পদোন্নতি রুদ্ধ করায় উজীরকে কৃপণ স্বভাবের দোষে দোষী করা হয়।[৩৭]

তবে, ফারুখ সিয়ারের রাজত্বকালেই সম্রাট উজীরের সংঘর্ষ চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রাজত্বের গোড়ার দিকে দেওয়ান ও সদর দপ্তরের কর্মচারী নিয়োগের প্রশ্ন লইয়াই এই সংঘর্ষের সূচনা।[৩৮] যদিও সরকারী কার্যের সুপরিচালনার স্বার্থে আপসের বহু চেষ্টা করা হয়, তবুও রাজস্ব মন্ত্রকের কর্মে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাহাদের কার্যে রূপান্তরের প্রশ্নে সম্রাট ও উজীরের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে সংঘর্ষ দেখা দিল, সেই সংঘর্ষে উজীরের প্রাধান্যই দৃঢ়তর হইয়া উঠিল এবং ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা সর্বতোভাবেই তাঁহার দেওয়ান রতনচাঁদের হাতে আসিয়া পড়িল। প্রতিটি সরকারী প্রশাসনিক বিভাগে দেওয়ান হস্তক্ষেপ করিতে থাকায় নির্ধারিত ও যথাযথ পদ্ধতিতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হইয়া পড়ে। খালিসা জমির ইজারা

দানের ক্ষতিকর পদ্ধতি ও উৎকোচ গ্রহণের প্রথা ব্যাপক হারে প্রচলিত হইল এবং পেশকাশ প্রদান করিয়া বিভিন্ন সরকারী বিভাগে চাকুরীতে নিয়োগ চলিতে লাগিল।[৩৯]

দেখা যায় যে ১১২৪ হিঃ/১৭১৪ খৃঃ মধ্যেই রাজস্ব দপ্তরে দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মধারা লইয়া মত-বিভেদ হওয়ায়, ঐ দপ্তরের যথাযথ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। উজীর ও তাহার ভ্রাতা হুসেন-আলী-খান (যিনি ছিলেন আমির-উল-ওম্‌রাহ্‌) দাবি করিয়া বসিলেন যে মনসবদার নিয়োগ, মনসব প্রদান অথবা ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি, অথবা কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দুই ভ্রাতার সুপারিশ ব্যতিরেকে করা চলিবে না। কিন্তু সম্রাট ভিন্ন মনোভাব পোষণ করিতেন। তিনি মীর জুম্‌লাকে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান করিবার ক্ষমতা দিলেন। সম্রাট বারংবার ঘোষণা করিলেন যে মীর জুম্‌লার সিদ্ধান্ত ও স্বাক্ষর সম্রাটের সিদ্ধান্ত ও স্বাক্ষর হিসাবেই গণ্য হইবে। এই ব্যবস্থা প্রশাসনিক কার্যকলাপে প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি করিল। উজীরের দেওয়ান রতনচাঁদের অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগে অবস্থা অধিকতর জটিল রূপ ধারণ করিল। সাম্রাজ্যের ও রাজস্ব দপ্তরের সকল প্রকার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। কোন-আবেদনের নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে তাঁহার ও তাঁহার প্রভুর সন্তোষের জন্য আবেদনকারীকে প্রচুর পরিমাণ উৎকোচ দিতে হইত। অপরদিকে মন্‌সব অথবা ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি, অন্য কোন দপ্তরে বা কর্মে নিয়োগের আবেদন লইয়া কোন ব্যক্তি মীর জুমলার সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি সেই আবেদন মঞ্জুর করিতেন। কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ না করিয়াই সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান করিতেন। রাজস্ব দপ্তরের কর্ম-পদ্ধতির সহিত এইরূপ আচরণ মিলিত না এবং ইহাতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ক্ষুন্ন হইত।[৪০]

১৭১৮ সালের মধ্যে উজীরেরই জয় হইল। আবদুল্লা খানের দেওয়ান রতনচাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলির উপর এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল যে মুৎসুদ্দিগণ তাঁহাদের নিজস্ব বিভাগগুলিতে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়েন। রাজস্ব কার্যকলাপেই এই ঘটনা সর্বাধিক প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রবল কর্তৃত্বের ফলে দেওয়ান-ই-তান ও দেওয়ান-ই-খালিসার পদগুলি নেহাতই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল। খালিসা পরগনাগুলির রাজস্ব-ইজারা তিনি এমনভাবে বিলি করিতে লাগিলেন যাহাতে মনে হয় যে তিনি নিছক ক্রয়-বিক্রয় কার্যেরই সম্পাদনা করিতেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ইহার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুদ্রাও তিনি অর্জন করেন। স্বভাবতঃই এই কর্ম, সম্রাটের বৈরীভাব অধিকতর উগ্র করিয়া তুলিল।[৪১]

ইত্যবসরে দেওয়ান-ই-খালিসা ও দেওয়ান-ই-তান অফিসদ্বয় যথাক্রমে ইতিসাম খান ও রায়-রায়ন জাহান শাহীর অধিকারে আসিয়াছিল। এই দুই কর্মকর্তা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়াছিলেন। উজীরের শত্রুতা সঞ্চার না করিয়া তাঁহারা সম্রাটকে খুশি করিতে চাহিতেন। ইতিসাম খান সম্রাটের পক্ষে ও রায়

রায়ন আবদুল্লা খানের পক্ষে ঝুঁকিতে লাগিলেন। এই কারণে সকল পক্ষ হইতেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতে লাগিল এবং তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রকৃতপক্ষে ১১২৯ হিঃ ইতিসাম খান পদত্যাগ করিলেন এবং দেওয়ান-ই-খালিসা ও দেওয়ান-ই-তান দপ্তর দুইটির সহিত কাশ্মীরের প্রদেশ-পালের পদে এনাএতুল্লাহ্ খান মনোনীত হইলেন। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন, কারণ তৎকালে উজীর ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী। কিন্তু অবশেষে একটি আপস হওয়ায় এনাএতুল্লাহ্ খান এই দুইটি পদ গ্রহণ করিলেন। নিম্নলিখিত শর্তগুলির ভিত্তিতে উজীর ও এনাএ-তুল্লাহ্ খানের মধ্যে এক চুক্তি হইল ঃ

১। উজীরের অনুমতি না লইয়া এনাএতুল্লাহ্ খান ভূমি-রাজস্ব পরিচালন সংক্রান্ত কোন বিষয় সম্রাটের নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন না।

২। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে কোন পদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করিতে পারিবেন না।

৩। খালিসা ভূমি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে রতনচাঁদ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

৪। সরকারী কার্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে এক বা দুই দিন দপ্তরে উপস্থিত থাকিবেন।[৪২]

১১৩১ হিঃ এনাএতুল্লাহ্ কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এই প্রস্তাব-গুলির মধ্যে ছিল, জিজিয়া করের পুনঃ প্রবর্তন ; হিন্দু, কাশ্মীরী ও খোজাগণ কৌশলে ও অসৎ উপায়ে যে সকল উচ্চ মনসব্ ও সমৃদ্ধিশালী জায়গীর দখল করিয়াছিলেন, সেইগুলির সংখ্যা হ্রাস ও সরকার কর্তৃক পুনর্গ্রহণ। সম্রাট প্রস্তাবগুলি মঞ্জুর করিলে এনাএতুল্লাহ খান সেইগুলি কার্যে রূপান্তর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রতনচাঁদ সহ রাজস্ব দপ্তরের প্রতিটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রচণ্ডভাবে ইহার বিরোধিতা করেন। তাঁহারা উজীরের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিলে উজীর উল্লিখিত নূতন প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন। অনেকেই এনাএতুল্লাহ্ খানের বিরোধিতা শুরু করিলেন। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ আনিতে আরম্ভ করিলেন এবং উজীর ও এনাএতুল্লাহ্ খানের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহারা প্রায়শঃই পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকিলেও বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন।[৪৩]

রাজস্ব মন্ত্রকে কিরূপ বিশৃঙ্খলা চলিতেছে তাহার আর একটি উদাহরণ প্রাপ্ত তথ্যে উল্লিখিত আছে। এই তথ্যে দেখা যায় যে খালিসা ভূমির একজন আমিলের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে এক বৃহৎ অঙ্কের সমষ্টি তাঁহার নিকট বাকি পড়িয়া আছে। ইহা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে এনাএতুল্লাহ্ আমিলকে কারারুদ্ধ করেন। রতনচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই আমিল নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি ইহার মুক্তির জন্য সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু এনাএতুল্লাহ্ খান তাঁহার সংকল্পে অনড় থাকেন। আমিল কোনক্রমে বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিলে রতনচাঁদ তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এনাএতুল্লাহ্ খান ঘটনাটি সম্রাটের

নজরে আনিলে রতনচাঁদের গৃহ হইতে আমিলকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য কয়েকজন 'চেলা' পাঠানো হয়। তীব্র বাদানুবাদের পর একটি সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। সম্রাট কুতুব-উল্-মুল্ককে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া রতনচাঁদকে বরখাস্ত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ খান কিছুই করিলেন না।[৪৪]

ফারুখ-সিয়ার নিহত হইলে আবুল বরকত্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বে আবদুল্লাহ্ খানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অধিকতর বিস্তৃত হইয়া উঠিল। দিয়ানাত্-খানকে দেওয়ান-ই-খালিসা ও রাজা ভকত্মলকে দেওয়ান-ই-তান্-এর পদে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু বিচার বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কর্মচারীগণ ক্ষমতাবিহীন অবস্থায় রতনচাঁদের অধীনস্থ মত কাজ করিতে থাকিলেন।[৪৫] মহম্মদ শাহ্-এর রাজত্বেও এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। প্রশাসনিক, রাজস্ব ও বিচার বিভাগ, সর্বত্রই রতনচাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষত রহিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজী নিয়োগ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে ছিল।[৪৬]

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর মহম্মদ আমিন খান উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মনে হয় নব নিযুক্ত উজীরও প্রচণ্ড প্রভাবশালী ছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত ক্ষমতা তরুণ সম্রাটের ছিল না। বস্তুতপক্ষে 'আওয়াল-উল-খাওয়াকিন'-এর রচয়িতা মহম্মদ কাশিম তাঁহাকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন যে তিনিও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মহম্মদ আমিন খান সম্রাটকে নিছক সাক্ষীগোপালের ভূমিকায় অবনমিত করিয়াছিলেন।[৪৭] তবে উজীর অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত তাঁহার দপ্তরের কার্যকলাপ পরিচালনা করিতেন এবং যদি তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু না হইত তবে আওরঙ্গজেবের আমলে যে সকল নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল, নিঃসন্দেহে সেইগুলির পুনঃপ্রবর্তন হইত।[৪৮] দুঃখের বিষয় উজীরী দপ্তরে, যে স্বল্প সময় তিনি সর্বময় কর্তা ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে রাজস্ব দপ্তরের পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হয় নাই।

১৭২১ খৃঃ[৪৯] (ফেব্রুয়ারী) নিজাম্-উল্-মুল্ক উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৭২৩ খৃঃ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মনে হয় দপ্তরে আসিয়া নিজাম্-উল্-মুল্ক যে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে গদিচ্যুত হইবার পূর্বে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অকৃপণ-ভাবে মনসব বিলি এবং অভূতপূর্ব হারে রাজকুমার, রাজবংশীয় পুরনারী, রাজপুরুষ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে জায়গীর বিলি বণ্টন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে রাজকোষের রাজস্ব আদায় কমিয়া যায়। ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যে সকল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীগণ নগদ মুদ্রায় বেতন গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের বেতন যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যথোপযুক্ত অনুসন্ধান ও রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিবার পর নিজাম-উল্-মুল্ক সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করেন যে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহার আশু সমাধান প্রয়োজন এবং তাহা করিতে হইলে আওরঙ্গজেবের আমলে যে সকল নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল, অবিলম্বে সেই নিয়ম কানুনের

পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে। এই সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কারের একটি বিশদ পরিকল্পনা পেশ করিয়া তিনি অভিযোগ করেন যে পূর্বে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয় নাই, কারণ কয়েকজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ও সম্রাটের কয়েকজন প্রিয়পাত্র তাঁহার বিরুদ্ধে যে জোট পাকাইয়াছিলেন, সেই জোটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অগ্রসর হইবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন, যথা সম্রাটের বৈমাত্রেয় ভগিনী কোকী, হাফিজ খিদমত্‌গার খান, মীর বক্‌সী এবং খান-ই-দউরান।[৫০]

রাজস্ব মন্ত্রকের দৈনন্দিন কাজে যে সকল ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন বিদুষী,সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী কোকী। তিনি সম্রাটের 'কলমদান্‌'-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং সম্রাটের হইয়া স্বাক্ষর করিতেন। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা উৎকোচ হিসাবে অর্জন করেন।[৫১] সম্রাটের প্রিয়পাত্র হাফিজ খিদ্‌মত্‌গার খানকে করায়ত্ত করিয়া সম্রাটও নিজের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ পেশকাশ হিসাবে তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করিতেন। তিনি প্রচার করিতেন যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং রাজকোষের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্যই পেশকাশ গ্রহণ করা হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে দুর্নীতি রাজস্ব দপ্তরের কর্মধারায় বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই দুর্নীতিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্যই এই অজুহাত দেখানো হইতে।[৫২]

এই সকল কারণে রাষ্ট্র প্রশাসন মন্ত্রককে দুর্নীতি মুক্ত করিয়া যথারীতি নিয়মকানুনাযায়ী পরিচালনা করিতে নিজাম-উল-মুল্‌ক অসমর্থ হইয়া পড়েন। অন্য কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া অবশেষে তিনি সম্রাটের নিকট হায়দার কুলি খানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিলেন যে হায়দার কুলি খান রাজস্ব মন্ত্রকের কর্মে অযথা হস্তক্ষেপ করিতেছেন। সম্রাট হায়দার কুলি খানের কর্মপদ্ধতি ও রাজস্ব মন্ত্রকে তাঁহার অহেতুক হস্তক্ষেপ সমর্থন না করিয়া তাঁহাকে গুজরাট চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কোকীর অনিষ্টকর প্রভাব অব্যাহত থাকে এবং তাঁহার উৎকোচ গ্রহণে লোকচক্ষে সম্রাটের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌ক তাঁহাকে এই অপকর্ম হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দিলেন কিন্তু এ আদেশ তিনি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিলেন। সম্রাট নিজে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইলেন না।[৫৩]

সুতরাং ১৭২৩ সালের মধ্যেই উজীরের পদমর্যাদা যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িল এবং স্বাভাবিক নিয়মে দপ্তরে তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী যে ক্ষমতা তাঁহার প্রাপ্য সেই ক্ষমতাও তিনি প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলে সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্র এবং বিশেষ করিয়া রাজস্ব মন্ত্রকের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বিকল হইয়া পড়ে, এবং রাষ্ট্রের কর্তব্যকর্ম যে-ভাবে পালিত হওয়া উচিত তাহা হইতে পারিল না।[৫৪]

অচিরেই এই কথা বুঝা গেল যে সম্রাট ও উজীরের মধ্যে অতি শীঘ্রই এক

প্রচণ্ড সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উজীরের ১৭২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সিদ্ধান্তে ঐ সংকট এড়ানো সম্ভব হইল। পরবর্তী পাঁচ মাস তাঁহার পুত্র ঘাজি-উদ্-দীন-খান তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে উজীরের কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অবশেষে, ১৭২৩ সালের জুলাই মাসে উজীর পদে কামার-উদ্-দীন খানকে অভিষিক্ত করা হইল।[৫৫]

বাহাদুর শাহ্-এর সিংহাসন আরোহণের পর উজীরের ক্ষমতার উত্থানপতন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব মন্ত্রকের কর্মপটুতার ক্রমাবনতি সম্পর্কে আমরা এখন সাধারণভাবে কিছু মন্তব্য করিতে পারি।

প্রাপ্ত তথ্য হইতে দেখা যায় যে মুনীম খানের উজীরপদে নিযুক্ত হইবার সময় হইতে উজীরের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহা মহম্মদ আমিল খানের মৃত্যু পর্যন্ত চলিতে থাকে। মনে হয়, কয়েকজন ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের সক্রিয় বাধা সত্ত্বেও উজীর সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম ছিলেন। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় উজীর চরম প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্বয়ং সম্রাট অথবা তাঁহার প্রিয়পাত্রগণকেও হেয় জ্ঞান করিতেন। মহম্মদ আমিন খানের মৃত্যুর পর উজীরপদের ইতিহাস এক নব পর্যায়ে প্রবেশ করিল। নিজাম-উল্-মুল্কের আমলে উজীরের প্রভাব ও ক্ষমতা নিঃসন্দেহে হ্রাস পাইয়াছিল। মনে হয় উজীরের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে যে বিরোধী শক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই শক্তি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার ফলে শুধু যে উজীর তাঁহার ন্যায্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অপারগ হইতেন তাহা নহে, উপরন্তু শেষে তাঁহাকে উজীরী গদি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন পরিণতি রাজস্ব মন্ত্রকের কার্যকলাপে যথেষ্ট অবনতি ঘটাইতে সহায়ক হয়। এখানে লক্ষণীয় উজীর যে আমলে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং যে আমলে তাঁহার স্বাভাবিক ও আইনসঙ্গত ক্ষমতা হইতেও তিনি বঞ্চিত, উজীরী ইতিহাসের উভয় পর্বেই রাজস্ব মন্ত্রকের সুষ্ঠু ও অপ্রতিহত কার্য সম্পাদন ব্যাহত হইত, এবং তাহার ফলে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক স্থিরতা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয় নাই।

পরবর্তী উজীর কামার-উদ্-দীন খান কুড়ি বৎসরেরও অধিক সময় দপ্তরের দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন,[৫৬] তাঁহার আমলে রাজস্ব মন্ত্রকের কার্যকলাপে অধিকতর অবনতি ঘটে। মারাঠা আক্রমণ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আসন্ন আক্রমণের শঙ্কা, সুবাদারগণের ক্রমবর্ধমান স্বেচ্ছাচারিতা, এই সকল জরুরী সমস্যার চাপে উজীর ও সম্রাটের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিতেছিল, সম্ভবত তাহা মিটাইয়া লওয়া হয়; অথবা এরূপও হইতে পারে যে, তদানীন্তন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যথেষ্ট ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু এই সমস্যার অবসান হইলেও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি করিবার জন্য কোন দৃঢ় প্রচেষ্টা করা হয় নাই। উপরন্তু উজীর ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ রাজকার্যে সম্পূর্ণ অবহেলা করিতেন। রাজসভার পরিবর্তিত

আবহাওয়ায়, উজীর ও সম্রাটের হাল্কা উল্লাস-বিলাসের প্রবণতায় এবং নূতন ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যার উদ্ভবে, রাজস্ব মন্ত্রকের কাজকর্ম পুনর্বিন্যাসের ইচ্ছা বা সুযোগ স্বাভাবিক ভাবেই কমিয়া যাইতেছিল। সম্ভবত সেই সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, সে অবস্থায় কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না।

নিজাম্-উল্-মুল্কের রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর, রাজস্ব মন্ত্রকে কিরূপ বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে, তাজকিরাত উল্-মুল্ক-এর রচয়িতা তাহার এক স্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন। দেওয়ান-ই-খালিসা ও বক্সী নিজেদের কর্তব্য ভু লয়া গিয়া ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণভাবে গা ভাসাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা মনে করিতেন যে, রাজকার্যে সময় অতিবাহিত করা তাঁহাদের মর্যাদার অনুপযুক্ত। এই কারণে তাঁহাদের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য হিন্দু অর্থাৎ কেরানীদিগের (যাঁহাদের অধিকাংশ হিন্দু ছিলেন) হস্তে ছাড়িয়া দিতেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় এইরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল যে সরকারী কর্মচারীর নিয়োগ বা বরখাস্ত, মনসব সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সৈনিকগণের বেতন বিলির ক্ষমতা পেশকার ও কেরানীদিগের হস্তে চলিয়া গেল।[৫৭]

—দুই—

প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসন

দেওয়ান-ই-সুবাঃ আকবরই রাজস্বমন্ত্রকের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে দেওয়ান-ই-সুবা দপ্তরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে প্রতিটি প্রদেশে অন্যান্য কর্মচারীসহ একজন করিয়া প্রাদেশিক দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৫৮] রাজত্বের ৪০শ বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক দেওয়ানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে সুবাদারের নিয়ন্ত্রণ হইতে তিনি স্বাধীন হইয়া পড়েন। দেওয়ান-ই-আলার মাধ্যমে তিনি সম্রাটের কর্তৃত্বাধীন ছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত নথিপত্র উজীরের নিকট সরাসরি পাঠান হইত।[৫৯]

দেওয়ান-ই-সুবার নিয়োগপদ্ধতিঃ উজীরের সুপারিশে দেওয়ান-ই-সুবার নিয়োগ হইত। ইহার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত তাহা হইলঃ পদপ্রার্থী ব্যক্তি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সহ একটি লিখিত বিবৃতি (আইনের ভাষায় যাহাকে 'হাকিকত্' বলা হয়) তৈয়ারি করা হইত। সম্রাটের নিকট এই বিবৃতি পেশ করা হইত এবং তিনি ইহা অনুমোদন করিলে উজীর নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিতেন। [আইনের ভাষায় এই নিয়োগ পত্র 'পরওয়ানা-ই-খিদমত্' নামে পরিচিত।][৬০] এইরূপ একটি পরওয়ানার বা নিয়োগপত্রের নমুনা 'ফারহঙ্গ-ই-কারদানী' নামক পুঁথিতে "পরওয়ানা-ই-খিদমত্-ই-দেওয়ানী" ও "আমিনী" নামে উল্লিখিত আছে। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রশাসনিক কর্মে লিপ্ত কর্মচারী, জায়গীরদার, ফৌজদার, করোরী, জমিদার, চৌধুরী, কানুনগো এবং রায়তগণকে জানানো হইতেছে যে, কোন এক ব্যক্তির

স্থানান্তরে ঐ প্রদেশের দেওয়ানী ও আমিনী দপ্তরের পদ শূন্য হওয়ায় সম্রাটের আদেশ-নামায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করা হইতেছে। উপরিউক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ করিয়া আদেশ-নামায় বলা হইয়াছে যে, দেওয়ানী পদের সমস্ত ক্ষমতা নব-নিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হইল এবং সমস্ত রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিষয় তাঁহার নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতে হইবে। তাঁহারা নূতন দেওয়ানের আদেশ ও অনুশাসন কোনমতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।[৬১]

দেওয়ানের ক্ষমতা ও কর্তব্য: প্রাদেশিক প্রশাসনে দেওয়ান-ই-সুবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদেশের সমগ্র প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্রিয়াকর্মের উপর বিস্তৃত ছিল।[৬২] প্রশাসন ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার অনুসন্ধান এবং সরকারের প্রাপ্য ঋণ ও অন্যান্য বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করিতে হইত। একই সঙ্গে যাহাতে পরগনাগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠে সেইজন্য আবাদী ভূমির সম্প্রসারণ কার্যের প্রতিও তাঁহাকে নজর রাখিতে হইত। রাজকোষের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল। যথাযথ অনুমোদন ব্যতিরেকে যাহাতে কোন অর্থ ব্যয় বা আত্মসাৎ না হয়, দেওয়ানের উপর তাহা দেখিবার দায়িত্ব থাকিত। ফতাদার কর্তৃক প্রেরিত অর্থে রসিদ যাহা প্রাদেশিক সদরের সরকারী কোষাগারে চালান করিতে হইত, তাহা যেন ঠিকমত ফতাদার-গণের প্রতিনিধিদের হস্তে পেঁছায়, দেওয়ানকে তাহার প্রতিও লক্ষ রাখিতে হইত।[৬৩]

মনে হয়, পরগনা-আমিলগণ দেওয়ান-ই-সুবার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। "ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী"-রচয়িতার মতে, ভূমিরাজস্ব আদায় ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা সংগ্রহ সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা তদারক করিবার জন্য আমিন ও করোরীদের যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পাঠাইবার দায়িত্ব দেওয়ান-ই-সুবাকে লইতে হইত।[৬৪] কিছু প্রয়োজনীয় নথীপত্র[৬৫] যথা জমার তালিকা, ফতাদার কর্তৃক রক্ষিত প্রতিদিনের জমা-খরচের হিসাব (রোজনামচা-ই-তহশীল এবং জমা ও খরচ) এবং পরগনার জমা-খরচ হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নাস্‌খা-ই-দেওয়ানী[৬৬] নামক হিসাবের ফর্দ যাহাতে যথাবিধি রাজস্ব দপ্তরে প্রেরিত হয় তাহা লক্ষ রাখিবার দায়িত্বও দেওয়ানকে লইতে হইত। যে সকল শুল্ক সরকার মকুব অথবা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আমিলগণ যাহাতে সেইগুলি উসুল না করে তাহার জন্য আমিলগণের কার্যকলাপের খবরাখবর তাঁহাকে রাখিতে হইত। উপরন্তু আমিলগণ কোনরূপ অর্থ তছরূপ করিতেছেন কিনা তা কাগজ-ই-খান বা পাটোয়ার কর্তৃক রক্ষিত গ্রাম সংক্রান্ত প্রতিটি উসুলের হিসাবের ভিত্তিতে তাঁহাকে আবিষ্কার করিতে হইত। আমিলগণ এইরূপ তছরূপ করিলে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে হইত। কোন আমিল তহবিল তছরূপ বা অন্য কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে যাহাতে সেই আমিলের পরিবর্তে অপর এক ব্যক্তিকে আমিলপদে নিয়োগ করা যায় তাহার জন্য দেওয়ানকে উক্ত ঘটনার বিবরণ সম্রাটের নিকট পেশ করিতে হইত।[৬৭]

এসব ছাড়াও, প্রায় তিরিশটি রেজিস্টারী খাতা তাঁহার দপ্তরে তাঁহাকে রক্ষণ করিতে এবং নস্‌খা-ই-দেওয়ানী ও অন্যান্য কাগজ-পত্রাদি[৬৮] রাজস্ব মন্ত্রকে পাঠাইতে হইত। তাঁহাকে আলাদা আলাদাভাবে ঐসব দলিল-দস্তাবেজের অনুলিপি প্রস্তুত করিতে হইত, এবং ঐ প্রদেশে প্রচলিত নিয়ম-অনুযায়ী ছয়মাস অথবা এক বৎসরের মধ্যে সেইগুলি রাজস্ব মন্ত্রকের নিকট পাঠাইতে হইত। দেওয়ানের পদ হইতে স্থানান্তরিত অথবা অপসারিত হইবার কালে তাঁহাকে উপযুক্ত কাগজ-পত্রাদির নকল নিজস্ব স্বাক্ষর সহ নবনিযুক্ত দেওয়ানের হস্তে অর্পণ করিতে হইত।[৬৯]

যে সকল নথিপত্রাদি দেওয়ান-ই-সুবার দপ্তরে রক্ষিত থাকিত তাহাদের তালিকা পরীক্ষা করিলে দেওয়ানের তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা কত বিস্তৃত ছিল তাহা জানা যায়। মনে হয়, ভূমি-রাজস্ব পরিচালন দপ্তরের সকল বিভাগ, তথা, প্রাদেশিক রাজকোষ, খালিসা, জায়গীর ও মাদাদ-মাস্ ভূমি এবং ভূমি-রাজস্ব অথবা পেশকাশ বা নির্দিষ্ট কর-প্রদানকারী জমিদারিসমূহ তাঁহার অধিকার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাও মনে হয় যে মনসব্‌দারী বিলি ব্যবস্থা এবং মনসব্‌দার ও সৈনিকদিগের নগদ বেতনপ্রদানের ক্ষেত্রেও দেওয়ানের কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল। মাদাদ-মাস্ ভূমির অনুমোদন পুনর্নবীকরণের যাবতীয় কাগজপত্রাদি তাঁহার দপ্তরে রক্ষিত থাকিত। তিনি প্রাদেশিক টাঁকশাল গুলির উপর নজর রাখিতেন এবং দেওয়ানী আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিগণকে যে সকল জেলখানায় রাখা হইত সেই সকল জেলখানা সংক্রান্ত কাগজ-পত্রাদিও তিনি বিচার-বিবেচনা করিতেন। খালিসা মহল সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী তাঁহাদের দপ্তরে যে সকল দলিল পত্রাদি রক্ষিত থাকিত সেগুলির নকল দেওয়ানের নিকট পাঠাইতেন এবং দেওয়ান তাহাদের উপর যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতেন।[৭০] আমাদের অনুমানের সমর্থনে রিয়াজ-উল-সালাতিন পুস্তকে লিখিত তথ্য-সমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লেখকের মতে, প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয়াবলী, রাজস্ব ধার্য ও তাহার সংগ্রহ এবং সরকারী কোষাগারের আয়-ব্যয়ের তদারকির দায়িত্ব দেওয়ান-ই-সুবার হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রতি বৎসর সম্রাট যে দস্তুর-উল-অমাল্ (সংবিধান) জারি করিতেন, সেই সংবিধানের ধারা অনুযায়ী দেওয়ান প্রাদেশিক প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনা করিতেন।[৭১]

রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিভাগ: রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করিবার জন্য একটি প্রদেশকে একাধিক সরকার এবং পরগনা বা মহলে ভাগ করা হইত। মোটামুটি একই হারে রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছে এইরূপ কয়েকটি গ্রামের সমাবেশ রাজস্ব নির্ধারণের একক হিসাবে গণ্য করা হইত এবং এইরূপ এক একটি একক মহল বা কোন কোন ক্ষেত্রে পরগনা বলিয়া পরিচিত ছিল। এই দুইটি শব্দের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল—একাধিক গ্রামের সমষ্টিতে সৃষ্ট রাজস্ব নির্ধারণ ও তাহার সহিত যুক্ত ভূমি-ক্ষেত্রের যুক্ত একককে পরগনা বলা হইত। মহাল বলিতে বিশেষভাবে রাজস্ব নির্ধারণের একককেই বুঝানো হইত, যথা মহাল কাট্‌রা পরচা[৭৩]ও মহাল সায়ের বালদা।[৭৪] যদিও

একাধিক মহালের[৭৫] সমষ্টিতে একটি পরগনা গঠিত হইতে পারিত, তবে সাধারণ ভাবে একটি মহাল লইয়াই পরগনা গঠিত হইত। সেই কারণে সাধারণ ভাষায় এই দুইটি শব্দ বহু ক্ষেত্রেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। কয়েকটি পরগনা লইয়া একটি সরকার গঠিত হইত এবং একজন দেওয়ান-ই-সরকার একটি সরকারের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার একক : প্রশাসনিক কার্যের জন্য একটি প্রদেশকে ফৌজদারী নামে কয়েকটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার এককে বিভক্ত করা হইত এবং প্রতিটি ফৌজদারী একক একজন ফৌজদারের অধীনে থাকিত। কোন অঞ্চলে এই একক চাক্‌লা নামেও পরিচিত ছিল। এক বা একাধিক পরগনা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, একটি সমগ্র সরকার লইয়া একটি ফৌজদারী গঠিত হইত। ফৌজদারের হস্তে যুগপৎ দুইটি দপ্তরের ভার ন্যস্ত ছিল। একদিকে তিনি সামরিক অধিনায়ক এবং অপরদিকে তাঁহার প্রশাসনিক এককের তিনিই শাসনকর্তা। শাসন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল ফৌজদারের। প্রাদেশিক বিচারালয় ও ভূমি রাজস্ব পরিচালন সংক্রান্ত ব্যবস্থার[৭৬] সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন, এবং বিচারালয়ের শুনানী ইত্যাদিতে যে কার্যধারা কাজী ও মফ্‌তীর[৭৭] উপস্থিতিতে চলিত—তিনি সভাপতিত্ব করিতেন। ইহা ছাড়া 'জোরতলব্‌' জমিদারগণের নিকট হইতে তাঁহাকেই ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইত।[৭৮] খালিসা ও জায়গীর উভয় মহালের আমিলগণের রাজস্ব সংগ্রহের কাজে[৭৯] সাহায্য করাও তাঁহার অন্যতম কর্তব্য ছিল।[৮০]

মনে হয়, পরগনাকেই সাধারণতঃ প্রশাসনিক কাঠামোর একক বলিয়া গণ্য করা হইত। এই ব্যাপারে পরগনাটি কি ভাবে গঠিত হইয়াছে—অর্থাৎ একটি সমগ্র ফৌজদারী অথবা ফৌজদারীর অংশ-বিশেষ লইয়া গঠিত কিনা তাহা বিবেচ্য হইত না। কাজী, মফ্‌তী, কানুনগো ও চৌধুরী ইত্যাদি পরগনা কর্মচারীগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহারা আমিলের কর্তৃত্ব হইতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ও প্রশাসনিক সরকার হইতে আদেশ গ্রহণ করিতেন এবং ভূমিরাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের কার্যে আমিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচলিত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিলে তাঁহারা এই কর্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন।[৮১] এই সকল তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে—খালিসা অথবা জায়গীর মহাল, উভয়ক্ষেত্রেই আমিলের কর্তৃত্ব মোটের উপর ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও তাহার সংগ্রহের কর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল। জায়গীর ও খালিসা অঞ্চল সংক্রান্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা মোটামুটি একই প্রকারের ছিল।

দেওয়ান-ই-সরকার : মোঘল যুগের ভূমি-রাজস্ব প্রাদেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে-সকল গবেষণা এখন পর্যন্ত করা হইয়াছে, তাহাতে দেওয়ান-ই-সরকারের দপ্তর সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ নাই। সংশ্লিষ্ট ইতিবৃত্ত ও দলিলপত্রে যে-সকল তথ্যের উল্লেখ আছে তাহা হইতে মনে হয় একটি সরকারের মুখ্য রাজস্ব আধিকারিক দেওয়ান বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু ডঃ সরণের মতে অমাল-

গুজর-ই সরকারের মুখ্য রাজস্ব আধিকারিক ছিলেন।[৮২] তবে প্রাসঙ্গিক তথ্য সমূহ ডঃ সরণের এই অভিমত সমর্থন করে না। বরঞ্চ এই সকল তথ্যাদি হইতে ইহাই মনে হয় যে, অমাল-গুজর পরগনা স্তরের একজন আধিকারিক ছিলেন। আমিলের পদমর্যাদা ও তাঁহার কর্মক্ষেত্রের আঞ্চলিক সীমানা লইয়া পরে আলোচনা করা হইবে, কিন্তু বর্তমানে আমরা সেই সব সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিব, যাহাতে বলা হইয়াছে যে একটি সরকারের মুখ্য রাজস্ব আধিকারিক দেওয়ান বলিয়া পরিচিত। মিরাট-ই-আহম্‌দী পুস্তক হইতে জানা যায় যে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে সরকার ইসলাম নগরের দেওয়ান সামস্-উদ-দীনের উদ্দেশে একটি আদেশনামা জারি করেন। ইহাতে নওয়ানগরের রাজাকে জায়গীর হিসাবে কয়েকটি গ্রাম বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়ানকে দেওয়া হইয়াছে।[৮৩] অপর একটি অনুচ্ছেদে রোশান জামীরকে বন্দর সুরাটের দেওয়ান ও আমিল নিযুক্ত করা হইল বলিয়া ঘোষিত আছে।[৮৪] সম্রাটের রাজ্য পরিষদকে উদ্দেশ্য করিয়া যে চিঠি লিখিতে হইবে তাহার শুরু ও শেষ ভাগে দেওয়ান ও আমিলের সহি থাকা আবশ্যক বলিয়া দেওয়ান-ই-সুবা আদেশনামা জারি করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করি।[৮৫] উক্ত তথ্যাদি হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পেঁছান সম্ভব ঃ

১। দেওয়ান-ই-সুবার অধীনে একাধিক নিম্নপদস্থ দেওয়ান ছিলেন।

২। সরকার পর্যায়ে, দেওয়ান বলিয়া একশ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন যাঁহারা জায়গীর বিলি-ব্যবস্থা ইত্যাদি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করিতেন।

মিরাট-ই-আহমদী পুস্তকের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে পেঁছান যায়, তাহার স্পষ্ট অনুমোদন ও সমর্থন নিগার-নামা-ই-মুন্‌সী পুস্তকের তথ্য হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে সরকার সম্ভল-এর দেওয়ানকে পাঠানো একটি নিয়োগ-পত্রের উল্লেখ আছে।[৮৬] এই পুস্তকেরই অন্যত্র এলাহাবাদ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি চাল্‌কার[৮৭]একাধিক পরগনায় দেওয়ান নিয়োগের উল্লেখ আছে। দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস্ গ্রন্থে একটি নিয়োগপত্রের উল্লেখ আছে, যাহা হইতে দেখা যায় যে একজন দেওয়ানকে একাধিক পরগনার পরিচালন-দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।[৮৮] এই ঘটনাগুলি মিরাট-ই-আহমদী গ্রন্থের উল্লিখিত তথ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, সরকার পর্যায়ে মুখ্য রাজস্ব আধিকারিক দেওয়ান নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া আমাদের যে অনুমান, তাহার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমরা লক্ষ করিয়াছি যে দেওয়ান-ই-সুবার অধীনে একাধিক নিম্নপদস্থ দেওয়ান কাজ করিতেন এবং এইরূপ নিম্নপদস্থ দেওয়ানের কর্মক্ষেত্র একটি সরকার বা কতিপয় পরগনার সমষ্টি নিয়া বিস্তৃত ছিল।

কর্তব্য ও দায়িত্ব ঃ নিগার-নামা-ই-মুন্‌সী পুস্তকে দেওয়ান-ই-সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্বের বিবরণ আছে। তাঁহার কর্তব্য ছিল তত্ত্বাবধান করা এবং তাঁহার এলাকাধীন বিভিন্ন পরগনায় যে সকল কর্মচারীগণ কাজ করিতেন তাঁহাদের কাজের উপর নজর রাখা। কোন সরকারী কর্মচারী যাহাতে

রায়তের নিকট হইতে উৎপন্নের অধিকাংশের অধিক রাজস্ব হিসাবে আদায় না করেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য দেওয়ানের প্রতি আদেশ ছিল। তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হইলে দেওয়ান তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিতেন। করোরী ও ফতাদারগণ যাহাতে কোন সরকারী অর্থ তছরূপ করিতে না পারেন, তাহার প্রতি দেওয়ানকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। যদি হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইত যে কোন কর্মচারী কোন অর্থ তছরূপ করিয়াছেন, তাহা হইলে দেওয়ানকে সেই কর্মচারীকে ডাকিয়া উক্ত তছরূপ সম্পর্কে কৈফিয়ত আদায় করিতে হইত। উপরন্তু, আমিলগণ যাহাতে কোনক্রমেই অর্থ তছরূপ না করিতে পারেন তাহার জন্য কানুনগো ও চৌধুরীগণের নিকট হইতে দেওয়ানকে এই মর্মে মুচলেকা আদায় করিতে হইত যে অর্থ তছরূপের কোন ঘটনা ঘটিলে তাঁহারা সেই খবব দেওয়ানকে দিতে বাধ্য থাকিবেন।[৮৯]

পরগনা স্তরে ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের প্রধান ছিলেন আমিল অথবা অমাল-গুজর। কিন্তু পরগনা স্তরের বিভিন্ন কর্মচারী সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া আমাল-গুজর অথবা আমিলের প্রশাসনিক অধিকার ক্ষেত্র সম্বন্ধে ডঃ সরণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তর্কসাপেক্ষ। তাঁহার মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। "সরকার-স্তরে প্রধান রাজস্ব কর্মসচিব ছিলেন আমিল অথবা অমাল-গুজর। বহু সংখ্যক কর্মচারী তাঁহার কাজে সাহায্য করিতেন। ইহার মধ্যে বিতিক্‌চী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কর্মচারী।"[৯০] পরের অনুচ্ছেদেও আমরা পুনরায় জানিতে পারি যে, "শের শাহ্‌-এর আমল হইতে পরগনা কর্মচারী হিসাবে সিক্‌দার আমিল, কারকুন ও ফতাদার কার্য করিয়া আসিতেছে। কারকুন ও অন্যান্য সরকারী বা আধা সরকারী কর্মচারীদিগের সাহায্যে আমিল রাজস্ব ধার্য ও তাহার সংগ্রহের কাজ করিতেন বটে, কিন্তু কানুনগো, পাটোয়ারী এবং সিক্‌দার (পরগনা প্রধান) ও তাঁহার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন।"[৯১] উপরের বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পেঁছান যায়ঃ

১। অমাল-গুজর (যিনি আমিল নামেও পরিচিত) সরকার-স্তরের প্রধান রাজস্ব প্রশাসনিক কর্মচারী ছিলেন।

২। পরগনায় রাজস্ব-ধার্য ও তাহার সংগ্রহের কাজ মূলতঃ আমিলকেই করিতে হইত।

এই বিবরণ যথেষ্ট স্পষ্ট বা যথাযথ হয় নাই। ইহা পড়িয়া মনে হয় যে পরগনা ও সরকার-স্তরের প্রধান রাজস্ব প্রশাসনিক কর্মচারীগণ একই উপাধি বহন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র পৃথক ছিল এবং সম্ভবতঃ পরগনা-আমিল সরকার-আমিলের অধীনস্থ-কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন। সে যাহা হউক, পরগনা-আমিলকে সরকার-আমিলের (বা অমাল-গুজর) অধীনস্থ কর্মচারি-বৃন্দের যথা বিতিক্‌চী, কারকুন, ফতাদার অথবা খিজানদার—অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। তবুও ডাঃ সরণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা যথেষ্ট স্পষ্ট

এবং তাহা হইল ঃ সরকার স্তরের মুখ্য ভূমি-রাজস্ব-আধিকারিক ছিলেন আমিল বা অমাল-গুজর।

ডঃ ইস্তিয়াক্ হুসেন কুরেশী "আকবরের আমলে পরগনাস্তরের কর্মচারিবৃন্দ"[৯২] শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রশ্নটি লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে আমিল ও অমাল-গুজর একই ব্যক্তি এবং তিনিই পরগনা প্রসাশন ব্যবস্থার মুখ্য প্রশাসক। উক্ত লেখকের যুক্তিগুলির সারমর্ম হইল ঃ

১। তাঁহার (অমাল-গুজর) উপর যে সকল দায়িত্ব আরোপিত ছিল তাহা হইতে মনে হয় যে, গ্রামের কৃষক ও মুখ্য ব্যক্তিগণের সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে কোন মতেই সরকার স্তরের মত বৃহৎ এককের মুখ্য দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না।

২। তিনিই ছিলেন জরিপ কর্মে নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দের আবেক্ষক। সমগ্র সরকার এলাকার জন্য একটিমাত্র জরিপকারী দল নিযুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ রাজস্ব-নির্ধারণ পদ্ধতির তাগিদে কৃষিকর্মে নিয়োজিত-ভূমির পরিমাপ প্রায়শঃ ও ব্যাপক হারে করিতে হইত।

৩। রাজকোষের তত্ত্বাবধানের কাজ তাঁহাকেই করিতে হইত, এবং আইন পুস্তকে যে রাজকোষের বর্ণনা আছে, তাহা পরগনা-স্তরের রাজকোষ।

ডঃ কুরেশীর যুক্তিগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এইগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থানির্ভর। সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয়টির উপর অধিকতর নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে, আমিল বা করোরী পরগনা-স্তরের ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার মুখ্য ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ধার্ডালিকাহ্ পরগনার আমিল তাঁহার সীমানার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলি হইতে গবাদি পশু পাচার করিবার অভিযোগে সোরাথের ফৌজদার শের খানের বিরুদ্ধে নালিশ করেন।[৯৩] পাঠানদের পরগনার করোরী আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে রায়তগণের অভিযোগ থাকায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়।[৯৪] অন্যান্য গ্রন্থেও আমিলকে পরগনা-স্তরের কর্মচারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইক্‌বাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীর গ্রন্থে মহম্মদ সইদ্‌কে জলন্ধর পরগনার আমিল বলা হইয়াছে।[৯৫] আমরা জানি যে জালোর পরগনায় একজন করোরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল।[৯৬] নিগার-নামা-ই-মুনশী পুস্তকে আমরা দেখি যে, ডারওয়েন্ পরগনার আমিল ও করোরী, মহম্মদ হাসিনকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল।[৯৭] ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী পুস্তকে করোরীকে স্পষ্টভাবে পরগনা-স্তরের কর্মচারী বলা হইয়াছে এবং তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ আছে।[৯৮] ইহা হইতে আমরা অনুমান করি যে আমিল বা অমাল-গুজর পরগনা প্রশাসনিক বিভাগের মুখ্য প্রশাসক ছিলেন।

খুলাসত-উস্-সিয়াক্ গ্রন্থে যে সকল তথ্যের উল্লেখ আছে, তাহাও আমাদের উক্ত অনুমান সমর্থন করে। এই পুস্তক লেখকের মতে আমিল বা অমাল-গুজর পরগনা-স্তরের স্থানীয় প্রশাসনের মুখ্য প্রশাসক ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের

অষ্টাদশ বৎসরে প্রতিটি মহালের জমা নির্ধারিত করা হইয়াছিল এবং সেই রাজস্ব যাহার পরিমাণ এক কোটি, দাম উসুল করিবার জন্য একজন করিয়া আমিল নিযুক্ত করা হইয়াছিল।[৯৯] এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রথম যুগে করোরীপদ, পরগনা প্রশাসনের নির্বাহক ও রাজস্ব সংগ্রাহক, এই দুইটি ভিন্ন পদের কর্তব্য যুগ্মভাবে পালন করিত। শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রশাসনিক সংগঠনে কয়েকটি পরিবর্তন আনা হয় এবং পরগনা-আমিলের পদ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়। দেওয়ান-ই-আলা ইসলাম খান (রাজত্বকালের ১৩শ হইতে ১৯শ বৎসর) জমা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি মহালে একজন করিয়া আমিন নিযুক্ত করেন এবং এই আমিনকে সমস্ত বৎসরের জন্য মহালে থাকিত হইত। ফৌজদারী পদ ও ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব ভার করোরীর হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। আমিন ও করোরীর পারস্পরিক কর্তব্য ও পদমর্যাদা পরবর্তী উজীর সাদুল্লা খাঁন এর (বিংশতি বৎসরে) আমলে পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। তিনি একাধিক পরগনা লইয়া একটি চাক্‌লা গঠন করেন এবং প্রতি চাক্‌লার জন্য আমিন ও ফৌজদারের পদ সৃষ্টি করিয়া একই ব্যক্তির হস্তে ঐ দুইটির যুগ্ম দায়িত্ব অর্পণ করেন। করোরী থাকিয়া গেলেন পরগনা-স্তরের কর্মচারী হিসাবে এবং সরকারী রাজস্ব আদায় করিবার দায়িত্ব তাঁহার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তাঁহাকে ৫% হারে দস্তুরি মঞ্জুর করা হইল। এইরূপে মহাল করোরীর পদটির অধস্তন কর্মচারীর পদে পরিণত হইল এবং আমিল ও ফৌজদারের[১০০] নিকট হইতে নির্দেশ গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য থাকিলেন।

স্তুতরাং আমিল ও আমিনের পদ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হইত, ইহাদের প্রত্যেকের দায়-দায়িত্বও পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি এই দুইটি পদে নিয়োজিত হইতেন বটে কিন্তু এই নিয়োগ পদ্ধতি সকল সময় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত না। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে এই দুই যুগ্মপদে নিযুক্ত করা হইত। অনুরূপভাবে, ফৌজদার আমিল এবং আমিনের পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। ১১০৮ হিঃ/১৬৯৬ খৃঃ সইয়দ মহসীনকে গুজরাটের অন্তভূর্ত বা ডাউলিকাহ্‌ পরগনার আমিল এবং আমিনের পদে নিযুক্ত করা হয়। ১১০৯ হিঃ/১৬৯৭ খৃঃ ঐ পরগনারই ফৌজদার ও আমিলের পদে মহম্মদ বাকারকে নিযুক্ত করা হয়। ইহার কিছুপূর্বে আমানত খানকে পাটানদেব পরগনার[১০১] আমিনী ও ফৌজদারী পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আইন গ্রন্থে আমিলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের যে বিবরণ আছে, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রযোজ্য ছিল না। কারণ আকবরের রাজত্বকালে আমিল সমগ্র পরগনা প্রশাসনের মুখ্য প্রশাসক বলিয়া গণ্য হইতেন এবং তিনি একই সঙ্গে আমিন, ফৌজদার ও আমিলের পদ ধারণ করিতেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে কয়েকটি পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আমিন ও ফৌজদারের অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে আমিলের স্থান নির্ধারিত হয়। ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ ও তৎসংক্রান্ত কয়েকটি কর্মের দায়িত্ব আমিলের হস্তে অর্পণ করা হয়।

আমিলের কর্তব্য কর্ম ঃ সমস্ত আবাদী জমি যাহাতে কৃষিকর্মে নিয়োজিত হয়, তাহার পর্যবেক্ষণ করা এবং আবাদী জমির ভূ-রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ-করা আমিলের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।[১০২] খুলাসাত্ উস্-সিয়াক্ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী, নাসাক্-একরার নামায় উল্লিখিত মোট পরিমাণ জমি যাহাতে কৃষিকর্মে নিয়োজিত হয়, এবং কৃষিতে নিয়োজিত জমির পরিমাণ যাহাতে কমিয়া না যায়, তাহা দেখিবার দায়িত্ব আমিলের উপর ন্যস্ত থাকিত। তিনি প্রতিটি টপ্পায় একজন করিয়া টপ্পাদার নিযুক্ত করিতেন। এই টপ্পাদারকে টপ্পায় থাকিতে হইত এবং প্রতিটি গ্রাম ও কৃষকের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া লক্ষ করিতে হইত যেন কোন আবাদী জমি পতিত না থাকে এবং কৃষক অন্যত্র চলিয়া না যায়। কর্ষণযোগ্য জমি যাহাতে কৃষিকর্মে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার জন্য আমিনের নিকট হইতে দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষকদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্বও তাঁহাকে লইতে হইত। তাহা ছাড়া ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইত। কৃষক যাহাতে ভূমি-রাজস্ব ফাঁকি দিতে না পারে তাহা দেখিবার জন্য তাঁহাকেও পদাতিক রক্ষীদল নিযুক্ত করিতে হইত। আমিন কর্তৃক রচিত তুমার-ই-জমাবন্দী বা ধার্য ভূমি-রাজস্বের দলিল অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে পাঠাইতে হইতে।

দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় রাজকোষে গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁহাকে আমিন ও ফতাদারের সহিত একযোগে দায়িত্ব লইতে হইত। তিনি নিজের ও আমিনের শীলমোহর দ্বারা রাজকোষের কুলুপ বন্ধ করিয়া তাহার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তবে দেওয়ানের অনুমতি বিনা এক কপর্দক তিনি ব্যয় করিতে পারিতেন না।

তৃতীয়তঃ, চৌধুরী, কানুনগো ও মোকাদ্দাম প্রভৃতি আধা-সরকারী কর্মচারী-গণের পারিশ্রমিক তাঁহাকে নির্ধারণ করিতে হইত। বৎসরের শেষে মোট ধার্য-রাজস্ব সংগৃহীত হইলে, তিনি এই সকল কর্মচারীদের, নান্কার, রসুম্ ও ইনাম ইত্যাদি উপরি পাওনার যথাযথ হিসাব-নিকাশ করিয়া দিতেন। দস্তুর হিসাবে তাঁহার নিজস্ব বরাদ্দ নির্দিষ্ট ছিল, মোট রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ।[১০৩]

সর্বশেষে একাধিক রেজিস্টারী নথিপত্র রক্ষা করিবার ও সেইগুলি রাজসভায় পাঠাইবার দায়িত্ব তাঁহাকে লইতে হইত। এই রেজিস্টারী নথিপত্রগুলি প্রতিটি ফস্লী বৎসরের শেষে তাঁহাকে পাঠাইতে হইত। সমস্ত বৎসরের মোট আয়-ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও তাহাকে পেশ করিতে হইত।[১০৪]

আমিল কর্তৃক রক্ষিত হিসাবসমূহের পরীক্ষা ঃ আমিল-দপ্তরে সংরক্ষিত রাজস্ব সংগ্রহের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষিত হইত। নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য করের পরিমাণের অধিক আমিল সংগ্রহ করিয়াছেন, এইরূপ তথ্য পাওয়া গেলে ঐ বাড়তি পরিমাণের হিসাব করিয়া তাহা আমিলের নিকট হইতে আদায় করা হইত। এই পদ্ধতিটি বার-অমাদ বা বার-অমাদ-ই-আমিলান নামে পরিচিত ছিল। এই ধরনের বে-আইনী সংগ্রহ রাষ্ট্রের

প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ইহার হিসাবের দায়িত্ব আমিনের উপর বর্তাইত।[১০৫] শাহজাহানের আমলে এই পদ্ধতির প্রচলন হয় এবং মনে হয়, মহম্মদ শাহ্-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত ইহা কার্যকরি থাকে। পূর্বে, এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে উসুল করা হইত না। শাহজাহানের রাজত্বকালে, দেওয়ান-ই-আলার পেশকার, রায় রায়ন যশোবন্ত রায় পাটোয়ারীগণের নিকট হইতে কাগজ-ই-খাম[১০৬]আদায় করিয়া তাহা পারশিক ভাষায় অনুবাদ করিরাছিলেন। এই দলিলপত্রাদি হইতে প্রমাণিত হইল যে, করোরীগণ প্রচুর অর্থ তছরূপ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে স্থির হয় যে, সরকার কর্তৃক আমিলের নিকট হইতে প্রাপ্য পরিমাণের তুমার-ই-বার অমাদ, পাটোয়ারী কর্তৃক সংরক্ষিত কাগজ-ই-খামের ভিত্তিতে রচনা করিতে হইবে। উক্ত পরিমাণ, করোরী, ফতাদার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের—যাঁহারা মাল-ও-জিহাতের অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করিতেন—নিকট হইতে আদায় করা হইবে। এই আদেশ বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি মহালে দুইজন কর্মচারী—দারোগা[১০৭]ও হিসাব-রক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছিল। পাটোয়ারীব কাগজ-ই-খামের অনুবাদ এবং তুমার-ই-বার-অমাদ[১০৮] বা আমিলের নিকট প্রাপ্য অঙ্কের হিসাব রচনা করিবার জন্য বার-অমাদ-নবীশ নামে নব সৃষ্ট দপ্তরের উদ্ভব হইয়াছিল।

বার-অমাদ-নবীশ ঃ নব-সৃষ্ট বার-অমাদ-নবীশ দপ্তরটি মহম্মদ শাহ[১০৯] এর রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মনে হয়, প্রতি পরগনায় একজন করিয়া বার-অমাদ-নবীশ নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পাটোয়ারী কর্তৃক সংরক্ষিত কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিতেন, এবং তুমার-ই-বার-অমাদ বা আমিলের নিকট প্রাপ্য অঙ্কের হিসাব তৈয়ারি করিতেন। তুমার রচনা কর্মে চৌধুরী, কানুনগো ও জমিদারগণ-তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। পাটোয়ারী কর্তৃক সংরক্ষিত কাগজ-পত্রাদি বার-আমাদ নবীশ এর নিকট পেঁছাইয়া দিবার জন্য-তাঁহাদের উপর আদেশ ছিল। অপরদিকে বার-অমাদ-নবীশকে সহায়তা করিবার দায়িত্ব পাটোয়ারীর উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব হিসাব-পরীক্ষকগণ আমিলের[১১০] নিকট হইতে প্রাপ্য পরিমাণের হিসাব তৈয়ারি করিতেন।

আমিন ঃ আকবরের আমলে আমিনকেও, দেওয়ান, বক্সী ও সদর-এর মত একজন দায়িত্বপূর্ণ প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হইত। উদাহরণ স্বরূপ গুজরাট প্রদেশে একজন আমিন নিযুক্ত ছিল।[১১১] পরবর্তী কালে, প্রতিটি প্রদেশে আমিন নিয়োগের প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১১২] তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি আমিন ও দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিতথাকিতেন।[১১৩] আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে প্রাদেশিক আমিনের দায়-দায়িত্বের বিশদ বিবরণ নাই। তবে আইন-ই-অমাল-গুজর গ্রন্থের একটি উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যের ক্ষতির উপর আমিলের রিপোর্টের যথার্থতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য আমিনকে পাঠানো হইত।[১১৪] আওরঙ্গজেবের রাজত্বে রচিত, খুলাসত্-উস্-সিয়াক্ গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থদ্বয়ে বিবৃত সাক্ষ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে

আকবরের রাজত্বকালে, প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া আমিন নিযুক্ত থাকিতেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কোন মহালে অঘটন ঘটিলে, আমিলের অনুরোধে উক্ত আমিন সেই মহাল পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার পরামর্শে ও তাঁহার সহিত একমত হইয়া, অনিবার্য প্রাকৃতিক কারণে শস্যের ক্ষতি হওয়ায় রাজস্বের পরিমাণে যুক্তিযুক্ত রেহাই মঞ্জুর করিতেন। কর্তব্য কর্মের শেষে তিনি সদর দপ্তরে ফিরিয়া আসিতেন। দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালে, দেওয়ান-ই-আলা ইসলাম খান, প্রতিটি মহালে আমিন নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে জমা নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।[১১৫]

পরগনা-আমিন: পরগনা আমিনকে সম্রাট ও রায়তগণের মীমাংসক হিসাবে গণ্য করা হইত। রায়তগণের নিকট হইতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য উসুল এবং যাহাতে তাহাদের উপর কোন অন্যায় বা উৎপীড়ন না করা হয়, তাহা দেখা আমিনের কর্তব্য ছিল। যাহাতে উৎপন্নের অর্ধেকাংশ রাষ্ট্রের জন্য সংগৃহীত হয় এবং বাকি অর্ধেক রায়তের হাতেই থাকিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হইত। কোন অঞ্চলে কত জমি কৃষিকর্মে নিয়োজিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রচলিত নিয়মানুসারে সেই জমির রাজস্ব নির্ধারণ করা তাঁহার মুখ্য দায়িত্ব ছিল। কৃষিকর্মে নিয়োজিত কোন জমি যাহাতে তাঁহার নজর এড়াইয়া প্রতারক ও অসৎ ব্যক্তির ভোগে না আসে তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল। মোয়াজিনা-ই-দাহ্-সালার ভিত্তিতে বিগত দশ বৎসরের ধার্য-রাজস্বের তুলনামূলক হিসাব ও কৃষিকর্মে নিয়োজিত প্রতিটি ক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া তিনি নির্দিষ্ট বৎসরগুলির রাজস্ব নিরূপণ করিতেন।[১১৬] সমগ্র পরগনায় রাজস্ব নির্ধারণের কর্ম সম্পন্ন হইলে, চৌধুরী, কানুনগো এবং কাজীর স্বাক্ষর সংযোগে তুমার-ই-জমাবন্দী তৈয়ারি করিতেন। করোরীর নিকট হইতেও তিনি এই মর্মে এক মুচ্‌লেকা গ্রহণ করিতেন যে, মোট ধার্য রাজস্ব[১১৭] সংগ্রহ করিবার জন্য করোরী অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিলেন। আমিন তাঁহাদিগকে পাট্টা (ইজারা প্রদানের দলিল) বিলি করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কবুলিয়ৎ (ইজারা গ্রহণের দলিল) গ্রহণ করিতেন। পরগনার কৃষি সংশ্লিষ্ট ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য-সরবরাহ করিবার উপযুক্ত প্রায় ষোলটি রেজিস্টার তিনি রাখিতেন এবং তাঁহার দপ্তরে রক্ষিত রাজস্ব ও অন্যান্য নথিপত্র রাজস্ব মন্ত্রকে পাঠাইবার দায়িত্ব তাঁহার হস্তে থাকিত। কোষাগার পরিচালনার কর্মেও তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিতেন এবং অন্যান্য কর্মচারীগণের সহিত যুগ্মভাবে কোষাগারে রক্ষিত নগদ অর্থের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁহাকে বহন করিতে হইত।[১১৮] উপসংহারে করোরী, কানুনগো, চৌধুরী ও জমিদারগণের উপর তাঁহাকে নজর রাখিতে হইত এবং সম্রাট কর্তৃক নিষিদ্ধ করসমূহ যাহাতে তাঁহারা সংগ্রহ না করেন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইত।[১১৯] সুতরাং পরগনা-স্তরের রাজকর্মচারীগণের তদারক করিবার কিছু ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

কারকুন: পরগনার ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনে কারকুন একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী ছিলেন। আকবরের আমলে আমিলের অধস্তন কর্মচারী হিসাবে

তিনি কার্য করিতেন। ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ এবং পরগনা কোষাগারে গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা ও সদ্‌ব্যবহার সংশ্লিষ্ট কর্মের সহিত তিনি যুক্ত থাকিতেন। খালিসা আমিলের অধীনে কারকুন ও খাস্‌-নবিশ নামক দুইজন 'বিতিক্‌চি' থাকিতেন।[১২০] আইন-ই-অমাল-গুজর ও আইন-ই-খিজানাদার গ্রন্থে তাঁহার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি উল্লেখ আছে। মনে হয়, পাটোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে কারকুনও স্বাধীনভাবে জব্‌ত্‌ প্রথার কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিতেন। আমিল দলিল দুইটি মিলাইয়া লইতেন এবং কারকুন কর্তৃক জব্‌ত্‌ কর্মের লিপিবদ্ধ দলিলে তাঁহার শীলমোহর লাগাইতেন। এই দলিলের একটি প্রতিলিপি কারকুনের নিকট পাঠানো হইত।[১২১] জব্‌ত্‌ কর্মের শেষে তাঁহাকে গ্রামের মুনতাখাব্‌ দলিলে[১২২] স্বাক্ষর করিতে হইত এবং প্রতি সপ্তাহে এই দলিল আদালতে প্রেরিত হইত। রাজস্ব সংগ্রহ কর্মের তদারকি এবং দৈনিক প্রাপ্তির খতিয়ান রাখা তাঁহার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপ একটি খতিয়ান আমিল ও খিজানাদারকেও রাখিতে হইত।[১২৩] উপসংহারে অন্যান্য কর্মচারীগণের সহিত কোষাগারে গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা রক্ষা এবং রাজস্ব মন্ত্রকের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই অর্থ ব্যয় করিবার দায়িত্ব তাঁহাকে লইতে হইত। প্রাপ্ত অর্থ কারকুনের পরিচিত কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া কারকুনের খতিয়ানের সহিত নিজস্ব প্রাপ্তি-খতিয়ান মিলাইবার জন্য খিজানাদারের প্রতি নির্দেশ ছিল। সাধারণভাবে দেওয়ানের পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে কোষাগারের কোন অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার খিজানাদারের থাকিত না। তবে জরুরী অবস্থায় কারকুন ও শিক্‌দার এইরূপ ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিতেন, কিন্তু যথাসময়ে এইরূপ ঘটনা আদালতকে জানাইতে হইত।[১২৪]

সপ্তদশ শতকে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পরগনার ভূমি-রাজস্ব পরিচালনে কারকুনের স্থান অপরিবর্তনীয় থাকিয়া গিয়াছিল। রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ এবং পরগনা-কোষাগারে গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা ও সদ্‌ব্যবহারের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিতেন।[১২৫] তাঁহাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট দলিল রক্ষা করিতে হইত এবং প্রত্যেক ঋতুর শেষে সেইগুলি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত। উপরন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে তাঁহাকে রাজস্ব সংগ্রহের ধারাবাহিক বিবরণ এবং পক্ষকাল অন্তর আয়-ব্যয়ের বিবরণ পাঠাইতে হইত।[১২৬]

পরগনা-কোষাগার ঃ প্রত্যেক পরগনার নিজস্ব কোষাগার থাকিত। খিজানাদারের—সাধারণ-ভাবে যিনি ফতাদার নামে পরিচিত—নেতৃত্বে একাধিক কর্মচারী ইহা পরিচালনা করিতেন। আকবরের রাজত্বকালে আমিল, কারকুন ও শিক্‌দার কোষাগারের তত্ত্বাবধান কর্মে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন এবং পরগনা-কোষাগারে গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা ও যথাযথ ব্যবহারের দায়িত্ব তাঁহাদের হস্তে যুগ্মভাবে থাকিত। মনে হয়, পরবর্তীকালে কোষাগারের কর্মচারিবৃন্দের সহিত দারোগা-ই-খিজানা ও মুশরিফ্‌কেও যুক্ত করা হইয়াছিল।

খিজানাদার ঃ আকবরের আমলে খিজানাদার বা কোষাধ্যক্ষ সাধারণভাবে ফতাদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ, নগদ আদায়ের নিরাপত্তা

রক্ষা, হিসাবপত্র রক্ষা এবং কোষাগারে রক্ষিত নগদ অর্থের যথাযথ ব্যয়—এই কর্মগুলি তাঁহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষকগণ তাঁহাদের দেয় অর্থ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা অন্যান্য যে কোন মুদ্রায় প্রদান করিলে তাহা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইত। কোন একটি নির্দিষ্ট মুদ্রায় অর্থ আদায় করিবার জন্য পীড়াপীড়ি না করিতে তাঁহার প্রতি নির্দেশ ছিল। তিনি সম্রাটের মহিমাঙ্কিত মুদ্রার উপর ছাড় দাবি করিয়া কেবলমাত্র ঘাটতির সমপরিমাণ মুদ্রার ওজনে আদায় করিতে পারিতেন না। কারকুন ও শিক্‌দারের জ্ঞাতসারে নগদ অর্থ কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া তাহা গণনা করিতে হইত। তিনি একটি স্মারকলিপি রচনা করিয়া তাহার উপর অমাল-গুজরের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেন, আদায় খতিয়ানের সহিত কারকুন কর্তৃক সংরক্ষিত খতিয়ান মিলাইয়া প্রামাণ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ইহার উপর নিজস্ব স্বাক্ষর বসাইতেন। কোষাগারের দ্বারে আমিল তাঁহার শীলমোহরে ছাপ দিবার পর, খিজানাদার নিজের তালা ঐ দরজায় লাগাইতেন এবং আমিল ও কারকুনকে যথারীতি সংবাদ জ্ঞাপন করিবার পরই কোষাগারের চাবি খুলিতেন। কৃষকগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যথারীতি রসিদ তাহাকে বিলি করিতে হইত। যাহাতে হিসাবে কোন গরমিল না থাকে, তাহার জন্য খিজানাদারের হিসাবের উপর পাটোয়ারীর স্বাক্ষর খিজানাদাবকে সংগ্রহ করিতে হইত। কোষাগারে সংরক্ষিত অর্থ ব্যয় করিবার ব্যাপারে সংবিধানে এই নির্দেশ ছিল যে দেওয়ানের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কারণেই খিজানাদার কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না। জরুরী প্রয়োজনে—খরচ স্থগিত রাখিবার সুযোগ না থাকিলে—কারকুন ও শিক্‌দারের লিখিত অনুমতি লইয়া প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা চলিত। তবে যথাসময়ে এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত।[১২৭]

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে একই প্রকার দায়দায়িত্ব খিজানাদারকে বহন করিতে হইত।[১২৮] মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রুসুম-ই-ফতাদারী বলিয়া পরিচিত কয়েক প্রকার দস্তুরি ফতাদারের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইত। 'রুসুম' খাতে সংগৃহীত অর্থের পাঁচ-ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ হিসাব পরীক্ষার সময় কোন গরমিল ধরা পড়িলে তাহা নিষ্পত্তি করিবার জন্য তাঁহার নিজস্ব হেফাজতে মজুত রাখিতে হইত।[১২৯]

দারোগা-ই-খিজানা: আইন গ্রন্থে দারোগা-ই-খিজানার কোন উল্লেখ না থাকিলেও পরবর্তী কালের দলিল পত্রেও দারোগা-ই-খিজানা দপ্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিয়োগ-পত্রে দারোগার দায়-দায়িত্বের যে বিবরণ আছে তাহা হইতে মনে হয় যে, পরগনা-কোষাগার দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরগনা-কোষাগারের পরিদর্শন ও ইহার কার্যাবলীর সমন্বয় করা তাঁহার মুখ্য দায়িত্ব ছিল। পরগনা-কোষাগারে যে অর্থ প্রতিদিন সংগৃহীত হইত তাহার নিরাপত্তা এবং কারকুন, হিসাবরক্ষক ও ফতাদার প্রদত্ত হিসাব সমূহে প্রাপ্ত নগদ অর্থের যে লিখিত বিবরণ থাকিত তাহা যথার্থ পরীক্ষা করার দায়িত্ব তাঁহার উপরে ন্যস্ত থাকিত। নগদ অর্থ কোষাধ্যক্ষের নিজস্ব প্রকোষ্ঠে ও নিজস্ব

শীলমোহর সহ তালা বন্ধ থাকিত এবং কোষাগার পরিচালনায় যে সকল কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিতেন, তাঁহাদের সকলের অনুমতিক্রমেই চাবি খোলা হইত। ফতাদার যাহাতে এক কর্পদকও আত্মসাৎ করিতে এবং দেওয়ানের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন খরচ করিতে না পারেন, তাহার জন্য অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত দারোগা-ই-খিজানা ব্যয়িত অর্থের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতেন। যথা সময়ে সৈনিকগণকে বেতন প্রদান করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হইত। উপসংহারে, প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ও কোষাগারে রক্ষিত নগদ মুদ্রার হিসাব-নিকাশের খতিয়ানের একটি প্রতিলিপি তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিতে হইত।[১৩০]

—তিন—

কানুনগো এবং চৌধুরীর বংশানুক্রমিক দপ্তর:

মোগল সরকারের জায়গীর হস্তান্তরের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার দৃঢ়তা অথবা অবিচ্ছিন্নভাবে স্থানীয় দলিলপত্রাদি রক্ষার কার্যকে যথেষ্ট ব্যাহত করিয়াছিল। জমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ, রাজস্ব বন্দোবস্ত সংক্রান্ত প্রচলিত ধারা, নিয়ম ও রীতি এবং ধার্য রাজস্বের হার ও পদ্ধতি যে সব দলিল-পত্রে লিখিত থাকিত তাহা ঠিকমত না পাইলে একজন রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের পক্ষে তাঁহার কর্ম সুনির্বাহ করা সম্ভব হইত না। ইহার ফলে স্থানীয় প্রশাসনে কিরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে জায়গীরদার ও রাজস্ব আধিকারিকের পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হইত তাহা কানুনগো ও চৌধুরী নামক বংশানুক্রমিক কর্মচারিগণ অনেকাংশে পূর্ণ করিতেন। রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য, জমিতে বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও স্বত্ব এবং রাজস্ব নির্ধারণের হার ও পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থানীয় প্রথা ও রীতি এবং জমিদারী পরিবার-বর্গের তালিকার পূর্ণ দলিলপত্রাদি কানুনগোদিগের নিকট থাকিত। অনুরূপ দলিলপত্রাদি চৌধুরীগণের নিকটও থাকিত।[১৩১]

কানুনগো: মনে হয়, অন্তত কয়েকটি প্রদেশে—সুবা[১৩২] সরকার[১৩৩] ও পরগনা[১৩৪], এই তিনটি ভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে কানুনগো নিয়োজিত হইত। রাজস্ব মন্ত্রকে[১৩৫] পাঠাইবার জন্য দেওয়ান কর্তৃক রচিত হিসাব পত্রের উপর প্রাদেশিক কানুনগো স্বাক্ষর প্রদান করিতেন। অন্যদিগকে মোয়াজিনা ও দস্তুর-উল্-অমাল[১৩৬] ইত্যাদি-রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল এবং পরগনা-কানুনগোর নিকট হইতে গ্রামসমূহের তালিকা ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী টীকা সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব স্বাক্ষর যোগে এই সকল দলিল রাজস্ব মন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করা, সরকার-স্তরের কানুনগোর দায়িত্ব ছিল।[১৩৭] পরগনা-কানুনগোর কার্যকলাপের উপর তদারক করিবার কিছু ক্ষমতাও সরকার-স্তরের কানুনগো ভোগ করিতেন।[১৩৮]

পরগনা-কানুনগো: প্রাদেশিক ও সরকার স্তরের কানুনগোগণ নিজেরা কোন দলিল রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না। পরগনা-কানুনগো কর্তৃক সংরক্ষিত

দলিলপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া সেইগুলি প্রেরণ করাই তাঁহাদের মুখ্য কর্ম ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে, পরগনা-স্তরে কানুনগো দলিল সংরক্ষণ করিতেন এবং সম্ভবতঃ স্থানীয় ভূমি প্রশাসনে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইতেন। সাধারণতঃ প্রতি পরগনায় একজন করিয়া কানুনগো নিযুক্ত হইতেন তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরগনায় একাধিক কানুনগোর নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৩৯]

দায়িত্ব : জমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বত্ব এবং রাজস্ব নির্ধারণের হার এবং পদ্ধতি সংক্রান্ত রীতিনীতির পূর্ণ নথিপত্রাদি সংরক্ষণ করা কানুনগোর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল। একাধিক রেজিস্টার তাঁহার নিকট থাকিত এবং এগুলি হইতে পরগনার কৃষি সংক্রান্ত ভূমি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যাইত। নিম্নলিখিত দলিলপত্র তিনি সংরক্ষণ করিতেন।[১৪০] তক্‌সীম্‌ বা মোয়াজিনা দাহ্‌সালা, দস্তুর-উল্‌ অমাল বা নগদ হার, গ্রামসমূহের তালিকা, জমাদানির অঙ্ক এবং আয়মা[১৪১] ভূমির দলিল, যাহাতে ভূমি বণ্টনের বিশেষ কারণগুলি (অর্থাৎ ফারমান অথবা স্থানীয় কর্মচারীর আদেশ মারফত জমি বিলি করা হইয়াছিল) উল্লিখিত থাকিত।

হিসাবপত্র এবং রাজস্ব সংগ্রহের কাগজপত্র—যথা রাজস্ব বন্দোবস্ত,[১৪২] জমিদার বা ইজারাদারের চুক্তির প্রতিলিপি কানুনগোকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইত। তাঁহার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল জমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বত্ব এবং বিক্রয়, বন্ধকী অথবা নিঃস্বত্ব দানের[১৪৩] মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার লিখিত বিবরণ সংরক্ষণ করা। কোন জমিদারীর বিক্রয়-কবালা সম্পাদিত হইবার সময় কানুনগোকে সংবাদ দিতে হইত এবং বিক্রয়-কবালায় এই কথা বিশেষভাবে লিখিত থাকিত যে পরগনা কানুনগোর জ্ঞাতসারেই উক্ত কার্য সম্পন্ন করা হইতেছে।[১৪৪]

উপরন্তু, রাজস্ব নির্ধারণকর্মের সহিতও কানুনগো সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। নির্ধারিত রাজস্ব ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য হইয়াছে বলিয়া আশ্বস্ত হইলে তিনি চৌধুরীর সহিত একযোগে দৌল বা জমার হিসাবে স্বাক্ষর প্রদান করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজস্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে ও ইহাতে রায়তের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হয় নাই, এই মর্মে সাক্ষ্য দিতেন।

পারিশ্রমিক ও ভাতা : আকবরের রাজত্বের প্রথম যুগে, সাদ্‌দোই খাতে পাটোয়ারী কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ অথবা পাটোয়ারীর প্রাপ্য দস্তুরির ২% হারে কানুনগোর পারিশ্রমিক নির্ধারিত হইত। সংগৃহীত অর্থের অর্ধাংশ পাটোয়ারীর প্রাপ্য ছিল। তবে পরবর্তীকালে আকবর এই প্রথা রদ করিয়া রাষ্ট্রকে সাহায্য করিবার পারিশ্রমিক হিসাবে কানুনগোর জন্য মাহিনা প্রথা চালু করিয়াছিলেন।[১৪৫] নগদ মাহিনার পরিবর্তে, উহার সম পরিমাণ আয় প্রদানে-সক্ষম জমি, তাঁহাকে বিলি করা হইত। কিন্তু, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ সংক্রান্ত পরবর্তী তথ্য-সমূহ হইতে দেখা যায় যে, কানুনগোকে জমি বিলি করিবার পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হইয়াছিল এবং রায়তদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ অর্থ দস্তুরি প্রথায় তাঁহাদিগকে প্রদান করা হইত। রায়তের প্রাপ্যাংশ হইতে

শতকরা ২ ভাগ হারে আদায় করিবার অধিকার কানুনগোদের প্রদান করা হইয়াছিল এবং এই দস্তুরি রুসুম[১৪৬] নামে পরিচিত ছিল।

চৌধুরীঃ আক্ষরিক অর্থে চৌধুরী হইল চারিটি অংশ বা মুনাফার অধিকারী এবং গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি। ইহার দ্বারা জমিদার ও তালুকদারের[১৪৭] সমশ্রেণীভুক্ত ভূ-সম্পত্তির মালিকও বুঝাইত। পরগনা-স্তরে চৌধুরী একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন এবং স্থানীয় ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের সহিত তিনি একাধিক ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মনে হয় চৌধুরীর দপ্তরটি বংশানুক্রমে বর্তাইত।[১৪৮] সাধারণতঃ পরগনাস্তরের চৌধুরীর দপ্তরে একজন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন।[১৪৯] কিন্তু এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন প্রথা প্রচলিত ছিল না। একটি পরগনায় একাধিক চৌধুরীর নজিরও কিছু কিছু সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায়।[১৫০]

দায়-দায়িত্বঃ রাজস্ব নির্ধারণ ও রাজস্ব সংগ্রহের কর্মের সহিত চৌধুরী যুক্ত ছিলেন। বাৎসরিক বা সাময়িক রাজস্ব নিরূপণের জন্য আমিন গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইলে, চৌধুরীও সঙ্গে থাকিতেন এবং আমিন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন।[১৫১] কানুনগোর সহিত তিনিও জমাবন্দী দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করিতেন এবং এই মর্মে প্রমাণ পত্র দাখিল করিতেন যে পরগনার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ, তাঁহার, কানুনগোর ও মোকাদ্দামের সহিত পরামর্শ করিয়াই নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহাদের সম্মতি রহিয়াছে।[১৫২] রাজস্ব সংগ্রহের কর্মের সহিতও চৌধুরী সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কানুনগো ও মোকাদ্দামগণের সহিত যুগ্মভাবে তিনি এই মুচ্‌লেকা দিতেন যে পরগনার ধার্য রাজস্ব করোরী মারফত কোষাগারে জমা করা হইবে।[১৫৩]

খাজনা-তালিকা ও তুমার-ই-আফাৎ (বা কি পরিমাণ শস্যের ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ) ইত্যাদি সংক্রান্ত কাগজপত্রে চৌধুরী সাক্ষ্য দান করিতেন।[১৫৪] পরগনার কৃষি সংশ্লিষ্ট ভূমি-ব্যবস্থার বিশদ বিবরণের এবং জমির বিভিন্ন স্বত্ব সংক্রান্ত দলিল পত্রাদি তিনি সংরক্ষণ করিতেন। মোয়াজিনা-ই দাহ্‌সালা, গ্রাম সমূহের তালিকা, নিষ্কর জমি বিলির দলিল ও দস্তুর-উল্‌ অমাল[১৫৫] ইত্যাদি দলিল পত্রাদি তিনি করোরীকে যোগান দিতেন।

কৃষিকর্মের ব্যাপক প্রসারের জন্য চৌধুরীকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইত। উপরন্তু তাঁহার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় অবাধ্য ও রাজদ্রোহীদিগের শাস্তি ও দমন করিবার কার্যে সরকারী কর্মচারিগণের সহিত তাঁহাকে সহযোগিতা করিতে হইত।[১৫৬]

ভাতা বা দস্তুরিঃ রাষ্ট্রকে সাহায্য করিবার জন্য চৌধুরীকে নিষ্কর জমি প্রদান করা হইত। জাহাঙ্গীর যে সকল চৌধুরী পাঞ্জাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সকলকেই নিষ্কর জমি বিলি করিয়াছিলেন। এই বিলি-ব্যবস্থাকে তিনি মাদাদ-মাস বা খোরাকি ভাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১৫৭] পরবর্তী যুগের দলিলপত্র হইতে জানা যায় যে, খোরাকি ভাতা বাবদ এইরূপ নিষ্কর ভূমি বিলির প্রথা অব্যাহত ছিল। তবে এই প্রথা মাদাদ-মাসের পরিবর্তে নান্‌কার বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। নান্‌কার জমি চৌধুরীগণকে প্রদান করা হইত, এই মর্মে

কিছু তথ্য আছে।[১৫৮] রাষ্ট্রের তরফ হইতেই নানকার ভূমি প্রদান করা হইত বটে কিন্তু চৌধুরীর পারিশ্রমিক মাঝে মাঝে রায়তগণের নিকট হইতেও আসিত। রায়তের প্রাপ্যাংশ হইতে ১% হারে নির্দিষ্ট দস্তুরি তাঁহার প্রাপ্য ছিল, এবং এই পরিমাণের অধিক সংগ্রহ বা সংগ্রহের প্রত্যাশা করা তাঁহার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল।[১৫৯] রায়তদিগের নিকট হইতে ১০ হারে রুসুম হিসাবে যাহা সংগৃহীত হইত, তাহাকে যদি নানকার ভূমি প্রদানের সহিত একীকরণ করা না হয় তবে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে চৌধুরীকে একদিকে রাষ্ট্রের ভৃত্য, অপরদিকে কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং তাঁহার কর্তব্য কর্মের জন্য, উভয় পক্ষই তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিতেন।

—চার—

ইজারা বা রাজস্বের বন্দোবস্ত

ইজারা বা রাজস্ব বিলি-বন্দোবস্ত প্রথার অভিব্যক্তি—বিশেষ করিয়া খালিসা জমির ক্ষেত্রে—অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মনে হয়, তৎকালীন যুগে একটি প্রথার প্রচলন ছিল। তাহা হইল, রাজস্ব সংগ্রহ করিবার মত স্থানীয় এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব আছে, এরূপ কোন ব্যক্তি বা মহাজনকে প্রয়োজন হইলেই জায়গীরদারগণ তাঁহাদের জায়গীরের রাজস্ব বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু মোঘল সম্রাটগণ খালিসা ভূমির রাজস্ব বিলি বন্দোবস্ত করিবার বিপক্ষে থাকায় এই পদ্ধতির প্রচলন যথেষ্ট সীমিত ছিল। তবে রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল পত্রের তথ্য হইতে অনুমান বরা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষ করিয়া বাহাদুর শাহ্-এর মৃত্যুর পর, খালিসা জমি ইজারা দিবার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় এবং ঐ শতকের শেষ বৎসরগুলিতে এই পদ্ধতি মোঘল সাম্রাজ্যের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সর্বাধিক উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার সহিত এরূপ কয়েকটি প্রথার বিকাশ ঘটিয়াছিল, যাহাদের উদ্ভব হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই। এই পদ্ধতি রাজস্ব সংগ্রহকারী হিসাবে যেমন এক মধ্যস্বত্ব শ্রেণী তৈয়ারি করিয়াছিল তেমনি বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসা জমিদার নামে পরিচিত মধ্যস্বত্ব অথবা জমিতে কোনরূপ দাবি বা স্বত্ব আছে এরূপ অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থও অতিশয় ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার চরিত্র: অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রচিত রাজস্ব-সংক্রান্ত পরিভাষার এক সংকলনে ইজারা প্রথার বিশদ ব্যাখ্যা আছে। মনে হয় ইজারা এক ধরনের চুক্তি এবং ইহার দ্বারা এক বা একাধিক মহালের রাজস্বের বিলি-বন্দোবস্ত বুঝাইত। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে ইজারাদার বাধ্য থাকিতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষতিবৃদ্ধির সহিত উক্ত পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকিত না। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে রাজস্ব-প্রদানের যে অংশ স্বীকৃত হইয়াছে, ইজারাদার তাহা নির্ধারিত

কিস্তিতে পাঠাইতেন এবং দেয় পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য কোন আবেদন করিবার অধিকার তাঁহার থাকিত না। তবে চুক্তিতে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত উল্লিখিত থাকিলে, তিনি আবেদন করিতে পারিতেন।[১৬০] একধরনের ইজারা 'রসদ্ আফজুদ্' বলিয়া পরিচিত ছিল। এই ব্যবস্থা সেইরূপ গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য 'জমা' হ্রাস পাইয়াছিল এবং ইহার দ্বারা ধরিয়া লওয়া হইত যে প্রথম দফায় মূল 'জমা'র তুলনায় স্বল্প হারে রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রদান করিতে ইজারাদার চুক্তিবদ্ধ। তবে চুক্তিতে এইরূপ নির্দেশও থাকিত যে, নির্ধারিত মূল রাজস্বের হার প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে ইজারাদার তাঁহার দেয় রাজস্বের বাৎসরিক কিস্তি বৃদ্ধি করিয়া যাইবেন।[১৬১] ইহা বাদেও, 'মুতাহিদি' নামে অপর একরূপ ইজারা প্রথার প্রচলন ছিল। 'ইজারা' ও 'মুতাহিদি' প্রথার মধ্যে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের যে অঙ্ক স্থিরীকৃত হইত, তাহা প্রদান করিবার দায়িত্ব ব্যতিরেকে অপর কোনও শর্ত পূর্বোক্ত প্রথার চুক্তিতে আরোপিত থাকিত না। অপর পক্ষে পরোক্ষ প্রথার চুক্তিতে পরগনার জমিদারগণের নিকট হইতে ধার্য রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া তাহা রাজকোষে পাঠাইবার শর্ত আরোপিত থাকিত। মনে হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শস্যহানি হইলে 'মুতাদিহি' চুক্তিতে আবদ্ধ ইজারাদার তাঁহার দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করাইবার সুযোগ পাইতেন। তবে সে ক্ষেত্রে তাঁহার আবেদনের যথার্থতা সম্পর্কে সরকারের অনুমোদন লাগিত। অপরদিকে পরগনা রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটিলে তাঁহাকে সেই খবর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে জানাইতে হইত। উপসংহারে, ইজারাদার ও মুতাহিদ এর মধ্যে মূল পার্থক্য হইল, পরোক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন।[১৬২]

সুতরাং ইজারা প্রথা বলিতে সরকার বা জায়গীরদারের তরফ হইতে নির্ধারিত সময়ের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্কের পরিমাণ সরকারী কর্মচারী অথবা জায়গীরদারের হস্তে সমর্পণ বুঝাইত। ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে ইজারাদার একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসাবে কার্য করিতেন। কিন্তু জমিতে তাঁহার কোন স্বত্ব অর্জিত হইত না এবং এই খানেই মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে জমিদারের সহিত তাঁহার পার্থক্য ছিল। ইজারাদারের ভূমি-রাজস্বের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ অথবা উহা সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যে সকল দায়দায়িত্ব বহন করিতে হইত, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ কি ভাবে করা হইত, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ মোঘল-যুগের রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল পত্রে নাই। দলিলপত্রে সংগৃহীত সাক্ষ্যাদি হইতে জানা যায় যে, ইজারাদারকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইত এবং ইহার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইতে মনে হয় যে মোট দেয় অর্থের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে দর কষাকষির ভিত্তিতে স্থির করা হইত। আমরা ইহাও অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, যে পরগনা ইজারা দেওয়া হইতেছে সেই পরগনা হইতে যে পরিমাণ আয় হইতে পারে, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বল্প পরিমাণে ইজারাদারের সহিত বন্দোবস্ত করা হইত। যাহার ফলে ইজারাদারের হস্তে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অর্থ থাকিয়া যাইত। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে একজন সুদক্ষ ইজারাদার রাজস্ব

নির্ধারণকালে অঘোষিত অর্থাৎ মূল জমার বহির্ভূত আবাদী জমি আবিষ্কার এবং তদনুযায়ী যথাযথ রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিতেন। সতর্ক দৃষ্টি ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফলে ইজারাদার নির্ধারিত জমা হইতে অধিক পরিমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সরকার বর্ধিত সংগ্রহের উপর কোনরূপ দাবি করিতে পারিত না। পতিত জমি কি পরিমাণে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহার উপর রাজস্ব ধার্য করা এবং 'বালা-দাস্ত' প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে কর-সংগ্রহ ইজারাদারী উপস্বত্বের মূল উৎস ছিল।[১৬৩] এইগুলিই তাঁহার আইনসঙ্গত আয়ের উৎস। ইহা ছাড়া পরিমাপের ভিত্তিতে আবাদী জমির উপর রাজস্ব ধার্য করিয়া নূতন জমা তৈয়ারি করিবার অধিকারও তাঁহার ছিল।[১৬৪] এই পদ্ধতি অবলম্বন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলে তাঁহার আয় বা লভ্যাংশ বাড়িয়া যাইত। কিন্তু ইহার ফলে জমিদার ও কৃষকের উপর অত্যধিক আর্থিক চাপ পড়িত এবং কৃষিজীবী ও কৃষিকর্মের বিনাশ ঘটিত। সুতরাং ইজারা প্রথাকে কোনক্রমেই সুষ্ঠু রাজস্ব-পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা চলে না। এই প্রথায় কৃষক ও জমিদারের ক্ষতির উপর ভিত্তি করিয়া ইজারাদারের মুনাফার সৌধ গড়িয়া উঠিত। ইজারাদারের অত্যাচারে কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবীর বিনাশ ঘটিলে, সরকারী রাজস্বের ক্রমাবনতি ঘটিত। নিচে যে সকল তথ্যের বিশ্লেষণ করা হইতেছে, তাহা হইতে উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যাইবে।

দিল্লীর সুলতানী আমলে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় ইজারা প্রথা অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। কিন্তু শেরশাহ ও আকবরের আমলে ইহা নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে[১৬৫]এই প্রথা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সপ্তদশ শতকে ইহার সুদূরবিস্তৃত প্রচলন ঘটে। আমরা জানি যে শাহজাহান-এর রাজত্বকালে পর্তুগীজগণ বাংলাদেশের কয়েকটি মহাল ইজারা প্রথায় অর্জন করে।[১৬৬] সাদিক্-খানের বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে শাহজাহান এর রাজত্বকালে ইজারা প্রথার বহুল প্রচলন হয়। বস্তুতঃ ইহার ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক অংশ ধ্বংসে পরিণত হয়।[১৬৭]

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে রসিক দাস করোরীর উদ্দেশে লিখিত এক ফারমান পরোক্ষভাবে উক্ত অনুমান সমর্থন করে। এই ফারমানে রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল প্রস্তুতি প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্দেশ আছে। একটি নির্দেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর প্রতিটি গ্রামে কত ইজারাদার ও কৃষিজীবী আছে তাহার হিসাব রাখিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।[১৬৮] ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সাম্রাজ্যের প্রতিটি পরগনায়—প্রতিটি গ্রামে না হইলেও—ইজারাদারের সন্ধান পাওয়া যাইত। ফারমান হইতে ইহাও জানা যায় যে, সিংহাসন লাভের পর সম্রাটের ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা উপরোক্ত বিবৃতির মারফত প্রকাশিত হয়। ফারমানে যে সকল শর্ত ও প্রথার উল্লেখ আছে, সেইগুলি নিছক আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের কথা নহে, পরন্তু এই সকল শর্ত বা প্রথার সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে, ইহাদিগকে পূর্ববর্তী যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার জের বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং ফারমানের বিবৃতি হইতে ইজারা প্রথার যে

ব্যাপক প্রচলনের কথা জানা যায়, তাহা নূতন ভাবে সৃষ্টি হয় নাই। বস্তুতঃ শাহজাহানের রাজত্বকাল হইতেই তাহা চলিয়া আসিতেছিল।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে কি ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেইগুলি আংশিকভাবে বিভ্রান্তিকর। একদিকে আমরা দেখি যে, আলোচ্য যুগে এই প্রথার বিলোপসাধন অথবা তাহার প্রচলন এরূপভাবে হ্রাস করার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল যাহাতে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত না হয়। অপরদিকে এরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায় যে প্রচলিত আইনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই প্রথা প্রচলিত থাকিয়া যাইতেছে। খালিসা ও জায়গীর ভূমির উপর ইজারা প্রথা রোধ করিতে প্রথম যে হুকুম নামা ১০৮৭ হিঃ/১৬৭৬খ্রীঃ জারী করা হয়, তাহার উল্লেখ মিরাট-ই-আহমদী গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী আহমেদাবাদ প্রদেশে চৌধুরী ও মোকাদ্দামগণকে জমির ইজারা প্রদান করিবার প্রথা সম্রাটকে জানান হয়। সম্রাটকে প্রেরিত এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত প্রথার মাধ্যমে রায়তদিগের প্রতি প্রচণ্ড অবিচার ও উৎপীড়ন চালান হয়। সম্রাট এই প্রথা অনুমোদন করিয়া ইহার প্রচলন সীমিত রাখিতে আদেশ জারী করেন। প্রাদেশিক দেওয়ানের প্রতি এক নির্দেশে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই খালিসা ও জায়গীর ভূমির ইজারা স্বত্ব লইতে পারিবেন না এবং আমিলগণ যাহাতে এই হুকুমনামা কার্যকর করেন, তাহার জন্য দেওয়ানের প্রতি আদেশ জারী করা হয়।[১৬৯] "ইজারা প্রথার বিলোপ প্রসঙ্গে" এই শিরোনামায় অপর একটি আদেশের উল্লেখ 'নিগার নামা-ই-মুন্সী' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহা কোন তারিখে জারী করা হয় তাহার উল্লেখ নাই এবং এই তারিখ নির্ণয় করাও সম্ভব নহে। আমরা কেবলমাত্র এই কথাই বলিতে পারি যে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই আদেশ জারী করা হইয়াছিল। ইহাতে খালিসা ভূমির আমিন ও করোরীদিগের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত পরগনা সমূহের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির ইজারা তাঁহাদের আত্মীয়-বর্গ, সরকারী কর্মচারী ও চৌধুরীগণকে প্রদান করিবার পরিবর্তে গ্রামের মালিকগণ যাহাতে তাঁহাদের কার্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করেন ও তাঁহাদের দেয় ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করেন। তবে উক্ত সংবিধানে একথা বলা আছে যে, পরিত্যক্ত গ্রাম অথবা যে সকল গ্রামের কৃষিজীবিগণ অত্যন্ত দরিদ্র, সে সকল গ্রামের ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী ধার্য জমা সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে এইরূপ গ্রাম দুইটি শর্তে ইজারা দেওয়া যাইবে : প্রথমতঃ ইজারা দিবার পূর্বে জমির মালিকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ কেবল সেইরূপ ব্যক্তিকেই ইজারা দেওয়া যাইবে, যিনি সরকারী কর্মচারী অথবা চৌধুরী নন।[১৭০]

দেখা যাইতেছে যে, মিরাট-ই-আহমদী গ্রন্থে উল্লিখিত আদেশনামা খালিসা ও জায়গীর উভয় ভূমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু নিগার-নামা-ই-মুন্সী গ্রন্থে উল্লিখিত আদেশনামায় কেবলমাত্র খালিসা ভূমির ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বলা হইয়াছে। অপরদিকে, মিরাট-ই-আহমদীর

আদেশনামায় নির্দিষ্ট আছে যে কোন অবস্থাতেই ইজারা প্রথা চলিবে না কিন্তু নিগার-নামা-ই-মুনশী আদেশনামায় কয়েকটি শর্তে খালিসা ভূমির সীমিত পরিমাণ ইজারা প্রদানের অনুমতি স্বীকৃত হইয়াছে। যে সকল গ্রামের জমা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, সেই সকল গ্রাম ইজারা প্রথায় বিলি করা চলিবে বলিয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইজারা প্রথার সংশ্লিষ্ট নিয়মটি যে বাস্তবে রূপায়িত করা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রবর্তিত অপর একটি হুকুমনামা হইতে পাওয়া যায়। দুই অথবা তিনটি গ্রামের ইজারা স্বত্ব প্রার্থনা করিয়া একটি আবেদনের উপর উক্ত আদেশনামা জারী করা হইয়াছিল। এই আদেশনামায় যে সকল গ্রাম পরিত্যক্ত অথবা যে সকল গ্রামে কৃষিকার্য পরিত্যাগ করা হইয়াছে, সেই সকল গ্রামের সন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট জমার ভিত্তিতে সেইগুলির ইজারা প্রদান করিবার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।[১৭১] অতএব, যদিও ইজারা প্রথা বাতিল অথবা সীমিত করা রাজস্ব মন্ত্রকের নীতি বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল, তবুও নিত্য কর্মসূচী হিসাবে কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় সরকার এই প্রথার প্রচলন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তবে সরকারী কর্মচারী, চৌধুরী ও মোকাদ্দামগণের ইজারা লইবার বিরুদ্ধে রাজস্ব মন্ত্রকের তীব্র আপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় এবং এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথাটি যাহাতে পরিত্যাগ করা হয়, সে বিষয়ে ঐ মন্ত্রক সচেষ্ট ছিলেন।

ইজারা প্রথা সম্পর্কে রাজস্ব মন্ত্রক উপরোক্ত নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে ১৬৭৬ খ্রীঃ পরবর্তী যুগে যেসকল সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ইজারা প্রথা রদ প্রকল্পে ১৬৭৬ খ্রীঃ প্রচারিত আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ইজারাব্যবস্থা বজায় থাকিয়া যায়। ১০৯০ হিঃ/১৬৯৭ খ্রীঃ সংকলিত 'ফারহাঙ্গ-ই কারদানী' একটি কাবুলিয়ত এব (চুক্তি দলিল) নিদর্শন আছে। ইজারা স্বত্বে যে পরগনা বিলি করা হইয়াছিল, সেই পরগনার উপর ধার্য জমা প্রদান করিবার অঙ্গীকার পত্র হিসাবে ইজারাদার উক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দলিলের সাহত সংযুক্ত টীকায় বলা হইয়াছে যে, আমিন ও করোরীগণ ইজারা স্বত্বে নির্দিষ্ট কিছু গ্রাম বিলি করিতেন।[১৭২] এই সাক্ষ্য হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৭শ শতকের সপ্তম দশকের শেষভাগে ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইজারা প্রথা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ইজারা প্রথার বিলোপ-সাধনে যে সকল আইন পাস করা হয়, আমরা পূর্বেই সেগুলির বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এই প্রথা সম্পর্কে যে সকল পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহাদের সমন্বয় করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, 'মিরাট-ই-আহমদী' গ্রন্থে যে আদেশনামার উল্লেখ আছে, তাহা ১৬৭৬ খ্রীঃ গুজরাট প্রদেশের এক বিশেষ অবস্থার সহিত মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। অপরদিকে, 'নিগার-নামা-ই-মুনশী' গ্রন্থে উল্লিখিত আদেশনামা অধিকতর ব্যাপক অর্থে এই প্রথার আইনসঙ্গত স্থান নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে জারী করা হয়। কারণ, পরোক্ত আদেশ-নামায় বিশেষ অবস্থায় ইজারা প্রথার প্রচলন স্বীকার করা হইয়াছে। 'ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী' গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদি কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে

ক্ষেত্রে, 'নিগার নামা-ই-মুনসী' গ্রন্থে উল্লিখিত নিয়মাবলীর কাঠামোর মধ্যে ইজারা প্রথা স্বীকৃত হইয়াছিল। ইজারা প্রথা সংবিধান সম্মত অথবা সংবিধান বিরোধী যাহাই হউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ১৬৭৬ খৃঃ পরেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। অপর একটি গ্রন্থে আমরা দেখি যে ১১00 হিঃ/১৬৯৯খৃঃ পাললুল পরগনার অন্তর্ভুক্ত হিসামপুর গ্রামটি ইজারা স্বত্বে অধিকৃত হইয়াছিল।[১৭৩] আমরা দেখি যে, মহারাজা যশোবন্ত সিং এর বিধবা রাণী হাদি, যোধপুর পরগনা জায়গীর হিসাবে প্রার্থনা করিয়া এই অনুরোধ জানাইতেছেন যে, কোন কারণে ঐ আবেদন নামঞ্জুর হইলে, উক্ত পরগনার ইজারা স্বত্ব যেন তাঁহাকে মঞ্জুর করা হয়।[১৭৪]

মনে হয় যে, জাহান্দার শাহ্ এর রাজত্বকাল হইতে প্রশাসন যন্ত্রের সকল বিভাগে সরকারী কার্যের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা শিথিল হইতে শুরু হয়।[১৭৫] তবে ফারুখ্‌সিয়ারের আমলে সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামোয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের হাল যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহারাও ইজারা প্রথার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন। শাকির খান-এর বিবৃতি অনুযায়ী, সাদিক খান কখনও জমির ইজারা বিলি করেন নাই। অফিস হইতে তাঁহার অপসারণের পর আবদুল্লাহ খানের (উজীর) দেওয়ান, রতনচাঁদ ঘৃণ্য ইজারা প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিলেন। ফলে অসংখ্য মানুষের সর্বনাশ ঘটে।[১৭৬] অপর এক সূত্রে দেখা যায় যে, আবদুল্লাহ খান্ এর সম্পর্কে ফরুখ্‌সিয়ারের প্রচণ্ড বিরূপতা ছিল। উজীরের বিরুদ্ধে সম্রাটের ক্ষোভের একটি কারণ ছিল এই যে, কোন আমিল নিয়োগ করিবার সময় নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট হইতে উজীর একটি অঙ্গীকারপত্র আদায় করিয়া তাঁহার মহাজনের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হইলে, দেশের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া ফরুখ্‌সিয়ার বিশ্বাস করিতেন। সম্রাটের অনুমান যেহেতু এইরূপ নিয়োগ পদ্ধতি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক, অতএব এই পথ পরিত্যাগ করা বিধেয়। ইহার পরিবর্তে একজন নিয়মিত সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমিলকে নিয়োগ করিয়া, রাজস্ব বাবদ যে অর্থ তিনি সংগ্রহ করিবেন, সেই অর্থের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হস্তেই রাখিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ খান্ সম্রাটের সহিত একমত হইলেন না। কাফী খান্ এর বিবরণ অনুযায়ী রতনচাঁদ রাজস্ব মন্ত্রকের কার্যকলাপে এত অধিক হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে পদমর্যাদার দিক হইতে 'দেওয়ান-ই-তান' ও 'দেওয়ান-ই-খালিসা'র স্থান প্রচণ্ড নামিয়া গেল, এবং পণ্য বিক্রয়ের মত খালিসা পরগনাসমূহ ইজারা বিলি করিয়া রতনচাঁদ লক্ষাধিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছিলেন। এই অপকর্মের জন্য সইয়্যদ আবদুল্লাহ্ খান এর প্রতি সম্রাটের বিরাগ অধিকতর ঘনীভূত হইয়া উঠে।[১৭৭] অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জঘন্য ইজারা প্রথার প্রচলন অব্যাহত থাকে। উজীরীপদে নিযুক্ত করিয়া (১৭২১) নিজাম্-উল্-মুল্‌ক্ রাজস্ব দপ্তরের কার্যকলাপ বিশদভাবে পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশদ পরিকল্পনা রচনা করেন। তাঁহার কল্পনায় একটি মুখ্য

প্রস্তাব ছিল খালিসা ভূমিতে ইজারাপ্রথা রদ করা[১৭৮]—যাহা দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। প্রস্তাবিত সংস্কার সম্রাটের সম্মতি লাভ করে এবং আশা করা হয় যে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন অচিরেই ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হইবে। কিন্তু প্রস্তাবিত সংস্কার কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের খুঁটিতে কুঠারাঘাত করায়, যে ব্যক্তি দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিবার পূর্বেই স্বার্থান্বেষীর দল তাঁহার উপর আঘাত হানে। উজীরের বিরুদ্ধে তাঁহারা সম্রাটের মন বিষাইয়া তুলিতে সক্ষম হন এবং উজীরকে ১৭২৩ খ্রীঃ দিল্লী পরিত্যাগ করিতে হয়। এই ঘটনার প্রশাসনিক তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, ঘৃণ্য ইজারা প্রথার অবসান কল্পে উজীর প্রস্তাবিত সংস্কার কার্যকর করিতে রাজী হইলে, তবেই উজীর ও সম্রাটের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হইত।[১৭৯]

এইরূপ কিছু তথ্য আছে যাহা হইতে দেখা যায় যে, খালিসা ও জায়গীর ভূমি ইজারা বিলি পদ্ধতি মহম্মদ শাহ্-এর রাজত্বের শেষভাগেও প্রচলিত ছিল। অপর সূত্রে জানা যায় যে আলী-মহম্মদ খান রুহেলা আরামপ্রিয় জায়গীরদার ও উদাসীন উজীরের নিকট হইতে একাধিক মহাল ইজারা সূত্রে লাভ করিয়াছিল।[১৮০] দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্ গ্রন্থে সংকলিত দুইটি দলিল হইতে দেখা যায় যে, মহম্মদ শাহ্-এর রাজত্বকালে খালিসা ও জায়গীর ভূমির ইজারা বিলি একটি সুপ্রচলিত প্রথা হইয়া পড়িয়াছিল।[১৮১] তাঁহার তালুকে বহু ধনী ইজারাদারের উপস্থিতির উল্লেখ শোভা সিং এর আবেদনে পাওয়া যায়। এই সাক্ষ্য আমাদের পরীক্ষিত অন্যান্য আকরিক গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদি অনুমোদন করে এবং ইজারাদারী পদ্ধতির একটি পরিষ্কার চিত্র তুলিয়া ধরে। জানা যায় যে, ভূমি-রাজস্ব প্রদানে অকৃতকার্য হওয়ায় স্থানীয় ভূমি-রাজস্ব আধিকারিক, জমিদার শোভা-সিং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার অবাধ্যতা ও শত্রুতার অভিযোগ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিতে পারেন। পূর্বোক্ত আবেদনে, জমিদার তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তাঁহার তালুকে কৃষিকর্মের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার বর্ণনা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করিয়া ন্যায্য ভূমি-রাজস্ব ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব পেশ করেন।[১৮২] বিগতযুগের সমৃদ্ধিশালী দিনগুলির ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি এই আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, বিগত পাঁচ বা ছয় বৎসর যাবৎ এমন কিছু ধনী অনভিজ্ঞ ইজারাদার সদর হইতে তাঁহার তালুকে আসিতেছেন, যাঁহারা দেশের সমৃদ্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সর্বোচ্চ পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং তাঁহাদের কর্মপদ্ধতিতে দেশ ও রায়তকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাওয়া। আবেদনপত্র হইতে মনে হয় যে এইসকল কারণে শোভা সিং ইজারাদারদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অত্যধিক রাজস্ব প্রদানের ঝুঁকি লইতেও রাজী হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পদের শেষ কপর্দক পর্যন্ত পণ করিয়া শোভা সিং ঐ সংকটের মোকাবিলা করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ভূমি-রাজস্ব ক্রমান্বয়ে

অন্যায় হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে চরম নিঃসহায় অবস্থায় পড়িতে হয়। অবশেষে তিনি হাল ছাড়িয়া প্রতিযোগিতা হইতে বাধ্য হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। তালুকটি ধ্বংসে পরিণত হইলে ইজারাদারেরা ঐ জেলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। স্থানীয় প্রশাসক পুনরায় সাবেকী জমিদারের সহিত নির্দিষ্ট শর্তে রাজস্ব প্রদানের চুক্তি করিতে বাধ্য হন।

আকর-গ্রন্থাদিতে যে সকল তথ্যের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে ইজারা প্রথার ব্যাপকতা ও তদানীন্তনকালে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে ইহার প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। ইহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ফারুখ সিয়রের রাজত্বকালে ইজারা প্রথার প্রচলন যথেষ্ট ব্যাপক ও সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই অবস্থা অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী যুগ পর্যন্ত বজায় ছিল। ইজারা প্রথার অভূতপূর্ব ব্যাপক প্রচলনে ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই প্রশাসন-ব্যবস্থার ভারসাম্য অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে। এই প্রথা এক শ্রেণীর মহাজন ও ফাটকাবাজ সৃষ্টি করে, যাহারা ইজারা ব্যবস্থায় তাঁহাদের অর্থ লগ্নী করিয়া বংশানুক্রমিক জমিদার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একশ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নূতন ইজারাদার শ্রেণী সাধারণতঃ শহরাঞ্চল হইতে আসিত এবং জমিদারের স্বার্থে অনবরত বিঘ্ন ঘটাইত। উপর হইতে চাপানো এই নূতন ইজারাদার শ্রেণীর অভ্যুদয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, স্বাভাবিক জমা হইতে অধিক হারে রাজস্ব প্রদান করিবার প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে। সর্বাধিক উচ্চহারে যিনি রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হইতেন, রাজস্ব সংক্রান্ত চুক্তি তাঁহারই সহিত করা হইত। ইহার ফলে রাজস্ব বন্দোবস্তে নির্ধারিত জমার পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বংশানুক্রমিক জমিদারগণ এক প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হইলেন।[১৮৩] তাঁহারা পড়িলেন উভয় সংকটে, হয় অধিকতর জমায় নিলামের প্রতিযোগিতায় ইজারাদারকে পরাস্ত করিয়া ভূসম্পত্তি ডাকিয়া লইতে হয়, নতুবা প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া পড়িতে হয়, এবং উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহাদের পক্ষে ধ্বংসের বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। অত্যধিক হারে ভূমি-রাজস্ব প্রদানের বন্দোবস্তে রাজী হইলে জমিদারের হস্তে উদ্বৃত্ত অর্থ সামান্যই থাকিত। সেইক্ষেত্রে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করের বোঝা কৃষকের উপর চাপাইয়া উচ্চহারে খাজনা আদায় করিতে হইত। এই পরোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে কৃষকের সর্বনাশ হইত এবং গ্রামগুলি পরিত্যক্ত হইয়া পড়িত। অপরদিকে প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া আসিলে তাঁহার আশু জীবিকার অবসান ঘটিত। সুতরাং ইজারা প্রথার ব্যাপক প্রচলনে বহুসংখ্যক প্রাচীন ও বংশানুক্রমিক জমিদার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ কৃষিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাচীন জমিদারশ্রেণীর ধ্বংসের মধ্য দিয়া এক নূতন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়। ইজারাদারগণ যে সকল জমিদারের রাজস্ব স্বত্ব নিলামে অধিক রাজস্ব হারের বিনিময়ে ক্রয় করিতেন, সেই সকল জমিদারের অনেকে চরম আর্থিক সংকটে পড়িয়া তাঁহাদের জমিদারী স্বত্ব যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। স্বভাবতই প্রতিবেশী ধনী

জমিদার ও শহরবাসী মহাজনশ্রেণী এই সুযোগ গ্রহণ করিতে কার্পণ্য করিতেন না। কারণ এইরূপ জমিদারী ক্রয়-বিক্রয়ের ঘটনায় গ্রাম-হিন্দুস্থানের আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[১৮৪] প্রতিবেশী ধনী ও শক্তিশালী জমিদারগণ তাঁহাদের সম্পত্তি বা তালুকের সীমানা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। অন্যদিকে শহরবাসী মহাজন 'গরহাজির' জমিদারশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। ইহার ফলে গ্রাম-ভারতের আর্থিক ও সামাজিক ভারসাম্য প্রচণ্ড ভাবে ব্যাহত হয় এবং অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে দেশের শাসনভার ইংরেজ সরকার গ্রহণ করিবার পরই ঐ ভারসাম্য ফিরিয়া আসে।

কৃষকশ্রেণীর উপর ইজারাদারী প্রথার ফলাফল অধিকতর মারাত্মক আকার ধারণ করে। ইজারাদার অথবা জমিদার, রাজস্ব বন্দোবস্ত যাহার সহিতই করা হউক, অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার ফলে ভূমি-রাজস্বের হার বৃদ্ধি পাইত এবং এই করের বোঝা শেষ পর্যন্ত কৃষক শ্রেণীকেই বহন করিতে হইত। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহে এই বলিয়া তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, একমাত্র মহাজনশ্রেণী বাদে দেশের অন্যান্য সকল শ্রেণীর মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে। লোভী ইজারাদারের উৎপীড়নে গ্রামাঞ্চল ও কৃষিজীবীর ক্ষয়ক্ষতির যে চিত্র শোভা সিং প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা রাজধানী অথবা বিভিন্ন প্রাদেশিক সদরে রচিত বিবরণগুলির সাক্ষ্যের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ধার্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ কৃষিজীবী শ্রেণীর দুঃখ-দারিদ্র্যের মূল কারণ নহে; পরন্তু ইহার কারণ সন্ধান করিতে হয় ইজারা প্রথার প্রচলনে। কারণ এই প্রথা ইজারাদার ও বংশানুক্রমিক জমিদারের মধ্যে এক অবাস্তব প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়া, শেষ পর্যন্ত রাজস্ব প্রদায়ী ব্যক্তিদের উপর ধার্য রাজস্বের হার এত অধিক পরিমাণে চাপাইয়া দেয় যে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের পক্ষে তাহা বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্ধিত ভূমি-রাজস্বের ভার কৃষক শ্রেণীর স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলে কৃষকশ্রেণীর উপর শোষণের ব্যাপকতা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়া যায়।

এখন দেখিতে হইবে ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সরকারী কোষাগারের উপর ইজারা প্রথার প্রভাব কি ভাবে পড়িয়াছিল। ভূমি-রাজস্বের বিশদ নিরূপণ ও তাহা সংগ্রহের জন্য যে সকল নিয়মিত সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, ইজারা প্রথার ব্যাপক প্রচলনে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন থাকিল না। ইহার ফলে এমন এক শ্রেণীর মানুষ কর্মহীন হইলেন যাঁহারা ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক কর্মে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরগনা-স্তরের প্রশাসন যন্ত্র যাহা আকবরের আমল হইতে বিভিন্ন মোগল সম্রাটগণ অতি পরিশ্রমের সহিত নির্মাণ করিয়াছিলেন, বিকল হইয়া পড়িল। ইজারা প্রথার প্রচলনে সরকারী কোষাগারের প্রাপ্য রাজস্বও যথেষ্ট কমিয়া গেল। কৃষকশ্রেণীর উপর প্রচণ্ড শোষণের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা দেখা দিবার ফলে কৃষকের সর্বনাশ ঘটিল এবং গ্রামগুলি পরিত্যক্ত হইয়া পড়িল। উৎপীড়িত কৃষক নিকটবর্তী সেই

সকল জমিদারের জমিদারীতে পলাইয়া গেল, যাঁহারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরাসরি অস্বীকার করিতেন, রাজস্ব প্রদানে অবহেলা করিতেন, অথবা কেবলমাত্র তখনই রাজস্ব প্রদান করিতেন যখন কোন শক্তিশালী রাজপুরুষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইতেন। সুতরাং সর্বোচ্চ ক্রেতার সহিত ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার ফলে কয়েক বৎসরের জন্য সরকারী কোষাগারে বর্ধিত হারে অর্থ সমাগম হইলেও শেষ পর্যন্ত ফাটকাবাজ ইজারাদার যে-সকল অঞ্চলের ইজারা লইতেন, সেই সকল অঞ্চল হইতে রাজস্ব আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইত। এই ঘটনার সত্যতা তদানীন্তন যুগের ঐতিহাসিক ও প্রশাসকগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ফারুখসিয়রের মত একজন অপদার্থ সম্রাটও এই ঘৃণ্য প্রথার তীব্র নিন্দা করিয়া ইহা রদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রতনচাঁদের নেতৃত্বে কায়েমী স্বার্থ তাঁহার ক্ষীণ প্রতিবাদ স্তব্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরে নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার যথাযথ পুনর্গঠনে এই প্রথার অবসান একান্ত প্রয়োজনীয়। সে যাহাই হউক প্রশাসনিক ব্যবস্থা সহ তাহার ব্যাপক সংস্কারের—ইজারা প্রথার অবসানও যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল—প্রকল্প কায়েমী স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করে, কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিবর্গও প্রত্যাঘাত করিতে কার্পণ্য করে নাই—ইহাদের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকায় শেষপর্যন্ত নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইহা মনে হওয়া অসঙ্গত নহে যে, সম্রাট ফারুখসিয়ার ইজারা প্রথা রদ করিবার যে দাবি তুলিয়াছিলেন তাহা ছিল নিছক্‌ তাঁহার দুর্বল মস্তিষ্কের বা চিত্তচাঞ্চল্যের বা খামখেয়ালের নিদর্শন, ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের মূল সমস্যাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অনুরূপ ভাবে নিজাম উল্‌-মুল্‌ক্‌ প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন তাহা ছিল নিছক্‌ ভাবপ্রবণতারই নিদর্শন। ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা তদানীন্তনকালে যে সমস্যার জালে আবৃত ছিল, কোনও বাস্তব সংস্কার মারফত সেই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। এই অনুমানের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, খালিসা ভূমির পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল এবং ইহার ফলে সরকারী কোষাগারে অর্থ সমাগম কমিয়া গিয়াছিল। সর্বোচ্চ ক্রেতার নিকট খালিসা ভূমির ইজারা প্রদান করায় সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব সরকারী কোষাগারে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু আর্থিক অবস্থার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় কোষাগারের পক্ষে নির্ধারিত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হইল না। অর্থাৎ ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যই তৎকালীন উপযোগিতার দৃষ্টিতে এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ করিলে উক্ত অনুমান সমর্থিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই স্বার্থপর কার্য-পদ্ধতি কৃষক ও কৃষিকার্যে অভূতপূর্ব ক্ষয়ক্ষতি সাধন করিয়া ক্রমবর্ধমান হারে রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতি দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং ইজারা প্রথার প্রচলনকে কোনক্রমেই সুবিবেচনা ও উপযোগিতার সার্থক পরিচায়ক বলা যাইতে পারে না।

বস্তুতঃ এই ঘৃণ্য প্রথার উৎস ও ক্রমবিকাশের মূলে ছিল ধনী মহাজন ও ফাটকাবাজশ্রেণীর লোলুপতা। এই শ্রেণী রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁহারা রতনচাঁদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা ক্রয় করেন। রতনচাঁদ ও তাঁহার অপদার্থ ও লোভী প্রভুদিগের মধ্যে এই অর্থ বন্টন করা হয়। অতএব মহাজন শ্রেণী, উজীর ও তাঁহার দেওয়ান ও রতনচাঁদের স্বার্থেই ইজারা প্রথার ব্যাপক প্রচলন করা হইয়াছিল। প্রশাসন অথবা রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রথার প্রচলন কোন মতেই প্রয়োজনীয় ছিল না, এবং তদানীন্তন কালে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় ইহার প্রচলন কোন ক্রমেই অপরিহার্য ছিল না। ইজারা প্রথা সম্বন্ধে বড় জোর এই কথা বলা যায় যে ইহা ছিল এক শ্রেণীর অন্যায় অধিকার ও লুঠের সহায়স্বরূপ। জমিতে কোনরূপ মমত্ববোধ অথবা দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার হিতার্থে এই শ্রেণীর কোন অবদানও ছিল না। অতএব, ইজারা প্রথা ও ইজারাদার শ্রেণীকে, এমন এক ব্যক্তি দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অবাঞ্ছনীয় হইলেও চাপাইয়া দিয়াছিলেন, যিনি ভবিতব্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বাধিনায়কের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। আলোচ্য যুগের ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ সতর্কতার সহিত করিলে দেখা যাইবে যে, এই প্রথার অবসান তৎকালে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ছিল। প্রস্তাবিত সংস্কারের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তাহাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থায় যে ভাঙ্গন ঘটিতেছিল, উল্লিখিত পরিকল্পনা প্রচলিত হইলে সেই ভাঙ্গন ত্বরান্বিত না হইয়া বরং কিছু পরিমাণ বাধাপ্রাপ্ত হইত। উপসংহারে, ইজারা প্রথার প্রচলনে, জমিতে যাঁহাদের কোনরূপ স্বার্থ ছিল, তাঁহাদের সর্বনাশ ঘটিল এবং সরকারী কোষাগারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে লাগিল। এই ঘটনার জন্য যাঁহারা দায়ী, তাঁহারা নিঃসন্দেহে সম্রাট, রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন।

পাদটীকা

১. দেওয়ান পদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে প্রয়াত ইবন-ই-হাসান বলিয়াছেন, "মোঘল আমলে এই পদটির সংজ্ঞা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল এবং ইহার কার্যক্ষেত্র রাজস্ব ও অর্থ দপ্তরের প্রধান হিসাবে সীমিত ছিল। আকবরের আমলে এই দপ্তরে "উজীর" শব্দটির বিশেষ প্রচলন ছিল না। তাহার পরিবর্তে দেওয়ান শব্দটি অধিকতর প্রচলিত ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে এই ধারাটি উল্টাইয়া যায় এবং "উজীর" পদটি মোটামুটিভাবে প্রচলিত থাকিয়া যায়। অপর পক্ষে শাহজাহানের আমলে শব্দটির তাৎপর্য সুনির্দিষ্ট করা ছিল। উজীরকে দেওয়ান-ই-কুল (প্রধান দেওয়ান) এবং দপ্তরে তাঁহার সহকর্মিগণকে দেওয়ান বলা হইত। 'সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার অব দি মোঘল এম্পায়ার, পৃঃ ১৪৮।

২. আকবর নামা II, পৃঃ ১৯৭; পুথিতে কথাটি উজীরত্-ই-দেওয়ান-ই-কুল লেখা হইয়াছে।

৩. 'সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার অব দি মোঘল এম্পায়ার' পৃঃ ৩০৪-৩০৭।

৪. মুন্তখব-উল্-লুবাব II পৃঃ ২৩৫; মাসির-উল্-উমর I, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১০, ৩১৩; দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩; আলমগির নামা, পৃঃ ৮৩২, ৮৩৭।

৫. খুলাসত্-উস্-সিয়াক্ পৃঃ ১৫খ, দস্তুর-উল-অমাল-ই-মুজমালাই, পৃঃ ১৪৪ক; ফারহাঙ্গ-ই কারদানী পৃঃ ২৭খ-২৮ক।

৬. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-আলমগিরি পৃঃ ১৭৩ক।

৭. ফারহঙ্গ-ই-কারদানী পৃঃ ২৭খ।

৮. খুলাসত্-উস্-সিয়াক্ পৃঃ ১৫ক।

৯. দস্তুর-উল-অমাল্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ১১২ক।

১০. একই গ্রন্থে ১৪৪খ, জাওয়াবিত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৩২খ।

১১. দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি, পৃঃ ১৪৪খ; জাওয়াবিত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৩২খ।

১২. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-আলমগিরি পৃঃ ১৪৪ কখ, ১৪৫ক; জাওয়াবিত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৩১-৩০ খ, ৩৭খ, ১৪৭কখ; ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী পৃঃ ৩১খ; জাওয়াবিত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৯৩খ, ৯৫খ।

১৩. দৌল: মনসবদারগণের মাহিনার হিসাব পত্র।

১৪. নগদী: নগদ মুদ্রায় প্রদত্ত মাহিনা; ইহার দ্বারা যে সকল মনসবদারগণকে নগদ মুদ্রায় তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদান করা হইত তাঁহাদেরও বুঝাইত।

১৫. তৌজী: খাজনার তালিকা।

১৬. দস্তুর-উল-অমাল-ই-আলমগিরি, পৃঃ ১৪৭ক; জাওয়াবিত্-ই-আলমগিরি পৃঃ ৮৬খ, ৯৩ক।

১৭. হিদায়ত্-উল-কোয়াইত, পৃঃ ৮কখ, ৯কখ।

১৮. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-আলমগিরি পৃঃ ১৪১ক-১৪৬ক; জাওয়াবিত্-ই-আলমগিরি পৃঃ ৩৬খ, ৩৭ক।

১৯. দস্তুর-উল-অমাল-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৩৪ক-৩৫ক।

২০. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী, পৃঃ ২৭খ।

২১. দস্তুর-উল-অমাল্-ই-আলমগিরি পৃঃ ১৪১ক-১৪৮খ, জাওয়াবিত্-ই-আলমগিরি পৃঃ ৩৪ক ৩৫ক।

২২. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী পৃঃ ২৮ক।

২৩. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী পৃঃ ২৯কখ, ইল্ম্-ই-নবিসিন্দিগি, পৃঃ ১৫৬ক।

২৪. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-আলমগিরি পৃঃ ১৪৬কখ, জাওয়াবিত-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৩৫খ, ৩৬খ, ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী ৪, ৩০ক।

২৫. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-মুজমালাই, পৃঃ ১০৯খ।

২৬. একই গ্রন্থে, পৃঃ ১১০খ।

২৭. মাসির-উল-উমর I, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১০, ৩১১, ৩১২; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩।

২৮. মাসির-উল-উমর I প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫।

২৯. এই সকল নিয়োগের বিবরণ এবং যে পরিস্থিতির জন্য এইরূপ নিয়োগ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল তাহার বিবরণ উইলিয়ম আরভীন প্রণীত 'লেটার মোঘলস্' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩০. তাজ্‌কিরাত-উল্‌-মুলুক্‌, পৃঃ ১৩০খ, ১৩১ক।

৩১. তাজ্‌কিরাত-উল-মুলুক্‌, পৃঃ ১৩০খ, ১৩১ক, 'লেটার মোঘল্‌স্‌', আরভীন, II, পৃঃ ১০৫।

৩২. আওয়াল্‌-উল্‌-কোওয়াকিন্‌ পৃঃ ১৮৪ক।

৩৩. তাজ্‌কিরাত্‌-উল্‌-মুলুক্‌, পৃঃ ৫০ক।

৩৪. জায়গীর ভূমি-সংক্রান্ত ধারা দ্রষ্টব্য।

৩৫. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৬৭৫।

৩৬. তাজকিরাত্‌-উল-মুলুক্‌, পৃঃ ১১৩খ।

৩৭. 'লেটার মোঘল্‌স্‌' আরভীন, I, পৃঃ ১৯৭।

৩৮. তাজ্‌কিরাত্‌-উল্‌-মুলুক্‌, পৃঃ ১২২ক।

৩৯. মুন্তখব্‌ উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৭৩৯, ৭৭৫, ৭৭৬। সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরিন II, পৃঃ ৪০৭, ৪০৮।

৪০. মুন্তখব্‌ উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৭৩৯।

৪১. একই গ্রন্থে II, পৃঃ ৭৭৩।

৪২. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৭৭৩, পুথিতে বলা হইয়াছে যে উজীরের প্রতি সম্রাটের বিরূপতা এবং তাঁহার নিজের অত্যধিক কামাসক্তির প্রবণতা থাকায় উজীর বিগত কয়েক মাস যাবৎ দপ্তরে আসিতেন না। ইহার ফলে সরকারী কার্য যথাযথ ভাবে হইত না। এই প্রসঙ্গে সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরিন II, পৃঃ ৪০৮ দ্রষ্টব্য।

৪৩. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৭৭৩, ৭৭৫; সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরিন II, পৃঃ ৪০৮।

৪৪. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৭৭৫, ৭৭৬, সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরিন্‌ II পৃঃ ৪০৭।

৪৫. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৭৭৩, ৭৭৬, সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরিন II, পৃঃ ৪০৭।

৪৬. আওয়াল্‌-উল-কোওয়াকিন্‌, পৃঃ ১৭৮ক, তাজকিরাত-উল্‌-মুলুক, পৃঃ ১৩০।

৪৭. আওয়াল্‌-উল্‌-কোওয়াকিন্‌, পৃঃ ১৭৮ক।

৪৮. তাজ্‌কিরাত্‌-উল্‌-মুলুক্‌ পৃঃ ১৩০ক, সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরিন II, পৃঃ ৪৫৫; শাহনামা-ই-মুনাওয়ার-উল্‌-কলম্‌ পৃঃ ৮৬ক; আওয়াল উল-কোওয়াকিন পৃঃ ১৮১খ; তারিখ পৃঃ ১২ক: লেটার মোঘল্‌স্‌ II, পৃঃ ৯৪৮।

৪৯. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৯৪৮; সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিন, পৃঃ ৪৫৫, ৪৫৬; শাহ্‌নামা-ই-মুনাওয়ার-উল্‌-কলম্‌, পৃঃ ৮৬ক।

৫০. শাহনামা-ই-মুনাওয়ার-উল্‌-কলম্‌, পৃঃ ৮৩কখ, ৮৬ক, আওয়াল্‌-উল্‌-কোওয়াকিন পৃঃ ১৮খ, ১৮২কখ; সিয়ার-উল্‌-মুতাক্ষরিন্‌ II, পৃঃ ৪৫৫, ৪৫৬।

৫১. তারিখ-ই-শাকির-খানি, পৃঃ ১০খ।

৫২. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৯৪০।

৫৩. মুন্তখব্‌-উল্‌-লুবাব্‌ II, পৃঃ ৯৪৭; আওয়াল-উল-কোওয়াকিন, পৃঃ ১৮৩খ,১৮৪ক; আওয়াল্‌ উল্‌-কোওয়াকিন গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়াছেন: যে প্রশাসন ব্যাপারটি শিশুর খেলার সামগ্রীতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। যে কার্য দেওয়ানেরই করণীয় বখ্‌সী তাহা সম্পাদন করিতেন এবং কাজীর কর্তব্য কোতওয়াল কর্তৃক সম্পাদিত হইত।

৫৪. আওয়াল, পৃঃ ১৮২খ, ১৮৩কখ, ১৮৪কখ, সিয়ার II, পৃঃ ৪৬৫ ; 'লেটার মোঘল্স্' II, পৃঃ ১৩৩, ১৪৮। মনে হয় পরবর্তী সময় সম্রাট ও উজীরের মধ্যে পুনর্মিলনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। সম্রাট রাজস্ব ইজারা প্রদানের প্রথা রদ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত পরিকল্পনাটি সমর্থন করিলে তবেই নিজাম্-উল্-মুল্ক্ দপ্তরের ভার লইতে স্বীকৃত হইবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং উজীর দক্ষিণাপথে চলিয়া যাইতে সংকল্প করেন। (লেটার মোঘল্স্, II, পৃঃ ১৩৬)।

৫৫. মুন্তখব-উল্-লুবাব্ II, পৃঃ ৯৫৭, ৯৭৩ ; তাজ্কিরাব্ ১৩১খ ; 'লেটার মোঘল্স্', আরভীন II, পৃঃ ১৩৭, ১৩৮।

৫৬. মাসির-উল্-উমর I, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৫৮-৩৬১।

৫৭. তাজ্খিরাত-উল্-মুলুক্, পৃঃ ১৩২ক।

৫৮. আকবর নামা II, পৃঃ ৬৭০ ; এবং 'দি সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার অব দি মোঘল এম্পায়ার', ইবন-ই-হাসান পৃঃ ১৬৫ দ্রষ্টব্য।

৫৯. আকবর নামা II, পৃঃ ৬৭০, এবং 'দি সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার অব দি মোঘল এম্পায়ার', ইবন-ই-হাসান, পৃঃ ১৬৫ দ্রষ্টব্য।

৬০. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী, পৃঃ ২৮ক।

৬১. একই গ্রন্থে পৃঃ ২৮খ।

৬২. একই গ্রন্থে পৃঃ ২৮খ।

৬৩. একই গ্রন্থে পৃঃ ২৮খ।

৬৪. ফারহাঙ্গ-ই কারদানী, পৃঃ ২৮খ।

৬৫. নিগার-নামা-ই-মুন্সি পৃঃ ১৩৪, ১৪৫।

৬৬. মুস্খা-ই-দেওয়ানী—মুজ্মালাই (বা দেওয়ানী দপ্তরে প্রস্তুত বিভিন্ন হিসাবের একত্রিত বিবরণ) পদটির অপর একটি নাম। এই বিবরণ হইতে খালিসা মহালগুলির আয় ও ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব পাওয়া যাইত। হিসাবে কোন বাকি পড়িলে তাহাও লেখা থাকিত। খালিসা মহালের ফতাদারগণ কর্তৃক দেওয়ানী দপ্তরে প্রেরিত আয় ও ব্যয়ের তথ্য হইতে এই বিবরণী প্রস্তুত করা হইত (খুলাসাত-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ৩৫খ)।

৬৭. খুলাসত্-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ১৬ কখ, পরিশিষ্ট ঘ দ্রষ্টব্য।

৬৮. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১৩৫ ; ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী পৃঃ ২৮ ক, 'দেওয়ান-ই-সুবার' দপ্তরে যে সকল দলিলপত্র রক্ষিত থাকিত, তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পরিশিষ্ট ঘ দ্রষ্টব্য।

৬৯. অন্যান্য যে সকল দলিলপত্র রাজস্ব মন্ত্রকে প্রেরিত হইত, তাহাদের নাম ফারহাঙ্গ-ই কারদানী পুস্তকে উল্লিখিত আছে ; যথা, তুমার জমাবন্দি, রোজনামচা-ই-তহশীল, জমা-ও-খরচ-ই-ফতাদার, মুজমল্-ই-পরগনাত্ (ফারহাঙ্গ-ই-কারদানী, পৃঃ ২৮ক)।

(ক) তুমার-ই-জমাবন্দি বা তুমার-ই-জমা : পরগনা আমিন কর্তৃক নিরূপিত খাজনা তালিকা। এই তালিকায় মাল-ও-জিহাত এবং সেয়ার জিহাত (এবং ইহাদের সহিত পুরানো, সম্প্রতি পুনরুদ্ধৃত ও আয়মা গ্রামসমূহের বিশদ বিবরণ) সহ পরগনার মোট জমা উল্লিখিত থাকিত (খুলাসত্-উস্-সিয়াক, পৃঃ ২১খ, ২৩খ, ২৪ কখ)।

(খ) রোজনামচা-ই-তহশীল : প্রাত্যহিক প্রাপ্তির হিসাব সমূহ (খুলাসত্‌ উস্‌ সিয়াক্‌ পৃঃ ২৮খ)।

(গ) জমা-ও-খরচ-ই ফতাদার : ফতাদারের দপ্তরে রক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব।

(ঘ) মুজমল-ই-পরগনা (অথবা পরগনার মুজমল) : পরগনার আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে পরগনার মুজমল বলা হইত। এই বিবরণ জমা-ও-খরচ-ই-পরগনা নামেও পরিচিত ছিল (খুলাসত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌, পৃঃ ২৯খ)।

৭০. খুলাসত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌, পৃঃ ১৬খ।

৭১. রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন্‌, পৃঃ ২৪৪, ২৪৫।

৭২. মিরাট-ই-আহ্‌মদি, পৃঃ ১৮০, ১৮১, ২২৩।

৭৩. বস্ত্র বিক্রয়ের বাজার হইতে সংগৃহীত অর্থ একটি পৃথক খাতে 'মহাল-কাতরা-পর্‌চা' শিরোনামায় নির্দেশিত হইত।

৭৪. নগর হইতে সংগৃহীত কয়েকটি কর (যথাঃ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর আরোপিত কর, পণ্য চালান কর ইত্যাদি) লইয়া একটি পৃথক রাজস্ব ইউনিট গঠিত হইত এবং 'মহাল সেযার বাল্‌দা' শিরোনামায় এইগুলি নির্দেশিত হইত।

৭৫. মিরাট-ই-আহমদি ক্রোড়পত্র পৃঃ ১৯৩।

৭৬. বিশদ আলোচনার জন্য 'দি ফৌজদারী এণ্ড ফৌজদার আণ্ডার দি মোঘলস্‌', 'মেডিয়াভেল ইণ্ডিযা কোয়ার্টারলী', ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬১, পৃঃ ২২-৩৭ দ্রষ্টব্য।

৭৭. সিলেক্টেড্‌ ওযাকাই অব দি ডেকান, পৃঃ ৭৯।

৭৮. সিযাক নামা, পৃঃ ৬৮।

৭৯. আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ১৯৭, সিয়াক-নামা, পৃঃ ৬৭ ; ইনসাই-রোশন-কল্‌ম্‌, পৃঃ ৩ক।

৮০. প্রদেশের প্রতিটি মহাল খালিসা অথবা জায়গীর ভূমি হিসাবে নির্দেশিত থাকিত। যে সকল মহালের ভূমি-রাজস্ব দেওয়ান-ই-আলা কর্তৃক নিযুক্ত আমিল বা করোরী (খালিসা বিভাগে নিযুক্ত আমিলকে করোরী বলা হইত) মারফত সংগৃহীত হইয়া সরকারী কোষাগারে প্রেরিত হইত, সেই সকল মহালকে খালিসা মহাল বলা হইত। অপর পক্ষে বেতনের পরিবর্তে মনসবদারগণকে যে সকল মহাল বিলি করা হইত, সেই সকল মহালকে জায়গীর মহাল বলা হইত। জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত এই সকল মহাল হইতে মনসবদারগণকে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিবার অধিকার প্রদান করা হইতে। তাঁহারা স্বয়ং বা তাঁহাদের দ্বারা নিয়োজিত আমিলগণ এই ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

৮১. দস্তুর-উল্‌-অমাল্‌-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ৩৭খ, ৩৮ক, ৪১খ, ৪২ক, ৪৩কখ, নিগার-নামা-ই-মুনসি পৃঃ ৮৩, ৯০, ৯১, ১৪০।

৮২. "প্রভিন্‌শিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মোঘল্‌স্‌", সরণ, পৃঃ ২৮৪।

৮৩. মিরাট-ই-আহ্‌মদি, I, পৃঃ ২০৪, ২৮৫।

৮৪. একই গ্রন্থে I, পৃঃ ২৩৪।

৮৫. একই গ্রন্থে I, পৃঃ ৩৭৪।

৮৬. নিগার-নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১২১খ।

৮৭. একই গ্রন্থে, পৃঃ ৯৭কখ।

৮৮. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ১৮কখ।

৮৯. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ৯৭কখ, ১২১কখ; ১২৩কখ; দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস্, পৃঃ ১৭খ, ১৮কখ।

৯০. "প্রভিন্শিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মোঘল্স্", সরণ, পৃঃ ২৮৪।

৯১. একই গ্রন্থে, পৃঃ ২৮৪।

৯২. ইসলামিক কালচার, ষোড়শ খণ্ড ১৯৪২, পৃঃ ৮৭-৯৯।

৯৩. মিরাট-ই-আহ্মদি I, পৃঃ ৩২৯।

৯৪. একই গ্রন্থে I, পৃঃ ৩০৫।

৯৫. ইক্বাল নামা, পৃঃ ১৭৯, ১৮০।

৯৬. ওয়াকাই-ই-সুবা-ই-আজমীর, পৃঃ ৮৪।

৯৭. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ৩৩, ৩৪ক।

৯৮. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২৯কখ।

৯৯. খুলাসত্-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ২৫খ, ২৬কখ; আকবর নামা III, পৃঃ ৮৭।

১০০. খুলাসত্-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ২৫খ, ২৬ কখ।

১০১. মিরাট-ই-আহমদি I, পৃঃ ২৯১, ২৯২, ৩৩০, ৩৩৪।

১০২. নিম্নলিখিত সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই বিবরণ রচিত হইয়াছে; হিদায়ৎ-উল্-কাওয়াদ্, পৃঃ ২৯ক; দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্, পৃঃ ৬২খ; ৬৩কখ; খুলাসত্-উস্-সিয়াক, পৃঃ ২৫খ, ২৬কখ; নিগার নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭।

১০৩. খুলাসত্-উস্-সিয়াক, পৃঃ ২৫খ, ২৬কখ; ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২০৯: নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭; দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্, পৃঃ ৬২খ, ৬৩কখ।

১০৪. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২৯কখ: খুলাসত্-উস্-সিয়াক্ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী, আমিল কর্তৃক সংরক্ষিত রেজিস্টারের মোট সংখ্যা ছিল বারো। খুলাসত্-উস্-সিয়াক, পৃঃ ২৬কখ দ্রষ্টব্য।

১০৫. খুলাসত্-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ৪৩কখ; সিয়াক্ নামা, পৃঃ ৭৫-৮২।

১০৬. এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হইল, মূল দলিল সমূহ; কার্যত, ইহার দ্বারা পাটোয়ার কর্তৃক সংরক্ষিত দলিল সমূহ বুঝাইত। ইহাতে স্থানীয় ভাষায় অন্যান্য লিখিত বিবরণের সহিত আমিল কর্তৃক সংগৃহীত সকল প্রকার অর্থের হিসাব থাকিত।

১০৭. যে আধিকারিক কোন দপ্তরের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাকে সাধারণ ভাবে এই নামে অভিহিত করা হইত।

১০৮. খুলাসত্-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ৪৩খ, ৪৪ক।

১০৯. এই অনুমানের ভিত্তি হইল যে, বার-আমাদ্-নবিস্ এর দায়দায়িত্বের বিবরণ দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্ (পৃঃ ১৮) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

১১০. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১০৪ কখ, দস্তুর-উস্-অমাল্-ই-বেকাস্, পৃঃ ১৫কখ।

১১১. আকবর নামা III, পৃঃ ২৬৬, ৪০৩, ৬০১।

১১২. একই গ্রন্থে III, পৃঃ ১৬৬, ২৬৬, ৪০৩; খুলাসত্-উস্-সিয়াক্, পৃঃ ২৬খ, ২৭ক।

১১৩. মিরাট-ই-আহমদি I, পৃঃ ২৯১, ২৯২, ৩৩০, ৩৩৪।

১১৪. আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ১৯৯।

১১৫. খুলাসত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌, পৃঃ ২৫খ, ২৬কখ।

১১৬. খুলাসত্‌ উস-সিয়াক্‌ পৃঃ ১৭খ, ১৮ক ; হিদায়ত-উল্‌-কোয়াইত, পৃঃ ২৭খ, ২৮কখ ; নিগার-নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১৩৬ ; কারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২৮ক।

১১৭. কারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২৯ ; হিদায়ত-উল্‌-কোয়াইত, পৃঃ ২৭খ, ২৮কখ।

১১৮. খুলাসত-উস্‌-সিয়াক, পৃঃ ১৭, ১৮।

১১৯. নিগার-নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১৩৬।

১২০. আইন-ই-আকবরি III, পৃঃ ৩৮১।

১২১. একই গ্রন্থে I, পৃঃ ১৯৯।

১২২. গ্রাম সংক্রান্ত হিসাব ; এই হিসাব হইতে গ্রামের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত জমি, যাহাদের উপর এককভাবে কোন ব্যক্তির স্বত্বাধিকার থাকিত, অথবা যে জমিতে কোন ব্যক্তি এককভাবে চাষাবাদ করিতেন সে সম্বন্ধে, একটি সহজ ধারণা হইত। ইহা মুন্তাখাব-ই-খসড়ার একটি সংক্ষিপ্তসার, যাহার মধ্যে কৃষিকর্মে নিয়োজিত মোট জমির সহিত গ্রামের জমার পরিমাণ উল্লিখিত থাকিত।

১২৩. আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ১৯৯।

১২৪. আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ২০১।

১২৫. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ১১খ, ১২ক ; নিগার-নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১০৪।

১২৬. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ১১খ, ১২ক।

১২৭. আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ২০১।

১২৮. নিগার-নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১০০, ১০৩ ; দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ১২খ, ১৩কখ।

১২৯. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ১৩কখ।

১৩০. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ২৫ক।

১৩১. দস্তুর-উল্‌-অমাল্‌-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৮ক।

১৩২. রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন, পৃঃ ৩৫০, ৩৫২।

১৩৩. তুজুক-উস্‌-জাহাঙ্গিরি, পৃঃ ৭৬ ; দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ৪৩কখ. ৪৪ক।

১৩৪. আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ২০৯ ; নিগার-নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১০৪, ১০৫ ; দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ৪৩খ, ৪৪ক।

১৩৫. রিয়াজ-উস-সালাতিন, পৃঃ ৩৫০, ৩৫১।

১৩৬. রাজস্ব এবং রাজস্ব হার এবং পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থানীয় আইন কানুনের নথিপত্র।

১৩৭. দস্তুর-উল্‌-অমাল্‌-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ৪৩খ, ৪৪কখ।

১৩৮. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ৪৩খ, ৪৪কখ।

১৩৯. মিরাট-ই-আহমদি I, পৃঃ ২৬৩ ; নিগার-নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১০৪, 'ষ্টাডিস্‌ ইন ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল', পৃঃ ১৬৬, ১৬৭।

১৪০. উপরোক্ত দলিল পত্রের তালিকা নিম্নলিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত : আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ২০০ ; জাওয়াবিত-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৮ক ; নিগার নামা-ই-মুন্‌সি, পৃঃ ১০৪, ১০৫ ; দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-বেকাস্‌, পৃঃ ৪৩খ, ৪৪কখ ; হিদায়ৎ-উল-কাওয়াদ,

পৃঃ ৬৩খ, ৬৪কখ; ইহার সহিত 'ষ্টাডিস্ ইন: দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল', পৃঃ ১৮৭ দ্রষ্টব্য।

১৪১. আইমা ভূমি: মাদাদ্-মাস্ হিসাবে বন্টিত জমি আইমা ভূমি হিসাবে পরিচিত ছিল।

১৪২. "ষ্টাডিস্ ইন্ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল", পৃঃ ১৬৫।

১৪৩. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-মেহদি আলিখান্, পৃঃ ৬৬ক; এলাহাবাদ ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২২৯ নং; 'ষ্টাডিস্ ইন দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল' পৃঃ ১৬৪, ১৬৫।

১৪৪. 'এলাহাবাদ ডকুমেন্ট' ২২৯ নং, দ্রষ্টব্য; দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-মহম্মদি আলিখান্, পৃঃ ৬ক।

১৪৫. আইন-ই-আকবরি I, পৃঃ ২০৯।

১৪৬. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্, পৃঃ ৪৩খ, ৪৪কখ।

১৪৭. উইল্‌সন্স গ্লসারী, পৃঃ ১০৫; চৌধুরী পরিচিত ছিল প্যাটেল হিসাবেও এবং দাক্ষিণাত্যে তাহাকে দেশমুখ (মালুমত-উল্-অফাক্, পৃঃ ১৭৪) বলা হইত।

১৪৮. 'এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্' ২৯৯, ৩২৮ নং; এই সকল দলিলে চৌধুরী একটি পরিবারিক নাম হিসাবে উল্লিখিত এবং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে চৌধুরী দপ্তর বংশানুক্রমে বর্তাইত। উপরন্তু চৌধুরীর জন্য নান্‌কার ভূমি প্রদানের প্রথা হইতেও উপরোক্ত অনুমান সমর্থিত হয়।

১৪৯. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্, পৃঃ ৪১খ, ৪৩কখ, ৪৩ক।

১৫০. মিরাট-ই-আহমদি I, পৃঃ ২৬৩; ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২৯ক।

১৫১. হিদায়ৎ-উল-কোওয়াইত, পৃঃ ২৭খ।

১৫২. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৪ক।

১৫৩. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৮ক।

১৫৪. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৬ক।

১৫৫. দস্তুর-উল-অমাল্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৮ক।

১৫৬. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্, পৃঃ ৬৩খ, ৬৪ক।

১৫৭. তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি, পৃঃ ৩২।

১৫৮. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস, পৃঃ ৪৫কখ, ৪৭ক; ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২৯খ, ৩০ক।

১৫৯. দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৪১খ, ৪২।

১৬০. অতিরিক্ত ৬৬০৩, পৃঃ ৪৮খ।

১৬১. একই গ্রন্থে ৬৬০৩, পৃঃ ৪৮খ।

১৬২. রিসালাহ্-ই-জিরাত, পৃঃ ১৩খ,-১৮ক।

১৬৩. বল দস্তি—সুন্দরকে বুঝায় (রিসালাহ্-ই-জিরাত, পৃঃ ১৩ খ।)

১৬৪. রিসালাহ-ই-জিরাত, পৃঃ ১৩কখ।

১৬৫. নিশান্, ৩নং (জয়পুরের মহাফেজ খানা); জে, জেভিয়ার (হষ্টেন কর্তৃক অনুদিত) জে. এ. এস. বি. এন. এস্. XXII, ১৯২৭, পৃঃ ১২১।

১৬৬. আমল্-ই-সালিব I, পৃঃ ৪৯৫।

১৬৭. সাদিক খান ১৭৪, পৃঃ ১১ক।

১৬৮. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১২৯খ-১৩১কখ।

১৬৯. মিরাট-ই-আহমদি I, পৃঃ ২৯২।

১৭০. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১৮৯।

১৭১. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১৪৯।

১৭২. ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৫ক।

১৭৩. দুররুল-উলম্, পৃঃ ৬৫ক।

১৭৪. ওয়াক-ই-সুবা-আজমীর, পৃঃ ৯৫।

১৭৫. "লেটার মোঘলস্" I, পৃঃ ৩৩৫।

১৭৬. তারিখ-ই-শাকির-কাহনি, পৃঃ ৫৮ক।

১৭৭. মুন্তখব-উল্-লুবাব II, পৃঃ ৭৭৩।

১৭৮. একই গ্রন্থে II, পৃঃ ৭৭।

১৭৯. "লেটার মোঘলস্" —আরভিন, II, পৃঃ ১৩৬।

১৮০. সিয়ার-উল্-মুতাক্ষরিন II, পৃঃ ৮৫৪।

১৮১. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস্ II, পৃঃ ৬৮, ৬৯।

১৮২. একই গ্রন্থে, পৃঃ ৫১, ৫২।

১৮৩. এলাহাবাদের রাজ্য মহাফেজখানায় সংরক্ষিত জমিদারী কবালাগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ১৮শ শতকের প্রথমার্ধে জমিদারিগুলি ব্যাপক হারে বিক্রয় করা হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য: বঙ্গদেশের বৃহৎ জমিদারী গোষ্ঠীর মত, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের তালুকদারশ্রেণীর অভ্যুদয়ও যথেষ্ট সাম্প্রতিক কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, সরকারের ইজারাদারবর্গ হইতেই যে এই পরোক্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাহা প্রমাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ।" (সিলেকসন্স্ ফ্রম দি রেভিনিউ রেকর্ডস, পৃঃ ৮৯)।

১৮৪. কাফি খান এর বিবরণ অনুযায়ী এই দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ সৈয়দ ভ্রাতৃগণ ও রতন চাঁদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ইঁহারা কেবল মাত্র বারাহার সৈয়দগণ ও বাকালগণের (মহাজন-শ্রেণী) প্রতি আনুকূল্য প্রদান করিতেন। মুন্তখব-উল-লুবাব II, পৃঃ ৯০২।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি-রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা

নিম্নলিখিত তিনটি ভিন্ন সংস্থার মধ্যে ভূমি-রাজস্বের বণ্টন ও তাহার ব্যয় নিবন্ধ ছিল : সরকার, জায়গীরদার ও মাদাদ্-মাস্ধারী। কিছু মহাল চিহ্নিত ছিল খালিসা হিসাবে। এই সকল মহালের ভূমি-রাজস্ব দেওয়ান-ই-আলা কর্তৃক নিযুক্ত করোরী ও আমিলগণ সংগ্রহ করিয়া সরকারী কোষাগারে পাঠাইয়া দিতেন। তবে এই সকল মহালের অধিকাংশ ভূমি-রাজস্ব মনসব্দারগণকে[১] তাঁহাদের বেতনের পরিবর্তে দান করা হইত এবং তাঁহারা এই রাজস্ব নিজ নিজ আমিলগণ মারফত আদায় করিতেন। সকল প্রদেশের ভূমি-রাজস্বের এক ক্ষুদ্র অংশ দুঃস্থ, ধার্মিক, পণ্ডিত এবং শেখ ও সৈয়দগণের মধ্যে বিতরণ করা হইত। কোন পরগনায় একাধিক গ্রাম[২] অথবা কোন গ্রামে একাধিক বিঘা জমি[৩] আয়মা অথবা মাদাদ্-মাস্জমি হিসাবে নির্দিষ্ট থাকিত এবং ইঁহাদের অধিকারীগণ এই সকল গ্রামের ভূমি-রাজস্ব আত্মসাৎ করিবার অধিকারী ছিলেন। কৃষিজীবী সমাজের অন্যান্য অংশের উপর যে সকল কর আরোপিত হইত, ইঁহাদের সেই সকল কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। এইরূপভাবে বিতরণ-করা গ্রাম অথবা জমির পরিমাণ জমা হইতে ছাড় পাইত। অর্থাৎ মাদাদ্-মাস্ অথবা আয়মা বাবদ যে সকল গ্রাম বা জমি চিহ্নিত থাকিত, তাহাদের উপর রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত না এবং সেইগুলি খালিসা বা জায়গীর ভূমির জমার অঙ্কে অন্তর্ভুক্ত থাকিত না।

ভূমি-রাজস্ব বণ্টনের এইরূপ বিভিন্নতার জন্য নানাবিধ প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। আবার এই কারণেই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকারের সংস্থা, জায়গীরদারী প্রথা ও নিষ্কর জমি বিতরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। একদিকে জায়গীরদারী প্রথার ক্রমবিকাশে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন বিভাগের কার্যকলাপ যথেষ্ট পরিবর্তিত হয় ; অপরদিকে, মাদাদ্-মাস্ভূমি প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাম-হিন্দুস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড রেখাপাত করে। এই সকল কারণে তিনটি ভিন্ন খাতে বা পর্যায়ে ভূমি-রাজস্ব বণ্টিত হওয়ায় ফলাফল কি হইয়াছিল তাহার অনুধাবন একান্তই প্রয়োজনীয়।

—এক—

খালিসা জমি

পারিশ্রমিকের পরিবর্তে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্যকর্মের প্রতিদানে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল মহাল বা পরগনা হিসাবে মনস্বদারগণকে বিলি করা হইত। অন্যান্য অধিকাংশ প্রদেশের অবশিষ্ট মহাল ও পরগনাগুলি খালিসা বা খালিসা-শরিফা নামে চিহ্নিত থাকিত এবং এই সকল মহাল বা পরগনা হইতে যে আয় হইত তাহা সরকারী কোষাগারে প্রেরিত হইত। মনে হয়, সম্রাটের ব্যক্তিগত

খরচের অর্থ এবং সরকারী কোষাগারের প্রাপ্য অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎস হইতে আদায় হইত। সম্রাটের ব্যক্তিগত খরচ জোগাইবার জন্য যে-সকল পরগনা বা মহাল জমা রাখা হইত, তাহাদের সার্ফ-ই-খাস বলা হইত। ইহাদের জিম্মা স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর কর্মচারীর হস্তে অর্পিত থাকিত এবং এই সকল মহাল হইতে যে অর্থ আদায় হইত তাহা এক পৃথক কোষাগারে জমা থাকিত।[৪] কোন মহাল বা পরগনার অন্তর্ভুক্ত খালিসা ভূমি হইতে যে অর্থ আদায় হইত, তাহা স্থানীয় কোষাগারে জমা পড়িত, এবং স্থানীয় প্রশাসন বিভাগের প্রয়োজনীয় খরচ মিটাইয়া বাড়তি অর্থ প্রাদেশিক সদরের কোষাগারে জমা দেওয়া হইত ;[৫] অন্যথায়, রাজস্ব মন্ত্রকের নির্দেশানুযায়ী ঐ অর্থ ব্যয় করা হইত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন উক্তি হইতে দেখা যায় যে, খালিসা বাবদ নির্দিষ্ট পরগনাগুলিতে উত্তমরূপে কৃষিকর্ম চলিত এবং নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের উদ্যোগ যথেষ্ট সন্তোষজনক ছিল।[৬]

সীমানাঃ মোঘলযুগে খালিসা ভূমির ক্ষেত্রফল বা সীমানা বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন রাজত্বকালে বিভিন্ন পরিমাণের হইত। খালিসাভূমির আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি, জায়গীরদারী প্রথা, সম্রাটের চারিত্রিক গঠন এবং প্রশাসনিক কর্মের খুঁটিনাটিতে তাঁহার অনীহা অথবা কোন বিশেষ অবস্থার তাগিদের উপর নির্ভর করিত। আকবরের আমলে খালিসা ভূমির জমা-অঙ্ক সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না ; তবে অনুমান করা যায় যে, রাজত্বকালের পঞ্চদশ বৎসর হইতে খালিসা ভূমির প্রশাসনিক কাঠামো সঠিকভাবে ঢালিয়া সাজানো হইয়াছিল, এবং খালিসা হিসাবে পরিচিত পরগনা ও মহালগুলি হইতে যে পরিমাণ অর্থের সমাগম হইত, তাহাতে সম্রাটের রাজকোষের আর্থিক স্বাচ্ছল্য রক্ষা করা হইত।[৭] জাহাঙ্গীর রাজস্ব পরিচালন তত্ত্বাবধানে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না এবং তাঁহার আধিকারিকগণ দুর্নীতি ও অসততার প্রশ্রয় দিতেন। ইহার ফলে, কৃষিকর্মের অধোগতি দেখা দিয়াছিল। খালিসা ভূমি হইতে অর্থাগম হ্রাস পাইয়া ৫০ লক্ষ মুদ্রায় নামিয়া গিয়াছিল, এবং আকবর কর্তৃক সঞ্চিত তহবিল হইতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় শুরু হইয়াছিল। সিংহাসন লাভের পর শাহজাহান খালিসা প্রশাসনিক কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই সকল মহালকে খালিসার অন্তর্ভুক্ত করিলেন, যাহাদের মোট ধার্য জমার পরিমাণ ১৫০ লক্ষ মুদ্রা।[৮] খালিসা ভূমির আয় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, এবং রাজত্বের বিংশতি-বর্ষের শেষে, মোট ৮৮০ কোটি দাম জমা হইতে ১২০ কোটি দাম বা তিন কোটি মুদ্রা খালিসা বাবদ চিহ্নিত করা হইয়াছিল।[৯] তাঁহার রাজত্বের শেষে, খালিসা বাবদ জমার পরিমাণ প্রায় চার কোটি মুদ্রায় পৌঁছাইয়াছিল।[১০] আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বর্ষে খালিসা জমি বাবদ জমার অঙ্ক নির্দিষ্ট হইয়াছিল চার কোটি মুদ্রায়।[১১] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাহজাহানের আমলে খালিসা জমির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং আওরঙ্গজেবের আমলে ঐ পরিমাণ প্রায় একই ছিল।[১২]

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, ঐ রীতি বিপরীত পথে চালিত হয় এবং খালিসা

জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। এই ক্ষীয়মাণ গতি অপ্রতিহত থাকিয়া যায় এবং মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রারম্ভেই খালিসা মহালগুলির অধিকাংশ বিলি-ব্যবস্থা মারফত অভিজাত শ্রেণীর কবলে আসিয়া পড়ে। উজির পদে আসীন হইবার পর নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল পত্র পরীক্ষা করিবার সময় এই ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার নজরে আসে যে, উচ্চ পদমর্যাদার মনস্‌ব্‌দারী প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং একইসময়ে, কয়েকশত অশ্বারোহীর পদমর্যাদা ভোগ করিতে উপযুক্ত নহে এরূপ বহু সংখ্যক ব্যক্তিকেও মন্‌সব্ বিলি করা হইয়াছে।[১৩] এই দুইটি ঘটনা—যাহা নিজামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন নহে; বস্তুতঃ ভবিষ্যতে ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে অস্বাভাবিক পথে চালিত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই দুইটি ঘটনাকেই মূলসূত্র বলিয়া ধরিতে হইবে। বাহাদুর শাহ এবং ফারুখসিয়রের আমল সম্পর্কে যে সকল প্রশাসনিক তথ্য রহিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উক্ত দুই সম্রাটের আমলে অভূতপূর্ব হারে মন্‌সব্ বিলি করা হইয়াছিল, এবং মন্‌সব্ ও জায়গীর লাভের লালসায় অত্যধিক আসক্ত কয়েকটি নূতন শ্রেণী, বিস্তৃত হারে মন্‌সব্‌দারী লাভ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দুই দশকের মধ্যেই দক্ষিণা-পথবাসী ও মারাঠাগণ এরূপ পরিমাণে মন্‌সব্‌দারী পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল যে, ১৬৯১ খ্রীঃ নাগাদ নব নিযুক্ত মন্‌সব্‌দারগণকে জায়গীর বণ্টন করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মন্‌সব্‌দার নিয়োগের প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব হয় নাই।[১৪] বাহাদুর শাহের সিংহাসন লাভের পর মন্‌সব্ বণ্টনের কার্য চলিতে থাকে; মন্‌সব্ বিলি-ব্যবস্থার সকল বিধিবিধান লঙ্ঘন করিয়া এবং গ্রহীতার যোগ্যতা বা গুণাবলীর কোনরূপ বিচার না করিয়া তাঁহাদের পদোন্নতি মঞ্জুর করা হয়। পুনরায় জায়গীর প্রথার অস্বাভাবিক বিকাশের প্রতিও কোনরূপ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। ফলে, উক্ত সম্রাটের রাজত্বকালের প্রথম বর্ষে বহু সংখ্যক আমীর মন্‌সব্‌দার হইয়াও তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জায়গীর লাভ করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্‌সব্ বিলি-ব্যবস্থা নিছক নামমাত্র প্রথায় রূপায়িত হয়।[১৫] হয়তো এরূপ অবস্থায় প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া খালিসা হিসাবে চিহ্নিত মহালগুলির বিলি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আমরা জানি, জাহাঙ্গীরের রাজত্বে, মন্‌সব্ বিলির অবাধ বৃদ্ধি জায়গীরদারী ও মন্‌সব্‌দারী প্রথায় যে সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে খালিসা ভূমির পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যায়। বাহাদুর শাহের রাজত্বে প্রাপ্ত জায়গীরের সংখ্যা এরূপ হারে হ্রাস পায় যে, খালিসা মহালগুলির বিলি-ব্যবস্থা ব্যতীত এই সমস্যা সমাধানের অন্য কোন পথ ছিল না। অবশ্য, এই পন্থা অবলম্বনে, খালিসা ভূমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল। ফারুখসিয়ারের রাজত্বে এইরূপ বিলি-ব্যবস্থার আনুপাতিক হার প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, ক্ষমতা লোলুপতায় দরবারে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সম্রাটের দুর্বল

তোষণনীতি, কাশ্মীরী, হিন্দু ও খাজাসেরা ইত্যাদি কয়েকটি নূতন শ্রেণীর (সমাজের অপরাপর শ্রেণীর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া যাহাদের উচ্চতর পদমর্যাদার মনসব্ ও সমৃদ্ধিশালী জায়গীর প্রদান করা হইয়াছিল) অন্তর্ভুক্তি উক্ত সংকট প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হয়, প্রচণ্ড শক্তিশালী মনসব্দার শ্রেণীর চাপে সাক্ষীগোপাল সম্রাট রাষ্ট্রের স্বত্ব কার্যতঃ মনসব্দারগণের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় সমগ্র খালিসা এলাকা উপরোক্ত শ্রেণীর করায়ত্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং খালিসা এলাকার হ্রাস প্রাপ্তি এবং পরবর্তী যুগে ইহার মুমূর্ষু অবস্থার মূল কারণ মনসব্দারী ও জায়গীর-দারী প্রথার উক্ত সংকটের মধ্যেই খুঁজিতে হয়। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিও আমরা অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি: সম্রাটগণের দুর্বল চরিত্র, রাজদরবারে দলীয় চক্রান্ত, এবং উজীরী দপ্তরের পরবর্তী জিম্মাদারগণ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা।

জমা ও হাসিল: আমরা দেখিয়াছি যে, মনসব্দার নামক অধিকাংশ রাজপুরুষগণ ভূমি-স্বত্ব নিয়োগ মারফত তাঁহাদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। এই কারণে, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রাপ্য রাজস্বের হিসাব নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ইহার মধ্যে প্রতিটি গ্রামের—বিশেষ করিয়া প্রতিটি মহালের—আর্থিক সম্পদ নির্ধারণ করা প্রয়োজন হইত। ভূমি-সংক্রান্ত আইনের ভাষায় ইহাকে জমা বা জমাদামী বলা হইত। ব্যাপক অর্থে, মহালের সকল প্রকার সম্ভাব্য করের হিসাব জমার অন্তর্ভুক্ত করা হইত এবং মাল-ও-জিহাত্, সায়ের-জিহাত্ ও সায়ের উল-ওয়াজুহ্ শিরোনামায় এই সকল করের শ্রেণীবিভাগ করা হইত। তবে, কোন মহালের জমা নির্ধারণ করিবার সময় ঐ মহালের অন্তর্গত সমস্ত কৃষিযোগ্য জমির হিসাব করিয়া তাহার উপর রাজস্ব ধার্য করা হইত। কিন্তু এরূপ নিদর্শনও আছে যে, কোন গ্রাম বা মহালের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি কৃষিকর্মে নিয়োজিত হইত না ; ইহার কিছু অংশ পতিত থাকিয়া যাইত। আমরা জানি যে, মোঘল যুগে কৃষিজীবীর তুলনায় জমির পরিমাণ অধিক ছিল এবং সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি কৃষিকার্যে নিয়োজিত করিবার মত যথেষ্ট অর্থ ও লোকবলের অভাব ছিল।[১৬] সুতরাং মোট জমির এক বিস্তৃত অংশ পতিত থাকিত এবং প্রকৃতপক্ষে ইহার উপর কোন রাজস্ব ধার্য করা হইত না। কৃষিকর্মের এই অদ্ভুত পরিস্থিতির দরুন আনুমানিক রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তিতে রচিত কোন এক বিশেষ বৎসরের জমা ও হাল-ই-হাসিল বা নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের প্রকৃত পরিমাণের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য থাকিয়া যাইত।[১৭] ভূমি-রাজস্ব পরিচালন দপ্তর এই তথ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল বলিয়া দস্তুর-উল্-অমাল গুলিতে সর্বদাই জমা ও হাল-ই-হাসিল-এর অঙ্ক পৃথকভাবে দেখানো হইয়াছে। তবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, একাধিক কারণে কোন একটি বৎসরে কৃষিকর্মে নিয়োজিত মোট জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় সর্বাধিক পরিমাণ জমি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ বৎসরের জন্য প্রকৃত ধার্য ভূমি-রাজস্ব আনুমানিক ধার্য ভূমি-

রাজস্বের পরিমাণের সহিত অনেকাংশেই মিলিয়া যাইত এবং এইরূপ ক্ষেত্রে, ধার্য ভূমি-রাজস্বকে হাসিল-ই-সাল কামিল বা হাসিল-ই-কামিল বলা হইত।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথমদিকে ইচ্ছানুযায়ী জমা নিরূপণ করা হইত এবং ইহা 'জমা রকমি কলমি' নামে পরিচিত ছিল। কাগজপত্রে ইহা বর্ধিত হারে দেখানো হইত; কারণ জায়গীর প্রার্থীর তুলনায় বিলি করিবার মত জায়গীরের সংখ্যা যথেষ্ট কম ছিল। মনে হয়, জমা রকমি কলমি পদ্ধতি জায়গীরদারী প্রথার প্রতিকূলে গিয়াছিল এবং রাজত্বের ১১শ অথবা ১৫শ বৎসরে মুজাফ্ফর খান ও রাজা তোডরমল্ল এই প্রথা রদ করিয়াছিলেন। হাল-ই-হাসিল বা নির্ণীত হিসাবের রাজস্বের ভিত্তিতে এবং স্থানীয় কানুনগো কর্তৃক রক্ষিত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া নূতনভাবে জমার হিসাব শুরু হইয়াছিল। পুরাতন জমা হইতে ইহার পরিমাণ সামান্য হ্রাস পাইয়াছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও জমা ও হাল-ই-হাসিল-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলে জায়গীরদার, সৈনিক ও কৃষকগণ প্রচণ্ড দুর্দশায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। রাজত্বের ১৯শ বৎসরে বঙ্গদেশ, গুজরাট ও কাবুল ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল খালিসার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং সাময়িকভাবে জায়গীরদারী প্রথা রহিত থাকে। রাজত্বের ২৪শ বৎসরে, বিগত দশ বৎসরের রাজত্বের (১৫শ হইতে ২৩শ বৎসরের মধ্যে) প্রাপ্ত রাজস্বের গড় হিসাবের ভিত্তিতে শস্য উৎপাদন ও মূল্যমানের উত্থান-পতনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জমা দাহ্-সালা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।[১৮] আকবর-নামায় জমা দাহ্-সালার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া মনে হয়, জমা এবং হাল-ই-হাসিলের অংশে যে পার্থক্য ছিল, তাহা দূর করাই উক্ত সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল এবং শেষে জমা দাহ্-সালার যে হিসাব দাখিল করা হয় তাহা হইতে দেখা যায় যে রাজস্ব মন্ত্রকের এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। সন্তোষজনক জমা প্রস্তুতির পর রাজস্ব বিলি প্রথা পুনরায় প্রচলিত হয়।[১৯]

আকবরের আমলে জমার পরিমাণ ৫০০ কোটি দাম ছাড়াইয়া গিয়াছিল।[২০] জাহাঙ্গীরের রাজত্ব শেষে ঐ পরিমাণ ৭০০ কোটি দাম-এ পেঁছাইয়াছিল।[২১] সম্ভবতঃ কৃষিকর্মে নিয়োজিত জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা মূল্য বৃদ্ধি বা যুগপৎ এই দুই ঘটনার সমন্বয়ের মধ্যেই উল্লিখিত জমা বৃদ্ধির কারণ নিহিত। পুনরায়, মন্সব্ ও মন্সবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সহিত মোকাবিলা করিবার জন্যই বোধহয় জমার অংশ বর্ধিত হারে দেখানো হইয়াছিল। আমরা জানি, সম্রাট জাহাঙ্গীর বেহিসাবী ভাবে মন্সব বৃদ্ধির প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন।[২২] জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক দপ্তরকে যে বর্ধিত জমার সমস্যায় ভুগিতে হইয়াছিল, শাহ্জাহান কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কার হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সংস্কার প্রথায় শাহ্জাহান জায়গীর বিলির ক্ষেত্রে মাসিক অনুপাত ও অনুরূপ ভাবে জায়গীরদারগণের মাহিনা ও বাধ্যতামূলক সামরিক সাহায্যের পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্য মাসিক হার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।[২৩] একজন সমসাময়িক ওলন্দাজ লেখক পেলসারেট এই অনুমান সরাসরি সমর্থন করেন। তিনি

বলিয়াছেন যে জায়গীরগুলির মূল্যমান বর্ধিত হারে দেখানো হইত। যে জায়গীরের মূল্যমান ৫০,০০০ মুদ্রায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল, কৃষককুলের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন সত্ত্বেও সেই জায়গীরের আয় ২৫,০০০ মুদ্রাও হইত না। বর্ধিত জমার ক্ষতিকর প্রভাব মনসবদারী প্রথার উপর যথেষ্ট পড়িয়াছিল এবং রাজকার্য পরিচালনায় প্রচণ্ড ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল। পেলসারেট এর বিবরণ অনুযায়ী, ৫০০০ অশ্বারোহীর পদমর্যাদাবিশিষ্ট বহু মনসবদার তাঁহাদের অধীনে ১০০০ অশ্বারোহীও পোষণ করিতেন না।[২৪]

শাহজাহানের আমলে জমা হাল-ই-হাসিল-এর বিরাট পার্থক্য কার্যক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং এই দুই অঙ্কের পার্থক্য দূর করিবার কোনরূপ চেষ্টাও করা হয় নাই। অপর পক্ষে জায়গীরদারের সম্ভাব্য আয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি নূতন পন্থা সৃষ্টি করিয়া সেইমত তাঁহার দায়দায়িত্ব বাঁধিয়া দেওয়া হইত। প্রতিটি মহালের হাল-ই-হাসিল বা প্রকৃত রাজস্ব নির্ণয় করা হইত এবং জমার (যাহার দ্বারা সমগ্র বৎসরের হাল-ই-হাসিল দেখানো হইত) মাসিক অনুপাতে তাহা বিবৃত হইত। কোন মহালের হাল-ই-হাসিল, জমার দুই তৃতীয়াংশ হইলে, ঐ মহালকে 'অষ্ট-মাসিক মহাল' বলা হইত ; হাল-ই-হাসিল-এর পরিমাণ জমার অর্ধেক হইলে 'ষষ্ঠ মাসিক মহাল' এবং একই ভাবে অন্যান্য মহালের শ্রেণী বিভাগ করা হইত।

সুতরাং মনসবদারগণের বেতন হার ও সামরিক দায়িত্ব তাঁহাদের জায়গীরের হাল-ই-হাসিল-এর অনুপাতে নির্ধারিত হইত।[২৫]

জমার অঙ্ক ঃ মোঘল সম্রাটগণের (আকবর হইতে বাহাদুর শাহ) রাজত্ব-কালে প্রচলিত জমার অঙ্ক আইন, বাদশাহ্-নামা ও একাধিক দস্তুর-উল্-অমাল হইতে পাওয়া যায়। জমা অঙ্কের[২৬] তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ঐ পরিমাণ আকবরের রাজত্বকাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে চরম সীমায় উঠিয়াছিল। জমা পরিমাণের মোট বৃদ্ধির কারণ নিহিত ছিল আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারে ও আংশিকভাবে ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে কর বাবদ বাড়তি আয়ের মধ্যে ! কিন্তু বিভিন্ন রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশের এমন কি, বিভিন্ন সরকারগুলির জমা তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যের প্রায় প্রতিটি পরগনায় জমার অঙ্ক নিশ্চিত ও লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

—দুই—

জায়গীর প্রথা

মোঘল আমলে ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের প্রয়োজনে সমগ্র সাম্রাজ্যকে খালিসা ও জায়গীর মহাল, সামগ্রিকভাবে এই দুই শ্রেণীতে অসমানভাবে ভাগ করা হইয়াছিল। জায়গীর হিসাবে চিহ্নিত কিন্তু বিলি করা হয় নাই এরূপ মহালগুলি লইয়া মহাল-ই-পাই-বাকি নামে এক উপশ্রেণী গঠিত হইত।[২৭] সাম্রাজ্যের

অধিকাংশ অঞ্চল জায়গীর-ভূমি হিসাবে গণ্য হইত এবং মনসবদার নামক রাজকর্মচারীগণকে রাজদরবারে তাহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্য বেতনের পরিবর্তে ঐ সকল মহালের রাজস্ব-স্বত্ব প্রদান করা হইত। এই সকল রাজস্ব-স্বত্বভোগী জায়গীর[২৮] বা ইক্‌তা[২৯] বাবদ প্রাপ্ত মহালগুলি হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার অধিকার ভোগ করিতেন এবং এইরূপ মালিকানা-স্বত্ব ভোগ করায় তাঁহারা জায়গীরদার অথবা তিয়ুলদার নামে পরিচিত ছিলেন। রাজকার্যে প্রতিটি মনসবদারের নির্দিষ্ট পদমর্যাদা স্বীকৃত ছিল—যাহা এককভাবে জাঠ্ অথবা যুগ্মভাবে জাঠ ও সওয়ার পদমর্যাদার সমন্বয়। জাঠ ও সওয়ার পদমর্যাদার বেতনহার পৃথকভাবে নির্দিষ্ট থাকিত এবং তদনুসারে কোন বিশেষ পদমর্যাদার মনসবদারের বেতন দাম-এর অঙ্কে নিরূপিত হইত।[৩০] নির্ধারিত রাজস্ব হইতে বেতনের সমপরিমাণ অর্থ অর্জন করা যাইত এরূপ কোন মহাল বা মহালের অংশ বিশেষ অথবা একাধিক মহাল জায়গীর হিসাবে তাহাকে ইজারা দেওয়া হইত। এইরূপে নিরূপিত আয়ের পারিভাষিক নাম জমা অথবা জমাদানি এবং ভূমি-রাজস্ব সহ হাসিল-সেয়ার ও পেশকাশ ইত্যাদি বাবদ লব্ধ কর সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিত। পণ্য চালান এবং নগর বা বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর আরোপিত কর হইতে যে আয় হইত তাহা সেয়ার মহাল নামে ভিন্ন একশ্রেণীর মহাল হিসাবে পরিগণিত হইত এবং প্রায়শই এই সকল মহাল জায়গীর হিসাবে বিলি করা হইত।[৩১] তবে, মনসবদারগণের বেতন নগদ মুদ্রাতেও প্রদান করা হইত এবং যে সকল মনসবদার নগদ মুদ্রায় বেতন গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের নগদী বলা হইত।[৩২] রাজস্ব স্বত্ব বিলির সহিত কোনরূপ দায়িত্ব না থাকিলে তাহাকে ইনাম বলা হইত।[৩৩]

মোঘল আমলে জায়গীরদারী প্রথা একটি বিশিষ্ট সংস্থা হিসাবে বিকশিত হইয়াছিল এবং সুসংবদ্ধ আইন-কানুন দ্বারা এই সংস্থার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইত। আকবরের রাজত্বে এই অনুপম সংস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু মৌলিক কাঠামো হইতে এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী যৌগিক রূপান্তর শাহজাহানের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। কালক্রমে, এই সংস্থা মোঘল প্রশাসনিক পদ্ধতির বিশিষ্টতম অঙ্গ হইয়া উঠিল। দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত সরকারী কর্ম করিবে, এরূপ একশ্রেণীর কর্মচারী সৃষ্টি করিবার এবং ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের বিরাট দায়িত্ব হইতে সরকারকে কিয়ৎ পরিমাণ মুক্তি দিবার ও গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মুখ্যতঃ এই পদ্ধতির উদ্ভব হয়। কিন্তু ১৭শ শতকের শেষার্ধে, এই সংস্থা সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুতরাং এই পদ্ধতির মূল সূত্র, বৈশিষ্ট্য ও কর্মধারা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

সংস্থার প্রকৃতিঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে জায়গীরদারী সংস্থা যথেষ্ট জটিলতা অর্জন করে এবং বহুবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার বিকাশ ঘটে। জটিল বলিবার কারণ, জায়গীর হিসাবে বন্টিত জমির উপর রাষ্ট্র ও জায়গীরদারের যুগ্ম কর্তৃত্ব থাকিত। একদিকে জায়গীরের আয় নিরূপণের হিসাব করিত রাজস্ব-

মন্ত্রক ; অপরদিকে বাস্তবে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ করিতেন জায়গীরদার অথবা তাঁহার গোমস্তা।[৩৪] পুনরায়, ব্যক্তিগত জোতজমার রাজস্ব নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতাও জায়গীরদারের ছিল না ; রাজস্ব-মন্ত্রক রাজস্বের যে হার বাঁধিয়া দিতেন, তাঁহাকে সেই হারের অনুরূপ কার্য করিতে হইত। জায়গীর হস্তান্তরের পদ্ধতি জায়গীর ভূমি-রাজস্ব পরিচালন কার্য যথেষ্ট জটিল করিয়া তুলিত। বৎসরের মধ্যবর্তীকালে জায়গীরের হস্তান্তর হইলে, প্রাক্তন জায়গীরদার, সরকার ও নবনিযুক্ত স্বত্বভোগীর মধ্যে সংগৃহীত রাজস্ব কি হারে বণ্টিত হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিত নিয়মাবলী ছিল।[৩৫] জমা ও হাল-ই-হাসিল অঙ্কের পার্থক্য হ্রাস করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা এবং পরবর্তীকালে হাল-ই-হাসিল অনুযায়ী স্বত্ব গ্রহীতার দায় দায়িত্বের নব নিরূপিত পদ্ধতি হইতে জায়গীর ব্যবস্থার প্রশাসনিক জটিলতা সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে। ইহা ছাড়াও, আকবরের আমল হইতে এই সংস্থার নিয়মিত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অথবা অর্থনৈতিক পরিবর্তন সহজেই ইহাকে প্রভাবিত করিত। সাম্রাজ্যের প্রসার, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস, মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কৃষক অথবা জমিদারের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি, এই সকল ঘটনা জায়গীর প্রথার মূলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছিল। আমরা এইস্থলে এই প্রথার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এবং যে সকল কারণে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে ইহার বিলোপ ঘটিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিবার প্রচেষ্টা করিব।

জায়গীর হস্তান্তর ঃ মূলতঃ ভূমি-রাজস্ব-স্বত্ববিলির মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিবার প্রণালীকে জায়গীরদারী পদ্ধতি বলা হইত। নিজস্ব এবং সম্রাটের সাহায্যার্থে সৈন্য-সামন্তর ভরণপোষণের ব্যয় বাবদ জায়গীরদারকে যে মহালের রাজস্ব-স্বত্ব দেওয়া হইত , সেই মহালের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল। অর্থ প্রদানের এক বিশেষ প্রণালী হিসাবে জায়গীর বিলির অর্থই হইল এই যে, জায়গীর গ্রহীতার অধিকার প্রদত্ত মহালের রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যেই সীমায়িত ছিল এবং বিলি ব্যবস্থার হুকুমনামায় তাহা বিশেষভাবেই উল্লিখিত থাকিত।[৩৬] স্পষ্টতঃই যে মহাল এই প্রথায় বিলি করা হইত. সেই মহালের জমিতে জায়গীরদারের কোন নিজস্ব দাবি বা স্বত্ব বর্তাইত না। তবে, দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকায়, জমিতে চিরস্থায়ী দাবি বা স্বত্ব অর্জন করা অথবা স্থানীয় যোগাযোগের মারফত যে কোন উপায়ে জমির মালিকানা স্বত্ব কায়েম করা জায়গীরদারের পক্ষে অসম্ভব হইত না। জায়গীরদার হিসাবে দীর্ঘ মেয়াদী রাজস্ব-স্বত্ব ভোগ করিবার প্রথায় এরূপ সম্ভাবনা থাকিত এবং সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য রাজকার্য সাধনের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলন করিবার সময় মোঘল সম্রাটগণ উক্ত অনিষ্ট যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মিত ভাবে জায়গীর হস্তান্তর করা হইত। রাজত্বের ১৩শ বৎসরে আকবর স্বয়ং অটকা খেইল-এর (পাঞ্জাবের অন্তর্গত)[৩৭] জায়গীরগুলির হস্তান্তর করিয়া তাহাদের পরিবর্তে অন্যান্য প্রদেশে জায়গীর প্রদান করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি লইয়া আবুল ফজল যথেষ্ট বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কৃষকের স্বার্থ বজায় রাখিতে এবং জায়গীরদারগণকে তাহাদের নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইলে জায়গীর হস্তান্তর পদ্ধতির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এই উদ্দেশ্যে, যে সকল জায়গীরদার একই এলাকায় কেন্দ্রীভূত, প্রশাসনিক শান্তি ও স্থায়িত্বের প্রয়োজনে তাঁহাদের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল।[৩৮] আকবরের এই নীতি কালক্রমে মোঘল ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল।[৩৯] প্রাসঙ্গিক তথ্য হইতে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মোটামুটিভাবে এই পদ্ধতির প্রচলন অব্যাহত ছিল। কিন্তু ঐ শতকের দ্বিতীয় চতুর্থাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকায় জায়গীর হস্তান্তরের সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দপ্তর ও জায়গীর বংশানুক্রমিক স্বত্বে রূপান্তরিত হয়।

আলোচ্য যুগে জায়গীর হস্তান্তর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, আমাদের এই অনুমানের স্বপক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায় মহাল-ই-পাই-বাকি[৪০] সংক্রান্ত উদ্ধৃতি এবং প্রকৃত জায়গীর হস্তান্তরের দলিলপত্রাদি হইতে। সিয়াক-নামায় তুমার-ই-মহাল-পাই-বাকি বা বৎসরের মধ্যভাগে হস্তান্তরিত জায়গীর সমূহের খাজনা তালিকার একটি খসড়া আছে। বৎসরের মধ্যভাগে যে সকল জায়গীর হস্তান্তরিত হইত, তাহাদের রাজস্ব সরকার ও জায়গীরদারগণের মধ্যে কি অনুপাতে বন্টন করা হইবে, উক্ত খাজনা তালিকায় তাহার উল্লেখ আছে।[৪১] বহু সংখ্যক হস্তান্তরিত জায়গীরের বিশদ হিসাব ঐ দলিলে থাকায় আমরা অনুমান করি যে, অষ্টাদশ শতকের ঊষাকালেও জায়গীর হস্তান্তর প্রথার বহুল প্রচলন অব্যাহত ছিল। অপর একটি তথ্য হইতে জানা যায় যে, ১১৩১ সালে নাসির খান গুজরাটের মহাল-ই-পাই-বাকির দেওয়ান ও আমিন নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৪২] ইহারও পরবর্তীকালে—১১৪৬ হিঃ মহম্মদ মোসিন সোরাট সরকার অধিকৃত মহাল-ই-পাই-বাকি দপ্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৪৩] সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহেই অনুমান করিতে পারি যে, জায়গীর-হস্তান্তর প্রথার প্রচলন অব্যাহত ছিল এবং হস্তান্তরিত জায়গীর সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক ও সরকার, উভয় স্তরেই সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে জায়গীর হস্তান্তরের যে সকল লিখিত নজীর পাওয়া যায়, সেইগুলি আমাদের উক্ত অনুমান দৃঢ়তর করে।[৪৪]

তবে, এরূপ কিছু তথ্যও আছে যাহা হইতে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় চতুর্থাংশে বিভিন্ন দপ্তর ও জায়গীরের পদাধিকারীগণ অধিকতর দীর্ঘকাল ধরিয়া এবং প্রায়শঃই বংশানুক্রমে তাঁহাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। মনে হয়, রাফি-উদ্-দারাজাত এর সিংহাসন লাভের সময় হইতে সম্রাটের অদল-বদলেও এক বিরাট সংখ্যক জায়গীরদারের ভাগ্য অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইত। পূর্বের মত তাঁহারা তাঁহাদের জায়গীর স্বত্ব ভোগ করিতে থাকেন এবং রাজস্ব-স্বত্বে তাঁহাদের অধিকার অটুট থাকিয়া যাইত। সম্রাট পরম্পরায় সাম্রাজ্যের দেওয়ানগণের প্রতি যে সকল আদেশনামা জাহির করা হইয়াছিল, সেইগুলির অনুলিপি মিরাট-ই-আহম্মদি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই সকল আদেশনামা অনুযায়ী, জায়গীরদার

ও মনসবদারগণ যে সকল জায়গীরের রাজস্ব-স্বত্ব ভোগ করিতেছিলেন, সেই সকল জায়গীরে তাঁহাদের উক্ত অধিকার অনুমোদন করা হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় জায়গীরগুলির উপর তাঁহাদের স্বত্ব বহাল রাখা হইয়াছিল এবং নব অনুমোদিত সনদ পেশ করিতে হইবে এই অজুহাতে দেওয়ান জায়গীরদারগণের কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।[৪৫] সুতরাং, এই আদেশনামা পুনঃ পুনঃ জারি হওয়ায় আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, এই সকল সম্রাটের আমলে এক বিরাট সংখ্যক জায়গীরদারের ক্ষেত্রে জায়গীরের হস্তান্তর বা পুনর্গ্রহণ ঘটে নাই। বস্তুতঃ এইরূপ কিছু তথ্য আছে, যাহা হইতে মনে হয় যে, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে দপ্তর ও জায়গীর ভোগের স্বত্ব বংশপরম্পরায় বর্তাইত।[৪৬] নাদির শাহের আক্রমণের পর দেশে অরাজকতা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাতে শীঘ্রই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে দখলিস্বত্ব-সংক্রান্ত আদেশ নামা অপেক্ষা দপ্তর বা জায়গীর দখলে রাখিবার শক্তি ও সামর্থ্যের দাবিই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। এই পরিণতির মধ্যেই এক বিরাট সংখ্যক জায়গীরদারের বিলোপ এবং এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের আবির্ভাবের ইতিহাস নিহিত আছে। এই সকল স্বত্ব ও দপ্তরভোগী ব্যক্তি তাঁহাদের স্বত্ব ও দপ্তর বংশানুক্রমিক বলিয়া দাবি করিতেন।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সীমানাঃ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিন্যাসে জায়গীরদার একটি বিশেষ পদমর্যাদার সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার পদমর্যাদার উপযুক্ত বেতনের পরিবর্তে নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যেই তাঁহার অধিকার সীমিত ছিল সুতরাং, জায়গীরদার হিসাবে, রাজকীয় আইন-কানুন বিরোধী কোন কর্ম করিবার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইত না। উপরন্তু, এরূপ প্রচুর তথ্য আছে, যাহা প্রমাণ-করে যে, মূলতঃ জায়গীরের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যকলাপ যাহার অন্তর্গত ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্ম—রাজকীয় নিয়মকানুন অনুসারেই চলিত।

আকবর ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের চরিত্রটি ফুটিয়া ওঠে। দেখা যায় যে, জায়গীরদারকে দস্তুর[৪৭] অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব ধার্য করিতে হইত এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রেও শস্যের ক্ষতি হইলে সম্রাট যদি রাজস্বের কিয়দংশ মকুব করিতেন, তবে জায়গীরদারকে তাঁহার প্রাপ্য পরিমাণের কিছু অংশ পরিত্যাগ করিতে হইত।[৪৮] সম্রাট বকেয়া পাওনা পর্যন্ত মকুব করিতে পারিতেন এবং সেরূপ ক্ষেত্রে জায়গীরদার রাজাদেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিতেন।[৪৯] ভূমি-রাজস্ব ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মের ব্যাপারে যে সকল রাজকীয় আইনকানুন প্রচলিত ছিল, জায়গীর ভূমির ক্ষেত্রেও সেইগুলি প্রযোজ্য হইত[৫০], এবং প্রাদেশিক দেওয়ান রাজাদেশের মূল বক্তব্য বিষয়গুলি জায়গীরদার ও তাঁহার গোমস্তাগণকে জানাইয়া দিতেন।[৫১]

জায়গীর এলাকার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ একাধিকভাবে চলিত। জায়গীরদারগণের নিয়ন্ত্রণে সাওয়ানিহ্ নিগর (সংবাদনবীশ) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছিল। এই শ্রেণীর কর্মচারীকে জায়গীরদারের কার্যকলাপ এবং জায়গীর অঞ্চলের প্রচলিত অবস্থা সম্পর্কে লিখিত বিবরণ পেশ করিতে

হইত।[৫২] জায়গীরদারের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন অথবা রাজকীয় নিয়মকানুন লংঘনের অভিযোগ উঠিলে তিনি দণ্ড গ্রহণে বাধ্য থাকিতেন।[৫৩] দণ্ডের পরিণাম ছিল জায়গীর হস্তান্তর বা পুনর্গ্রহণ বা জরিমানা।[৫৪] প্রকৃতপক্ষে, জায়গীরদারের ক্ষমতা ও অধিকার—অবশ্য তিনি যদি একই সঙ্গে ফৌজদারী পদেও প্রতিষ্ঠিত না থাকিতেন—ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও তাহার সংগ্রহের কার্যেই সীমিত থাকিত, রাজকীয় আইনকানুন অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ করিতে হইত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও যে রাজকীয় নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ একজন জায়গীরদার কর্তৃক তাঁহার ফৌজদার আমিনকে প্রদত্ত একটি হুকুমনামা হইতে পাওয়া যায়। রাজদরবার যে সকল শুল্ক প্রত্যাহার করিয়াছেন, রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত কোন কর্মচারী যাহাতে সেই সকল শুল্ক সংগ্রহ না করে, তাহার জন্য উক্ত আদেশনামায় ফৌজদার ও আমিনের প্রতি নির্দেশ আছে।[৫৫]

ইহা ছাড়াও, জায়গীরের অন্তর্গত ভূমি-রাজস্ব পরিচালন কার্যকলাপের উপর নজর রাখিবার প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন সংগঠিত হইয়াছিল। রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের অধিকার জায়গীরদারের হস্তে থাকিলেও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা ফৌজদারের হস্তে থাকিত এবং তিনি ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জায়গীরের মধ্যে ঐ পরিচালনের সাধারণ তদারকিও করিতেন।[৫৬] উপরন্তু, রাজদরবার হইতে অপর কয়েকটি স্থানীয় কর্মচারীও (আহ্‌ল-ই-খিদ্‌মত্‌) নিয়োগ করা হইত। জায়গীরদারের গোমস্তাগণের কার্যকলাপ উক্ত কর্মচারীগণের আইন সঙ্গত অধিকারে বাধা সৃষ্টি করিলে ঐ সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট প্রদান করিতে হইত।[৫৭] এই কর্মচারীদিগের মধ্যে ছিলেন, চৌধুরী, কানুনগো ও কাজী। একই প্রশাসনিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারগণের জায়গীরের মধ্যেও এই কর্মচারীগণ রাজদরবার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন।[৫৮] এই দপ্তরগুলির কর্তব্যকর্মের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জায়গীরদারের গোমস্তাগণের উপর নজর রাখা ইহাদের প্রথম কর্তব্য ছিল। ইহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল রাজস্ব-মন্ত্রকের নিকট প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট পেশ করা, যাহার ভিত্তিতে ঐ মন্ত্রক জায়গীরের মধ্যে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন কার্যকলাপের উপর নজর রাখিতে পারিতেন। কাজী প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগীয় কর্মচারী হইলেও, স্থানীয় ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের সহিত তিনি কোন কোন বিষয়ে যুক্ত থাকিতেন। জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল পত্রে তিনিই স্বাক্ষর প্রদান করিতেন। উপরন্তু স্থানীয় মহাফেজখানায় দলিল হিসাবে গচ্ছিত রাখিবার অথবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার পূর্বে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব হিসাবনিকাশের কাগজপত্রাদি তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইত।[৫৯] অপরপক্ষে, চৌধুরী ও কানুনগো ছিলেন পরগনা স্তরের কর্মচারী এবং ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের সহিত তাঁহারা সরাসরিভাবে যুক্ত থাকিতেন। মোটামুটি ভাবে, বংশপরম্পরায় তাঁহাদের পদাধিকার বর্তাইত, এবং পরগনার কৃষিকার্যের অবস্থা সহ জমিস্বত্ব ও মালিকানা সংক্রান্ত রাজস্ব-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র তাঁহারা নিজ হেফাজতে রাখিতেন।[৬০] জায়গীরের হস্তান্তর অথবা খালিসা কর্তৃক পুনর্গ্রহণ প্রচলিত থাকিলেও এইরূপ

পরিবর্তনের ফলে চৌধুরী ও কানুনগো পদের কোন অদলবদল হইত না। অতএব স্থানীয় দলিলপত্রাদি অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত থাকিয়া যাইত এবং কোন জায়গীর সম্পর্কে সরাসরি তথ্যাদির প্রয়োজন হইলে একজন আধিকারিক ঐ সকল দলিল হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন। উপরন্তু, সুপ্রচলিত একটি প্রথা অনুযায়ী জায়গীরদারগণকে প্রচলিত ও পূর্ববর্তী বৎসরের হাল-ই-হাসিল[৬১] এর হিসাব প্রতি বৎসর প্রদান করিতে হইত। এই মর্মে তাঁহাদের একটি মুচলেকা দিতে হইত যে, তাঁহাদের প্রদত্ত হিসাব সঠিক এবং ইহাতে কোনরূপ মিথ্যা অঙ্কবিন্যাস ধরা পড়িলে তাহার কৈফিয়ত দিতে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন।[৬২] মোয়াজানা-ই-দাহ্সালা[৬৩] তালিকাও তাঁহাদের পেশ করিতে হইত। সুতরাং, রাজস্বমন্ত্রী বিভিন্ন স্থান হইতে রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া জায়গীর অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারিতেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও সাম্রাজ্যের প্রধান অংশগুলি জায়গীর প্রথায় নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ আমলেই রাজস্ব বিলিব্যবস্থার স্বরূপ ও চারিত্রিক কাঠামোর কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবর্তনের সূচনা হইতে থাকে। ভূসম্পত্তিশালী অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা ও দাবি হ্রাস করিবার এবং বেতনের পরিবর্তে রাজস্ব বিলির মারফত রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সাধনে এক শ্রেণীর দক্ষ কর্মচারী সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু, সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে, এই প্রথার সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যাহত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সংস্থাটি অনড় অবস্থায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও ভূমিবিষয়ক অবস্থার সহিত এই সংস্থা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে অপারগ হইয়া পড়ে। রাজকার্যের সুষ্ঠু পরিচালন ব্যাহত হইতে থাকিল এবং আর্থিক সংকটের চাপে জায়গীরদারগণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইল। নব-নিযুক্ত মনসব্দারগণকে জায়গীর বিলির ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক সংস্থানের পথ সংকুচিত হইয়া গেল।[৬৪]

সুতরাং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে, জায়গীরদারী প্রথা এরূপ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল যাহা ঐ সংস্থার স্থায়িত্বে ভাঙন ধরাইয়া দেয়। মনসব্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি, অধিক সংখ্যায় পুরাতন কর্মচারীগণের মধ্যে মনসব্ বিলি এবং সেই সংখ্যানুপাতে রাজস্ব বিলিব্যবস্থার উৎকট দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়াছিল। প্রথম দুইটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল জমার বর্ধিত হার এবং সাবেকী (খানাহ্ জাদান্) মনসব্দার শ্রেণীও তাহার নব উদ্ভূত সংস্করণের মধ্যে মনসব্ ও জায়গীর প্রাপ্তি লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল হইতে মহম্মদ শাহ-এর রাজত্ব প্রাপ্তির অন্তর্বর্তী দশ-বারো বৎসরকাল ধরিয়া এই প্রবণতাগুলি—যাহা জায়গীর প্রথাকে প্রায় ধ্বংসের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছিল—অব্যাহত ভাবে এবং কখনও কখনও তীব্রতর গতিতে বিকশিত হইতেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বল নিয়ন্ত্রণের সহিত এই সকল ঘটনা যুক্ত হইয়া উক্ত সংস্থার ভাঙনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল এবং নাদির শাহের আক্রমণকালের পূর্বে সংস্থাটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিবল হইয়া পড়িল। পরবর্তীকালে, মনসব্ বিলির প্রথা সরকারীভাবে প্রচলিত থাকিলেও, ইহার সহিত যথাযথ রাজস্ব বিলির

বন্দোবস্ত প্রায়শই অনুপস্থিত থাকিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে, নগদ মুদ্রার মাধ্যমে নিয়োগ পদ্ধতি অধিকতর সুপরিচিতি লাভ করে। এইভাবে জ্যেষ্ঠ মোঘল আমলে যে জায়গীরদারী প্রথার বিকাশ হইয়াছিল, পরবর্তীকালে তাহার অবসান ঘটিল। নবরূপে এই প্রথার প্রচলন থাকিয়া গিয়াছিল, অথবা দক্ষিণাপথ, বঙ্গদেশ, বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের যে সকল অংশ সম্প্রতি নূতন ক্ষুদ্র রাজ্য হিসাবে গঠিত হইয়াছিল সেই সকল অঞ্চলে নূতন কোন সংস্থার বিকাশ হইয়াছিল কিনা, তাহা প্রাদেশিক রাজন্যবর্গের কর্তৃত্বাধীন ভূমি-রাজস্ব পরিচালন লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিবেন, তাঁহাদের নিকট মূল্যবান বিষয়বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইবে। আপাততঃ, মোঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থার শেষ পর্যায় সংক্রান্ত তথ্যগুলি আমরা আলোচনা করিব। এই তথ্যগুলি আমাদের উপরোক্ত অনুমান সমর্থন করে।

১৬৯১ খ্রীঃ পূর্বেই বিলিযোগ্য জায়গীরের স্বল্পতা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান মনসবদার শ্রেণীর জন্য জায়গীর সংগ্রহের প্রচেষ্টা এই প্রথায় এক সংকট সৃষ্টি করিয়াছিল।[৬৫] মনে হয় আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ কয়েকটি বৎসরেও জায়গীরদারী প্রথার এই সংকট অব্যাহত ছিল ; বোধহয়, তাহা অধিকতর ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে আমাদের অনুমান সমর্থন লাভ করেঃ সিংহাসন লাভের পর বাহাদুর শাহ বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও আমিরকে জায়গীর প্রদান করিতে অপারগ হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার যদৃচ্ছ মনসব দান ও মনসব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস, এই সংকট অধিকতর ঘনীভূত করিয়াছিল। নুস্খা-ই-দিলকুশা গ্রন্থের রচয়িতা বাহাদুর শাহ-এর রাজত্বকালের প্রথম বৎসরের ঘটনাসমূহ লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, আওরঙ্গজেবের আমলের প্রতিটি মনসবদারের জায়গীর সংখ্যা বর্ধিত করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সকলকেই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। সম্রাটের চতুষ্পার্শ্বে এক বিরাট সংখ্যক সেনাবাহিনী মিলিত হইয়াছিল। রাজপুত্রগণ, খান-ই-খানান এবং কিছু সংখ্যক আমিরকে হিন্দুস্থানে জায়গীর প্রদান করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বহু সংখ্যক আমিরের ভাগ্যে তাহা জোটে নাই। খান-ই-খানান নিম্নলিখিত একটি পরিকল্পনা সম্রাটের নিকট পেশ করিয়াছিলেনঃ রাজপুত্রগণ, বাসভূমি সাম্রাজ্যের শাসনভুক্ত করিয়া সেইগুলি আমিরগণের মধ্যে বিলি করা হউক। মনে হয়, সম্রাট এই পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছিলেন এবং মুইন-উদ্দীন চিশতির পবিত্র মসজিদ দর্শনের অছিলায়—প্রকৃতপক্ষে, রাজপুতগণের জায়গীর সমূহ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে—আজমীরের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছিলেন।[৬৬]

আলোচ্য সাক্ষ্য হইতে অনুমান করা যায় যে, যে সকল কারণে জায়গীরদারী প্রথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল, সেই সকল কারণ শুধু যে বিদ্যমানই থাকিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, উপরন্তু নূতন সম্রাটের আমলে সেইগুলি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতগণ সকলেই স্বীকার করেন যে স্বভাবগত ভাবে বাহাদুর শাহ অমায়িক ও উদারচেতা ছিলেন এবং প্রশাসনের নীরস

কার্যাবলীতে তাঁহার কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না।[৬৭] মাত্রাহীন হারে মন্‌সব্‌ বিলি ও মন্‌সবের সংখ্যাবৃদ্ধির মারফত তাঁহার রাজকীয় শাসনের সূচনা হইয়াছিল। উচ্চ ও নিম্ন পদমর্যাদার হিন্দু ও মুসলমান মন্‌সব্‌দারগণকে ৬০০০ বা ৭০০০ অশ্বারোহীর পদমর্যাদায় উন্নীত করিয়া জঙ্গ, মালিক, রায়, রাজা ইত্যাদি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছিল; ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে মন্‌সব্‌ ও সম্মানসূচক উপাধিগুলি গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে।[৬৮]

মাত্রাহীন হারে মন্‌সব্‌ বিলির পরিণাম সম্পর্কে নূতন সম্রাট সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে, জায়গীরদারী প্রথার ক্রমাবনতি ঘটাইবার কর্মে—প্রায় দুই দশক পূর্বেই যাহার ভয়াবহ সূচনা হইয়াছিল—তাঁহার সক্রিয় অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু, তৎকালে এরূপ কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা সম্রাটের মাত্রাহীন হারে মন্‌সব্‌ বিলি এবং জায়গীর প্রাপ্তির সম্ভাবনার কোন হিসাব ব্যতিরেকেই পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রবণতার পরিণামে কি ঘটিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। এই অবস্থার উন্নতিসাধনে যথাযোগ্য পন্থা অবলম্বন না করিলে যে অচিরেই জায়গীরদারী পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ-এর রাজত্বের প্রথম বৎসরেই তাঁহারা এই ধ্বংস রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও, ইহার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন, কারণ, জায়গীরদারী পদ্ধতি সম্পর্কে তৎকালীন মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা এই আলোচনা হইতে জানা যাইবে।

ইখ্‌লাস্‌ খান নামক একজন অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ ব্যক্তি তাঁহার সম্রাটের নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাস্থাবান ছিলেন। আর্জি মুকারার-এর দপ্তর তাঁহার হস্তে ছিল।[৬৯] মন্‌সব্‌ বিলি ও গ্রহীতার যোগ্যতার কোন বিচার না করিয়াও, তাঁহার পদমর্যাদা উন্নত করিবার যে উদার নীতি সম্রাট অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার নজরে পড়িয়াছিল। সম্রাটের এই নীতি সমর্থন করিতে না পারিয়া জায়গীর বিলব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রবর্তন করিতে তিনি জুম্‌লাত্‌ উল্‌-মুল্‌ক্‌-কে অনুরোধ করেন। বিলিব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনিতে না পারিলে, সাম্রাজ্যের আর্থিক সংস্থান—যাহা সম্রাটের অসংগত জায়গীর প্রদানের তুলনায় যথেষ্ট স্বল্প—শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া পড়িবে, এবং সাম্রাজ্যের পুরাতন কর্মচারীবৃন্দ (যাঁহারা এখন পর্যন্ত আর্থিক সাচ্ছন্দ্য ও মর্যাদা ভোগ করিতেছেন) অচিরেই জীবিকাহীন হইয়া পড়িবেন। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সম্রাটের নিকট দ্বিতীয়বারের জন্য মন্‌সব্‌ সংক্রান্ত ইয়াদ্দাস্ত পেশ করিবার পূর্বে তাহা যখন সাক্ষ্য লাভের জন্য উজীরের নিকট পেশ করা হইবে, তখন গ্রহীতার জন্ম, বংশ, পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করিবার পরই তিনি যেন ঐ স্বাক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু সাধারণের নিকট অপ্রিয় হইতে উজীর রাজী ছিলেন না; সুতরাং এই অনুসন্ধানের দায়িত্বভার ইখ্‌লাস্‌ খান-এর হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু, পরোক্ত ব্যক্তিও অনুসন্ধানের দায়িত্ব লইতে অস্বীকার করেন। অবশেষে, এই সিদ্ধান্ত করা হইল যে, মুস্তাদ্‌ খান (ওরফে মহম্মদ সাকী)-র হস্তে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। স্থির হইল যে, সম্রাটের নিকট দ্বিতীয়বারের জন্য

ইয়াদ্দাস্ত পেশ করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হইবে ঃ

১। মনসব্ প্রার্থী যিনি সর্বপ্রথম এই আবেদন করিতেছেন—তিনি সম্রাটের অধীনে চাকুরী করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন কিনা।

২। মনসব্ প্রদান অথবা বৃদ্ধির কারণ।

৩। সংশ্লিষ্ট সুপারিশের রীতি ও গুরুত্ব।

৪। মনসব্দারের যাহা প্রাপ্য, তিনি তাহা হইতে বর্ধিত হারে মনসব্ লাভ করিয়াছেন কিনা।

ইহাও স্থির হয় যে, পদোন্নতির জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে কোন ব্যক্তির মনসব্ বৃদ্ধি করা হইবে না। আশঙ্কা করা হয় যে, এইরূপ অনুসন্ধান যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ হইতে পারে। অনুসন্ধানের পর মুস্তাদ্ খানকে মনসব্ বিলি অথবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত ইয়াদ্দাস্ত[৭০] এর উপর "অনুমোদিত" লিখিতে হইবে।

উল্লিখিত তথ্য হইতে দেখা যাইবে যে, প্রস্তাবিত সংশোধনে মনসব্ সংখ্যা হ্রাস করিবার অথবা সাময়িক ভাবে মনসব্ পদে নূতন প্রার্থী নিয়োগ স্থগিত রাখিবার কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ এইরূপ সার্বিক সংশোধনের কল্পনাও অসম্ভব ছিল, কারণ, তাহার রূপায়ণে সর্বশক্তিমান মনসব্দার শ্রেণী—যে শ্রেণী সূচনায় রাষ্ট্রের সাহায্যে গঠিত হইলেও তৎকালীন যুগে রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল—ক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। সুতরাং প্রস্তাবিত সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নূতন মনসব্ প্রার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও অযোগ্য ব্যক্তির আবেদন অগ্রাহ্য এবং মনসব্ বৃদ্ধির হার সংকোচন করিবার জন্য যথোচিত নিয়মকানুন প্রণয়ন করা। কিন্তু সরকারের শক্তি এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সংশোধনের এই নরম ধারাগুলি রূপায়ণ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি প্রস্তাবিত সংশোধন কার্য রূপায়ণ করিবার ব্যক্তিগত দায়িত্ব হইতে উজীর নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে-সকল ক্ষমতাশীল ব্যক্তি এই রূপায়ণের বিরোধিতা করিতেছিলেন, তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষকগণ রাজপ্রাসাদের মধ্যেই বাস করিতেন। মুস্তাদ খানকে পঙ্গু করিয়া ফেলা হয় এবং প্রস্তাবিত সংশোধন কার্য রূপায়ণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্রাটের পত্নীগণ ও রাজসভার অন্যান্য প্রিয়পাত্রগণের চাপে পড়িয়া মুস্তাদখান তদন্ত শেষ না করিয়াই ইয়াদ্দাস্ত-এ স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। অতএব কাফি খানের মতে নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিয়াই রাজকার্য নির্বাহ করা হইতে লাগিল এবং সম্রাটের স্বাক্ষরের কোন গুরুত্বই থাকিল না।[৭১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বাহাদুর শাহ-এর রাজত্বকালের প্রথম বর্ষ হইতে আমীরগণের একটি বিরাট সংখ্যার জন্য জায়গীর দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। দৃশ্যতঃ, রাজপুতানা জয়ের অভিযান এই সকল আমীরের জন্য জায়গীর সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই শুরু হইয়াছিল, কিন্তু পরিকল্পনাটি সফল হয় নাই। মনসব্দারের অভূতপূর্ব সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণে সাবেকী মনসব্দারগণের

পদমর্যাদা বৃদ্ধি রদ করিবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। নূতন মনসব্ বিলি ও প্রচলিত মনসব্ বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত থাকিয়া গেল এবং কত জায়গীর পাওয়া যাইতে পারে তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়াই উক্ত প্রথাটিকে কার্যকর করিবার প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। এইরূপ প্রশাসনিক প্রণালীর ফল স্বরূপ যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিয়াছিল ; বহু ক্ষেত্রেই নামমাত্র মনসব্ বিলির প্রথা থাকিয়া গেল এবং ইহার সহিত প্রাপ্ত জায়গীর সংখ্যার কোন সামঞ্জস্যই থাকিল না। পদমর্যাদা ও খেতাবের কোন মূল্যই থাকিল না বলিয়া প্রামাণ্য পুস্তকাদিতে যে খেদোক্তি দেখা যায়, সম্ভবতঃ জায়গীরদারী প্রথার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা লিখিত হইয়াছিল।

মনে হয় রাজকীয় আস্তাবলের পশুপালনের জন্য জায়গীরদারগণের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সেই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুভারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। জায়গীর হইতে যে মোট আদায় হইত, তাহার দ্বারা রাজকীয় আস্তাবলের পশুপালন বাবদ ব্যয়ের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ বহন করা সম্ভব হইত না। সুতরাং জায়গীরদার ও তাঁহাদের গোমস্তাবর্গ প্রচন্ড আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। খান-ই-খানান-এর প্রস্তাবানুযায়ী শাহ আলমের রাজত্বকালে ইহা স্থির হয় যে ভবিষ্যতে মনসবদারগণকে জায়গীর বিলি করিবার সময় রাজকীয় আস্তাবলের পশুপালন বাবদ দেয় অর্থ তাঁহাদের জায়গীরের নির্ধারিত জমা (বা দাম) হইতে বাদ দেওয়া হইবে। বলা হইয়াছে যে সংশোধনের ফলে জায়গীরদার ও তাঁহাদের গোমস্তাগণের দুঃখের অবসান হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে, এই সংশোধন জায়গীরদারগণকে করমুক্ত করিয়াছিল।[৭২] প্রসঙ্গত, আলোচ্য তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে, অতিশয়ভাবে স্ফীত জমার অঙ্ককে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি দেওয়া হইত এবং ফলে তাহা হইতে নাম মাত্র অর্থ মকুব করায় জায়গীরদারগণের আয়ের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হইত না।

ফারুখ সিয়রের দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্র, যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং সৈয়দ ভ্রাতাদের ক্ষমতা লোলুপতা—এই সকল ঘটনার সমন্বয়ে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড ঈর্ষা সৃষ্টি হয় এবং তাহারই ফলে রাজসভা চক্রান্ত ও কূট সংকল্পের সরেস ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে নূতন সম্রাট মোঘল রাজবংশের সর্বপ্রথম সাক্ষীগোপাল হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাট চক্রান্তকারী অভিজাত শ্রেণীর কোন এক গোষ্ঠীর আজ্ঞাধীন ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। উজীরী দপ্তরের মত উচ্চ পদের যথেষ্ট যোগ্যতা কুতুব্-উল্-মুল্ক্ এর ছিল না। তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন সৈনিক, তিনি ভোগবিলাসিতায় নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াছিলেন। প্রশাসনিক কর্মের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না এবং নিজস্ব কর্তব্য কর্মের প্রতিও তিনি অবহেলা দেখাইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁহার দুর্নীতিগ্রস্ত দেওয়ান রতনচাঁদের হস্তে চলিয়া গেল। এইরূপ পরিবেশে মনসব্ ও জায়গীর বিলির প্রথাটি প্রশাসনিক কর্মধারার স্বীকৃতি অথবা গ্রহীতার প্রশংসনীয় কর্মের পরিবর্তে অধিকতরভাবে রাজনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ

প্রচলিত হইল এবং কখনও তোষণ নীতি হিসাবে আবার কখনও দুই বিবাদী দলের ভারসাম্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জায়গীর ও মনসব্ বিলি করা হইতে লাগিল। এই সকল কারণে, জায়গীরদারী প্রথার ভাঙ্গন—যাহা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে শুরু হইয়াছিল—ফারুখসিয়ারের রাজত্বকালে অধিকতর ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

আওয়াল-উল্-খওয়াকিন্ গ্রন্থের লেখকের মতে, অধিকাংশ মনসব্দারগণকে—যাঁহারা ৫০০ পদমর্যাদারও যোগ্য ছিলেন না—৫০০০ ও ৭০০০ পদমর্যাদায় উন্নীত করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী জায়গীর-স্বত্ব অর্জন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনের সময়, সামরিক কর্মের প্রয়োজনে তাঁহারা নিজেদের সম্পূর্ণ অপদার্থ প্রমাণ করিতেন। উপরন্তু পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের বংশধরগণ সম্রাটের আনুকূল্য লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করাও তাঁহাদের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল।[৭৩] প্রসঙ্গতঃ ইহাও জানা যায় যে, প্রায় সমস্ত খালিসা ভূমি জায়গীর হিসাবে বিলি করা হইয়াছিল। এইরূপ পরিণতির উল্লেখ মুন্তাখাব-উল্-লুবাব[৭৪] নামক একটি সমসাময়িক কালে রচিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাফি খান-এর বিবরণ অনুযায়ী হিন্দু, খোজাসারা ও কাশ্মীরীগণ জালিয়াতি ও জবরদস্তির দ্বারা উচ্চ পদমর্যাদার মনসব্গুলি হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। অপর এক শ্রেণীর জায়গীরদারগণকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহারা সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব উৎপন্নকারী জায়গীরগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং অপরের পক্ষে জায়গীর লাভ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। ইনায়েতুল্লাহ খান[৭৫] প্রয়োজনীয় সংশোধন কার্যকরী করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন যে, আওয়ারিজাহ্[৭৬] ও তৌজির[৭৭] যথাযোগ্য অনুসন্ধানের পর যে সকল হিন্দু ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তি মনসব্ ভোগ করিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহাদের মনসব্চ্যুত করা হইবে। রতনচাঁদ ও অপর কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারী—যাঁহারা রাজস্বমন্ত্রকে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রস্তাবিত সংশোধনের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই প্রস্তাবের কথা কুতুব-উল্-মুল্ক্কে জানাইলেন, তিনি প্রস্তাবিত সংশোধন প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিলেন। অপরপক্ষে জিজিয়া করের পুনঃ প্রবর্তনে ও তাঁহাদের মনসব্ হ্রাসের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য প্রতিটি হিন্দু জায়গীরদার ইনায়েতুল্লাহ খানের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। এই সকল কলহ অভিযোগের ফলে কুতুব-উল্-মুল্ক্ ও ইনায়েতুল্লাহ খানের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা কার্যকর হইল না এবং এই দুই ব্যক্তির মধ্যে তীব্র বৈরিতা সৃষ্টি হইল।

উপরে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করা হইল, যথেষ্ট সতর্কতার সহিত তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ ইহার মধ্যেই জায়গীরদারী পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির তিরোধান ও রাষ্ট্রের উপর জায়গীরদারগণের সম্পূর্ণ প্রভাবের বিবরণ রহিয়াছে। ইহাতে আরও প্রমাণিত হয়, কিভাবে নিজ নিজ দায় দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনা ব্যতিরেকেই আশাতীতভাবে মনসব্-এর

সংখ্যা বৃদ্ধি[৭৮] করা হইয়াছিল। অর্থাৎ যে সকল দায় দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতির শর্তে জায়গীরদারী-স্বত্ব প্রদান করা হইত, সেই সকল প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য জায়গীরদারগণের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার মত ক্ষমতা রাষ্ট্রশক্তির ছিল না, অধিকাংশ মনসবদারের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। মনে হয় এমন এক নূতন শ্রেণী মনসবদার গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছিল, যোদ্ধা হিসাবে যাহাদের কোন সাহসিকতা বা দক্ষতা ছিল না। কাশ্মীরী, খোজাসারা ও হিন্দুদিগকে লইয়া এই নূতন শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। মুৎসুদ্দি অথবা কেরানী হিসাবে তাঁহারা রাজপরিষদে কার্য করিতেন এবং শঠতা ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া উচ্চপদের মনসব ও মূল্যবান জায়গীর হস্তগত করিয়াছিলেন। এই পরিণতি অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, কারণ এই সকল মনসবদারের উপযুক্ত যোগ্যতা অথবা সামরিক দায়িত্ব পালনের অভিরুচি ছিল না। বস্তুতঃ, ইঁহাদের সম্পর্কে বলা যায় যে ইঁহারা হইলেন এমন এক শ্রেণীর জায়গীরদার ও মনসবদার যাঁহারা রাষ্ট্রের নিকট হইতে লব্ধ অর্থের বিনিময়ে কোনরূপ সাহায্য দান করিতেন না। তৃতীয়তঃ, মোঘল সাম্রাজ্যের পুরাতন রাজকর্মচারীগণের বংশধরগণকে—যাঁহারা অসাধারণ সামরিক পটুতা ও বীরত্ব এবং রাজানুগত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছিলেন—বঞ্চিত করিয়া এই নূতন শ্রেণী মনসব ও জায়গীর অর্জন করিয়াছিলেন। ক্ষমতা ও সম্মানের তীব্র প্রতিযোগিতায় পুরাতন মনসবদারগণের বংশধরগণ নূতন আগন্তুকগণের নিকট পরাজিত হইয়া মনসব ও জায়গীর বিহীন চরম আর্থিক দুরবস্থায় দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃই এই পরিণতির ফলে সাম্রাজ্যের কর্তব্যকর্ম করিবার ইচ্ছা ও শক্তি যে সকল ব্যক্তির ছিল, তাঁহাবা অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। এই স্থানে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তদানীন্তনকালের এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও পুনরায় সংশোধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বের মতই তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু আলোচ্য যুগের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি হইল জায়গীর হিসাবে খালিসা-ভূমির বিলিবন্দোবস্ত। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অভিজাত ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর অর্জনের তাগিদ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহারা নামমাত্র মনসব—যাহা সম্ভবত বাহাদুরশাহের রাজত্বে তাহাদের গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া, প্রদত্ত মনসবের উপযুক্ত জায়গীর লাভ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জায়গীর সহজপ্রাপ্য ছিল না। খালিসা-ভূমি হইতে জায়গীর প্রদানের একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করা হইল। দুর্বল চিত্ত সম্রাট—যিনি সকল সময়েই কোন না কোন গোষ্ঠীর সাক্ষীগোপাল হিসাবে কাজ করিতেন—শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মনসবদারগণের দাবি মিটাইবার উদ্দেশ্যে, সম্রাট খালিসা-ভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট মহালগুলির বিলিবন্দোবস্ত করিতে শুরু করিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খালিসা-ভূমির অধিকাংশই জায়গীরগণের হস্তে চলিয়া গেল।

মোঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসে ইহা এক অসাধারণ পরিণতি, যাহার ফলে রাষ্ট্র তাহার স্বত্বাধিকার প্রকৃতপক্ষে মনসবদারগণের হস্তে সমর্পণ করিল। এইভাবে রাষ্ট্রের সহায়ক ও সেবক হিসাবে যে শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, পরিণতিতে সেই শ্রেণী রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর হইয়া, অবশেষে রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকার আত্মসাৎ করিয়া লইল। মনসবদারী প্রথার মধ্যে যে স্বাভাবিক বৈপরীত্য অন্তর্নিহিত ছিল, এইভাবে তাহার স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। এই প্রথা তাহার জনক রাষ্ট্রেরই বিলোপসাধনে সহায়ক হইয়া উঠিল।

কিন্তু মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাপ্ত জায়গীরের অপ্রতুলতা যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, খালিসা ভূমির জায়গীরে রূপান্তর সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। ফলে, যে সকল মনসবদারকে সরাসরি সম্রাটের অধীনে কার্য করিতে হইত, তাঁহাদের নগদ মাহিনায়—যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের জন্য জায়গীর সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়—নিযুক্ত করা হইত। বলা হইয়াছে যে, লুফত্-উল্লাহ্-সাদিক্-এর[৭৯] পরামর্শে সম্রাট ফারুখসিয়ার এক আদেশনামায় এই নির্দেশ জারি করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের জায়গীর প্রদান করা সম্ভব না হইবে, ততদিন পর্যন্ত ২০ হইতে ৯০০ পদমর্যাদার পাদশাহী[৮০] এবং ৭০০০ হইতে ৮০০০ পদমর্যাদার ওয়ালা-শাহী[৮১] মনসবদারগণকে মাসিক ৫০ টাকা হারে বেতন প্রদান করা হইবে। ওয়ালা-শাহী মনসবদারগণকে—যাঁহাদের শৌর্য ও রাজভক্তির যথেষ্ট প্রমাণ ছিল—১০-১২ মাস ধরিয়া কোন মাহিনা দেওয়া হয় নাই। ইঁহাদের এক বিরাট অংশ জায়গীর পাইবার প্রত্যাশায় কর্ম করিতেছিলেন। আকস্মিক এক আদেশনামা জারি করিয়া তাঁহাদের বরখাস্ত করা হইল। বক্সীগণের নিকট হইতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে।[৮২]

১৭২১ সালের অক্টোবর মাসে উজীরী দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া নিজাম্-উল্-মুল্ক্ এই পদ্ধতি যাহাতে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া না পড়ে তাহার জন্য শেষবারের মত চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজস্ব মন্ত্রকের দলিলপত্রাদি অনুধাবন করিয়া তিনি যে সকল তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেইগুলি তাঁহাকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল সম্রাটের নজরে আনা হইলে সম্রাট তাঁহাকে জায়গীরভূমি বিলিব্যবস্থার শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নিজাম্-উল্-মুল্ক্-এর প্রস্তাবিত সংস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লিখিত হইল :

১। পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা উচিত।

২। ব্যক্তিগত যোগ্যতা দ্বারা যে সকল ব্যক্তি মনসব্ অর্জন করে নাই, তাঁহাদের মনসব্ হ্রাস করিতে হইবে।

৩। পূর্ববর্তী রাজত্বকালে যে সকল মহাল খালিসা-ভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল সেই মহালগুলি সরকার কর্তৃক পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। যে সকল জায়গীর হইতে বল প্রয়োগ অথবা বল প্রয়োগের হুমকি দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সকল জায়গীর শক্তিশালী রাজপুরুষগণের

মধ্যে বিলি এবং যে সকল তিয়ুল হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতিতে রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়, সেইগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অল্প শক্তিমান মনসবদারগণের মধ্যে বিলি করিতে হইবে।[৮৩]

প্রস্তাবিত সংস্কার সমাজের কোন কোন অংশে উচ্চাশা সৃষ্টি করিয়াছিল[৮৪] এবং আশা করা হইয়াছিল যে এই ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ভারসাম্য—যাহা আওরঙ্গজেবের আমল হইতে ব্যাহত হইয়াছিল—ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু, শীঘ্রই এই আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল এবং সাম্‌সাম্‌-উদ্‌-দৌল্লাহ ও হায়দার কুলি খান প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে উজীর দৃঢ় বিরোধিতা পাইতে লাগিলেন। কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ এবং রাজসভার পেশাদার চক্রান্তকারী গোষ্ঠী অচিরেই সম্রাটকে তাঁহার যোগ্য ও সম্ভাবাপন্ন উজীরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিলেন। নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌ক্‌কে অবমাননা করিতে সম্রাটকে প্রবৃত্ত করা হইতে লাগিল। ফলে, ১৭২৩ (ডিসেম্বর) সালে নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌ক্‌ দিল্লী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই তিনি মালব পৌঁছাইলেন,[৮৫] জায়গীরদারী পদ্ধতি এবং সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার শেষ সুযোগ চলিয়া গেল। যাহা অবশ্যম্ভাবী অচিরে তাহাই ঘটিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যেই সংস্থাটির মূল উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল। আনন্দরাম মুখলিস্‌-এর বিবরণ অনুযায়ী জায়গীরদারী-স্বত্ব বিশেষ কাহারও কপালে জুটিত না। স্বত্ব পাইলেও বণ্টিত জায়গীর লাভ করা দুষ্কর ছিল।[৮৬]

—তিন—

মাদাদ্‌ মাস্‌ ভূমি

ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকবর্গ ধর্মপ্রাণ, পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিদিগকে—যাঁহাদের অপর কোন আর্থিক সংস্থান ছিল না—করমুক্ত জমি প্রদান করিতেন। প্রচলিত পদ্ধতি বজায় রাখিয়া, মোঘল সম্রাটগণও ধর্মপ্রাণ, পণ্ডিত, গরিব ও আর্ত এবং শেখ, সৈয়দ, ইরাণী ও তুরাণী মহিলাগণকে খোরাকি বাবদ ভাতা দান করিতেন।[৮৭] এইরূপ খোরাকীভাতা নগদে অথবা ভূমি প্রদানের মাধ্যমে দেওয়া হইত। জমি বিলি মাধ্যমে খোরাকী-ভাতাকে মাদাদ্‌-মাস্‌ অথবা মিল্‌ক্‌[৮৮] বলা হইত। এই দুই প্রকার দান সিয়ারঘল[৮৯] বলিয়া প্রচলিত পদটির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুতরাং, গ্রহীতার প্রয়োজনে ধর্মপরায়ণতা, পাণ্ডিত্য অথবা বংশ পরিচিতির (বিশেষ করিয়া শেখ বা সৈয়দ) সুবাদে যে জমি দান করা হইত তাহাকেই মাদাদ্‌-মাস্‌ বলা হইত। আবুল ফজলের মতে, চারি শ্রেণীর ব্যক্তি মাদাদ্‌-মাস্‌ লাভ করিবার অধিকারী ছিলেন। প্রথমতঃ যাঁহারা সত্যান্বেষী এবং সংসার ত্যাগ করিয়া ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা ইন্দ্রিয় ও দৈহিক সুখ ত্যাগ করিয়া অহংশূন্য ও অহং বিবর্জিত জীবন যাপনের সাধনা করিতেছিলেন; তৃতীয়তঃ, গরিব ও দুস্থ ব্যক্তি যাঁহারা শারীরিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে উপার্জন করিতে

অক্ষম এবং সর্বশেষে সেই সকল উচ্চ বংশীয় পুরুষ, যাঁহারা নির্বোধের মত ব্যবসাবাণিজ্য বা অন্য কর্মে লিপ্ত থাকা তাঁহাদের পদমর্যাদা বা সামাজিক মর্যাদার প্রতিকূল মনে করিতেন।[৯০]

দানের ধারা: মনে হয়, মাদাদ্-মাস্ স্বত্বদান, পুনর্নবীকরণ, বৃদ্ধি, সংকোচন অথবা পুনর্গ্রহণ সম্রাটের ইচ্ছাধীন ছিল।[৯১] কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে, জমিতে বংশানুক্রমিক ভোগস্বত্ব, পর্যায়ক্রমে যথার্থ প্রতিপাদন, অনুমোদন অথবা পুনর্গ্রহণ এই কয়েকটি শর্তে গ্রহীতার বংশধরের উপর বর্তাইত।[৯২] কয়েকটি ফারমানে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে যে, গ্রহীতা ও তাঁহার বংশধরগণকে এই স্বত্ব দান করা হইল।[৯৩] মনে হয় যথার্থ প্রতিপাদন অথবা অনুমোদনের কর্মটি বাৎসরিকের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হইত।[৯৪] এইরূপ স্বত্ব প্রদানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের ধারা ছিল মার্ফি অর্থাৎ ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য সকল প্রকার কর (যাহাদের হুকুক্-ই-দেওয়ানী ও আওয়ারিজাত্-ই-সুলতানী বলা হইত) হইতে রেহাই দেওয়া হইত।[৯৫] সুতরাং সাধারণভাবে মাদাদ্-মাস্ স্বত্ব করমুক্ত থাকিত এবং গ্রহীতা জমিতে উৎপন্ন ফসল অথবা রাজস্ব ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি কৃষককে জমির ইজারা প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু মাদাদ্-মাস্ জমির উপর রাজস্ব নির্ধারণের সম্ভাবনাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা চলে না। বস্তুতঃ মাদ্াদ-মাস্ জমির উপর রাজস্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে, এরূপ তথ্যও পাওয়া যায়। মাদাদ্-মাস্ জমির উপর ধার্য রাজস্বের প্রাচীনতম নজির শাহজাহানের আমলে ১০৫৮ হিঃ ১৬৪৮-৪৯ খ্রীঃ পাওয়া যায়। এলাহাবাদে উত্তর প্রদেশ সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত একটি দলিল হইতে দেখা যায় যে, শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম যুগে বেগম বিরলাস নাম্নী এক মহিলাকে ৯০০ বিঘা জমি প্রদান করা হইয়াছিল। ১০৫৮ হিঃ/১৬৪৮ খ্রীঃ মোট প্রদত্ত জমির মধ্যে, ৪৭৬ বিঘা ১ বিশা হালি জমির উপর পরগনার প্রচলিত হার অনুযায়ী, বিঘা প্রতি আট আনা হারে রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছিল। পরে একটি পরোয়ানা জারি করিয়া ৫৬ টাকা মকুব করা হইয়াছিল। প্রাপ্য রাজস্বের বকেয়া অংশ ১৮৮ টাকা ৬ আনা—১০৬০ হিঃ/১৬৪৯-৫০ খ্রীঃ—মকুব করা হইয়াছিল।

যে সাক্ষ্যের সারাংশ উপরে করা হইল তাহা প্রণিধানযোগ্য কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে মাদাদ্-মাস্ ভূমির অংশবিশেষের উপর রাজস্ব ধার্য করা হইত, আমরা তাহা সঠিক জানি না এবং আংশিক ও পরে সম্পূর্ণ রাজস্ব মকুবের কারণগুলির কোন লিখিত বিবরণ নাই। কিন্তু, প্রাপ্ত সাক্ষ্য হইতে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে—আলোচ্য দলিলে যে পরিস্থিতির কথা উল্লিখিত নাই—করমুক্ত জমির উপর আংশিকভাবে রাজস্ব ধার্য করা হইত এবং অনুকূল অবস্থায় ধার্য রাজস্ব বা তাহার অংশবিশেষ মকুব করা চলিত।

এই রাজত্বকালে অপর একটি দলিলে দেখা যায় যে, ভুস্রা ও হাইবাতপুর গ্রামের আয়েমা ভূমির উপর ২৫ টাকা ও ৫ টাকা হারে রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছিল।[৯৬] অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, অ্যামেথির আয়েমাদারগণকে

প্রচলিত হারে মোট ১০,০১৫ টাকা ভূমি-রাজস্ব[৯৭] বাবদ প্রদান করিতে হইয়াছিল। হায়দারগড়, সত্রখ্, ইব্রাহিমপুর আনবোলা পরগনার আয়েমাদারগণকেও নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে হইত।[৯৮] মনে হয়, সমগ্র পরগনাও মাদাদ্-মাস্ হিসাবে দান করা হইত এবং ঐ জমির উপর ভূমি-রাজস্ব ধার্য করা হইত। আমরা ইহাও অনুমান করি যে, একধরনের মাদাদ্-মাস্ ভূমি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে জমিদারী ভূমির সমগোত্রীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও এই সকল জমি মাদাদ্-মাস্ ও আয়েমা ভূমি হিসাবে গণ্য হওয়ায় অনুমান করা যায়, এইরূপ জমির উপর ধার্য ভূমি-রাজস্বের হার সম্ভবতঃ জমিদারী ভূমি অপেক্ষা হালকা ছিল। বস্তুতঃ, উপরে উদ্ধৃত সাক্ষ্য হইতে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, একটি সমগ্র গ্রামের ভূমি-রাজস্ব ২৫ টাকা ধার্য করা হইয়াছিল, কিন্তু অপর একটি গ্রামের ক্ষেত্রে, একজন দান-গ্রহীতাকে মাত্র ৫ টাকা ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। পুনরায়, সমগ্র অ্যামেথি পরগনার ধার্য রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০,০০০ টাকা। একটি পরগনার ক্ষেত্রে প্রচলিত রাজস্ব-হার কখনই এই পরিমাণ হইত বলিয়া মনে হয় না।

সর্বশেষে লক্ষণীয়, মাদাদ্-মাস্ স্বত্বভোগিগণ—জমিদারগণের মত জমি বিক্রয় বা উপকার হিসাবে জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার ভোগ করিতেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ও তৎপরবর্তী যুগ সংক্রান্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এই অনুমান করা হইতেছে। সুতরাং, আমরা স্থির নিশ্চয়তার সহিত জোর করিয়া একথা বলিতে পারি না যে, আকবর ও তাঁহার পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারীর যুগেও মাদাদ্-মাস্ স্বত্বভোগিগণ জমি বিক্রয় ও হস্তান্তরের অধিকার ভোগ করিতেন। অতএব, প্রকৃতপক্ষে মাদাদ্-মাস্ স্বত্বভোগীরা দান বাবদ জমির মালিকানা ভোগ করিতেন এবং জমির স্বত্ব ও স্বার্থের দিক হইতে তাঁহারা ক্ষুদ্র জমিদারের সমগোত্রীয় ছিলেন। তবে, অধিকাংশ মাদাদ্-মাস্ স্বত্বভোগী সর্বপ্রকার কর ভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অদ্বিতীয় আর্থিক সুবিধা ভোগ করিতেন। মনে হয়, এক বৃহৎসংখ্যক গ্রহীতাকে জমিদারশ্রেণীর মত ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে হইত; কিন্তু, খুব সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করা হইত এবং তাঁহাদের জমির উপর স্বল্প হারে রাজস্ব ধার্য করা হইত।

মাদাদ্-মাস্ হিসাবে প্রদত্ত জমির শ্রেণী বিন্যাস—জায়গীর এলাকার[৯৯] বা খালিসা মহালের[১০০] অন্তর্ভুক্ত জমি, অথবা জমি বহিভূর্ত[১০১] পতিত জমি হইতেও মাদাদ্-মাস্ স্বত্বে জমি বিলি করা চলিত। আবার খালিসা ও জায়গীর মহাল হইতে পৃথক করিয়া জমি জরিপের কর্মে যাহাতে কোনরূপ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়[১০২] তাহার জন্য সমগ্র মাদাদ্-মাস্ জমি একটি স্বতন্ত্র খাতে নির্দিষ্ট থাকিত। খালিসা ও জায়গীর মহাল হইতে মাদাদ্-মাস্ জমির পৃথকীকরণ পরিকল্পনা আকবর[১০৩] সর্বপ্রথম রচনা করিয়াছিলেন। খালিসা ও জায়গীর ভূমি হইতে মাদাদ্-মাস্ স্বত্বে জমি প্রদানের নজির স্বল্প। মাত্র কয়েকটি দলিলে খালিসা ভূমি হইতে মাদাদ্-মাস্ স্বত্বে জমি প্রদানের কথা—বিশেষ করিয়া আকবরের আমলে [১০৪]—উল্লিখিত আছে। জমা-বহিভূর্ত এবং পতিত জমি হইতে মাদাদ্-

মাস্ জমি বিতরণের পদ্ধতি ক্রমশঃ প্রচলিত হয় এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে এই পদ্ধতি একটি সুপ্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা [১০৫] হিসাবে গড়িয়া উঠে। আকবরের আমলে মাদাদ্-মাস্ রূপে বিতরণ করা কৃষি নিয়োজিত ও কর্ষণযোগ্য জমির আনুপাতিক হার ছিল ১ঃ১। মনে হয়, আইন গ্রন্থে যে অনুপাতের উল্লেখ আছে, তাহা কঠোর বিধি হিসাবে পালিত না হইয়া নিছক একটি মাপকাঠি হিসাবেই গণ্য হইত ; বাস্তব ক্ষেত্রে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী এই অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইত।[১০৭] একটি মাত্র ফারমানে নির্দিষ্ট মাদাদ্-মাস্ জমির পরিমাপ ১৫ বিঘা হইতে ৪০০০ বিঘার ঊর্ধ্বে ও হইতে পারিত।[১০৮] সাধারণতঃ বৃহৎ মাদাদ্-মাস্ ভূমি-স্বত্বের পরিমাপ ৫০০ হইতে ১০০০ বিঘা পর্যন্ত নির্ধারিত হইত। এরূপ সিদ্ধান্ত করা—যাহা কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি করিয়াছেন —উচিত হইবে না যে, বিলি স্বত্বের সীমানা এক সহস্র বিঘার মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল। বস্তুতঃ একটি মাত্র ফারমানে নির্দিষ্ট দামের পরিমাণ ৪০০০ বিঘার অধিক উল্লিখিত আছে এরূপ নজিরও পাওয়া যায়।[১০৯]

দানের প্রণালী—উত্তর প্রদেশ সরকারী মহাফেজখানায় (এলাহাবাদ) রক্ষিত কয়েকটি দলিল[১১০] এবং ফারহঙ্গ-ই-কারদানি গ্রন্থ[১১১] হইতে মাদাদ্-মাস্ স্বত্বে জমি দানের প্রণালী সম্পর্কে সর্বাধিক তথ্য পাওয়া যায়। মনে হয়, এই প্রণালীর প্রথম ধাপ ছিল ফার্দ-ই-হাকিকত্-[১১২] নামে একটি রিপোর্টে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ উপযুক্ত প্রার্থীর বিবরণ উল্লেখ করিয়া তাহা রাজ পরিষদে পেশ করা। রিপোর্ট রাজপরিষদে পৌঁছাইবার পর সিয়াহায়[১১৩] ইহার বিবরণ যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হইত এবং তৎপরে ইহা সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত। রিপোর্টের সুপারিশ সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি মাদাদ্-মাস্ ভূমি প্রদানের জন্য মৌখিক আদেশ জারি করিতেন। দানের বিশদ বিবরণ এবং সদর ও ওয়াকিয়া নিগর-এর নাম ইয়াদ্দাস্ত-ই-ওয়াকিয়াহ্ দলিলে লিপিবদ্ধ করা হইত। এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলে, ইয়াদ্দাস্ত দলিলটি সম্রাটের নিকট পুনরায় উপস্থাপন করিবার জন্য সদর আদেশ জারি করিতেন। এই পদ্ধতিকে আরহ্-ই-মুকারার্ বলা হইত। এই সকল প্রচলিত কর্মপ্রণালী পালিত হইলে, সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত মাদাদ্ ভূমি প্রদানের জন্য সদর ফারমান প্রস্তুত করিবার আদেশ জারি করিতেন। মাদাদ্-মাস্ হিসাবে প্রদত্ত জমির পরিমাপ, গ্রহীতার নাম এবং সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারীগণের প্রতি, ফারমানের বিষয়বস্তু অনুধাবন করিয়া, ইহাতে নির্দিষ্ট ভূমি গ্রহীতার হস্তে অর্পণ করিবার আদেশ ফারমানে লিপিবদ্ধ থাকিত। যে সকল কর্মপ্রণালী রাজপরিষদে পালিত হইল এবং মাদাদ্-মাস[১১৪] হিসাবে যে জমি প্রদত্ত হইল, তাহার পরিমাপ ফারমানের পশ্চাৎভাগে লিপিবদ্ধ থাকিত। এই দলিল হিম্ নামে পরিচিত ছিল। ফারমানের বিবরণ পুনরাবৃত্তি করিয়া সদরের দপ্তর হইতে তাঁহার সীলাঙ্কিত একটি পরোয়ানা জারি করা হইত। পরোয়ানায় ফারমানের বিবরণসহ যে তারিখে উহা জারি করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ এবং রাজাদেশ পালনের জন্য গোমস্তা[১১৫] ও করোরীগণের প্রতি আদেশ থাকিত।

সনাক্তকরণ, অনুমোদন ও পুনর্নবীকরণঃ মাদাদ্-মাস্ হিসাবে জমির স্বত্ব দান, সদর্ দপ্তরের পর্যায়ক্রমে সনাক্তকরণ ও অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। স্থানীয় সদর্ দপ্তরে আসিয়া বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাহায্যে দানগ্রহীতাগণকে তাঁহাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইত। গ্রহীতা যে জীবিত ও প্রদত্ত জমি যে তাঁহার অধিকারে রহিয়াছে ও ব্যবহৃত হইতেছে, সাক্ষীগণকে তাহা অনুমোদন করিতে হইত। এ বিষয়ে সদর্ সংশয়মুক্ত হইলে একটি নূতন সনদ[১১৬] গ্রহীতাকে প্রদান করা হইত। নূতন সনদে প্রদত্ত জমির মালিকানা স্বত্ব ও তাহা ব্যবহারের ক্ষমতা অনুমোদন করিয়া গ্রহীতাদিগকে[১১৭] দেওয়া হইত। এই প্রশাসনিক পদ্ধতি তাশিহা[১১৮] নামে পরিচিত ছিল। গ্রহীতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে দানপত্রের পুনর্নবীকরণ ও অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে হইত। প্রদত্ত জমিতে তাঁহাদের দাবি সাব্যস্ত করিবার জন্য সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হইত এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সত্যতার উপর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দিতে হইত।

১। আবেদনকারিগণ জীবিত এবং মৃত ব্যক্তিকে প্রদত্ত জমি, তাঁহাদের অধিকারে ও ব্যবহারে নিয়োজিত।

২। তাঁহাদের জীবিকা অর্জনের বিকল্প কোন উপায় নাই।

৩। পূর্বতন সদর্গণের দ্বারা সনাক্ত ও অনুমোদিত দলিলপত্রাদি তাঁহাদের হস্তে রহিয়াছে।

এই বিষয়গুলির উপর সদর্ সন্তুষ্ট হইলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের সপক্ষে তিনি বিলি ব্যবস্থার অনুমোদন ও পুনর্নবীকরণের জন্য সুপারিশ করিতেন। এইভাবে একটি হাসাব-উল্-হুকুম[১১৯] মারফত বিলি ব্যবস্থার অনুমোদন ও পুনর্নবীকরণ হইত।

সদর্-এর-দপ্তরঃ মাদাদ্-মাস্ ভূমির প্রশাসনিক দায়িত্ব সদর্ অথবা সদর্-উস্-সুদুর-এর অধীনে একটি স্বতন্ত্র দপ্তরের হস্তে ছিল। মনে হয় আকবরের আমলে এই দপ্তর ব্যাপকভাবে না থাকিলেও যথেষ্ঠ সুগঠিত ছিল এবং তিনজন দায়িত্বশীল রাজকর্মচারী (যথা একজন বিতিক্চি বা সুযোগ্য সচিব, যিনি পরিচিত ছিলেন দেওয়ান-ই-সদত নামে বা কাজী ও মীর আদ্ল বলে) এর তদারকি করিতেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট যোগ্যতার বিচারে সদর্ মনোনীত হইতেন। যাহাতে জাতি ও ধর্মের কোনরূপ প্রভেদ করা না হয়, তাহার জন্য স্বচ্ছ চিন্তা ও উদার মনোভাব পোষণ করিবার যোগ্যতা তাঁহার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। দয়ালু ও কর্মঠ স্বভাব সদর্ পদের অন্য দুইটি অপরিহার্য যোগ্যতা বলিয়া গণ্য হইত।[১২০]

সদর্-এর ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ সদর্-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজন হইলে যাহাতে তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য আর্থিক সাহায্য করা যায়, তাহার জন্য তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। উপরন্তু, কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে[১২১] তাঁহার দপ্তর সংগঠন ও প্রচলন করিবার দায়িত্বও তাঁহার উপর থাকিত। মাদাদ্-মাস্ ভূমির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে সম্রাট তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন এবং এই ঘটনা

ফারমানের [১২২] পৃষ্ঠদেশে উল্লিখিত থাকিত। মাদাদ্-মাস্ ভূমি দান সংক্রান্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে তাঁহার সীলমোহর থাকিত। মনে হয়, তাঁহার সুপারিশ ও সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়া কাজী, প্রাদেশিক সদর্ ও মুফ্‌তিগণ নিজ নিজ পদে নিয়োজিত হইতেন।[১২৩] দপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ, মাদাদ্-মাস্ ভূমির বিলিব্যবস্থা এবং প্রদত্ত জমির পুনর্নবীকরণ ও অনুমোদন সমর্থন করিয়া সদর্ একটি পরোয়ানা জারি করিতেন।[১২৪]

পদমর্যাদা ঃ মনে হয়, আকবরের রাজত্বের প্রথম যুগে নিযুক্ত সদর্‌গণ গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা এবং মাদাদ্-মাস্ ভূমি বণ্টনের ব্যাপারে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ভোগ করিতেন। কিন্তু, এই দপ্তরের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চলিতে থাকায়, সদর্-এর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে আকবরের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে দপ্তরের প্রশাসনিক কর্ম তদারক করিতে আরম্ভ করেন, ফলে সদর্-এর ক্ষমতা বহুলাংশে লুপ্ত হয়। স্থির হয়, যে ক্ষেত্রে দানের পরিমাণ পাঁচশত বিঘার অধিক হইবে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্রাটের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং সম্রাট অনুমোদন না করিলে এই সকল ক্ষেত্রে বিলি-স্বত্ব স্থগিত থাকিবে। পরে, অপর একটি কানুন এই মর্মে জারি করা হয় যে একশত বিঘার অধিক যে সকল বিলি-স্বত্ব দানের নির্দেশ ফারমানে নাই, সেই সকল দানের ক্ষেত্রে জমির আদি পরিমাণের দুই পঞ্চমাংশে হ্রাস করিয়া, বাকি তিন-পঞ্চমাংশ খালিসা ভূমি হিসাবে পুনগ্রহণ করা হইবে। একাধিক ব্যক্তিকে যুগ্ম-ভাবে বিলি-স্বত্ব দান করা হইলে, গ্রহীতাগণের কোন একজনের মৃত্যু হইলে, মোট প্রদত্ত জমি যাহাতে আনুপাতিক হারে বণ্টিত হইতে পারে, তাহার জন্য সদর্‌কে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। যে পর্যন্ত না মৃত গ্রহীতার উত্তরাধিকারিগণকে সম্রাটের দরবারে হাজির করা যায়, সেই পর্যন্ত তাঁহার অংশের জমি খালিসা হিসাবে পুনর্গ্রহণ করা হইত। সম্রাটের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকেই ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমি বিলি করিবার ক্ষমতা সদর্ ভোগ করিতেন। পুরাতন বিলি-স্বত্বের [১২৫] সনাক্ত-করণ, অনুমোদন ও পুনর্নবীকরণের ক্ষমতাও সদর্-এর ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম যুগে সদর্-এর কয়েকটি সাবেকী ক্ষমতা ও অধিকার, তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বল্প মেয়াদের জন্য তিনি এই ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন। রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরের পরে সদর্-এর নিজ দায়িত্বে জমি বিলি করিবার ক্ষমতা সম্রাট কাড়িয়া লইয়াছিলেন।[১২৬] শাহজাহানের আমলে আইনত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই বটে, কিন্তু মুসওয়াই খান সদর্, নিজ-ক্ষমতার সীমানা লঙ্ঘন করিতেছিলেন। সম্রাটের বিনা অনুমতিতে, তিনি অনুপ-যুক্ত ব্যক্তিগণকে মাদাদ্-মাস্ ভূমি ও ওয়াজিফাহ্ বিলি করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল। শাহজাহান এই ঘটনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া দপ্তর হইতে সদর্‌কে অপসারিত করেন।[১২৭]

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও সদর্-উস্-সুদুর্-এর দপ্তর প্রচলিত ছিল। মনে হয়, তাঁহার সুপারিশ ক্রমে দপ্তরে কর্মচারী নিয়োগ করা হইত এবং নিয়োগপত্রে তাঁহার সীলমোহরের ছাপ থাকিত।[১২৮] মুন্তাখাব-উল্-লুবাব গ্রন্থের একটি অংশে

লিখিত আছে যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের গৌরবময় যুগে, মীর জুমলা—যিনি সদর্-ই-কুল দপ্তরের প্রধান ছিলেন—তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার অনেকাংশে খোয়াইয়াছিলেন। ধর্মীয় নিয়মাবলী সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপরেও রতনচাঁদের চরম প্রভাব ছিল। কাজী এবং আইন ও বিচার দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারিগণও রতনচাঁদ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন।[১২৯]

প্রাদেশিক সদর্ঃ আকবর সদর্-উস্-সুদুরের ক্ষমতা খর্ব করিয়া, দপ্তরে যে চরম দুর্নীতি চলিতেছিল, তাহা বন্ধ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক ও পরগনা স্তরে এই দপ্তর সুগঠিত করিবার জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। খালিসা ও জায়গীর ভূমি হইতে মাদাদ্-মাস্ ভূমিসমূহ পৃথক করা হইয়াছিল এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সদর্ ও পরগনা কাজীগণ সরাসরি ইহাদের তদারকি করিতেন। মনে হয়, কিছুদিনের জন্য সদর্-উস্-সুদুর এর দপ্তরটি লুপ্ত হয় এবং মাদাদ্-মাস্ ভূমি সমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক সদর্গণের[১৩০] হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু, পরবর্তীকালে সদর্-উস্-সুদুর এর দপ্তর পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ ধরিয়া প্রাদেশিক সদর্-এর পদ অব্যাহত থাকিয়া যায়। জ্যেষ্ঠ মোঘলগণের আমলে প্রাদেশিক সদর্-এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিরূপ ছিল, সেই সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাদেশিক সদর্ পদটির সহিত কিরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব যুক্ত ছিল, মিরাট-ই-আহ্মদি[১৩১] গ্রন্থে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। সদর্-উস্-সুদুর-এর সীলমোহর অঙ্কিত একটি সনদ মারফত প্রাদেশিক সদর্ নিয়োজিত হইতেন। একটি জাঠ ও একটি সওয়ারের পদমর্যাদা তিনি ভোগ করিতেন। এই দপ্তরের সহিত শর্ত সাপেক্ষ ৫০ জাঠ ও ১০ সওয়ারের পদমর্যাদা যুক্ত ছিল। কাজী, মুহ্তাসির,[১৩২] ইমাম্,[১৩৩] কবরস্থানের মুতাওয়ালি[১৩৪] এবং মোয়াজ্জিনগণ[১৩৫] তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের নিয়োগপত্র প্রাদেশিক সদর্-এর দপ্তর হইতে জারি করা হইত। মাদাদ্-মাস্, ওয়াজিফাহ্ ও রোজিনাহ্ সংক্রান্ত সনদগুলি সনাক্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট পেশ করা হইত। মাদাদ্-মাস্ ভূমির পুনর্গ্রহণ সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদির উপর তাঁহার সীলমোহর ও স্বাক্ষর থাকিত।

মুতাওয়ালি—পরগনাস্তরে মুতাওয়ালি[১৩৬] মাদাদ্-মাস্ ভূমি সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মাদাদ্-মাস্ ভূমির তত্ত্বাবধান কর্মের সহিত মুতাওয়ালি ঘনিষ্ঠতর ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস গ্রন্থের একটি দলিল হইতে জানা যায় যে, রাজাদেশবলে একজন পরগনা মুতাওয়ালি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি সদরের অধীনে কর্ম করিতেন। যে সকল ব্যক্তি মাদাদ্-মাস্ ভূমি-স্বত্ব ভোগ অথবা নগদ ভাতা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া মুতাওয়ালিকে নিয়মিত রিপোর্ট সদর্-এর দপ্তরে পেশ করিতে হইত। মাদাদ্-মাস্ ভূমি স্বত্ব বিলি অথবা নগদ ভাতা[১৩৭] সংক্রান্ত কাগজপত্রে তিনি নিজস্ব সীলমোহরের ছাপ লাগাইতেন।

মোঘল যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় সিয়ারঘল্ অথবা মাদাদ্-মাস্ ভূমি বিলি প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ভ্রমাত্মক বদান্যতা হইতে উদ্ভূত এই প্রতিষ্ঠান এমন এক শ্রেণীর পরান্নভোজী সৃষ্টি করে, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অবদান ছিল না ; উপরন্তু তাঁহারা সরকারী কোষাগার হইতে নিয়মিত অর্থ শোষণ করিয়া লইতেন। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এই সংস্থার কার্যাবলী অনুধাবন করিলে উপরোক্ত ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে এবং দেশের ভূমি-ব্যবস্থার চৌহদ্দির ভিতর এই সংস্থার প্রকৃতি ও কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা হইবে। বস্তুতঃ, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং মোঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

সাধারণভাবে মোঘল সম্রাটগণ এত বেশী বৈষয়িক ছিলেন যে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সাধনে বিন্দুমাত্র সহায়ক নয় এরূপ একটি পরগাছা শ্রেণীর ভরণ পোষণ বাবদ জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় করিবার মত মনোভাব তাঁহাদের ছিল না। ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের যে কোন ছাত্র এই কথা স্বীকার করিবেন যে, তদানীন্তন কালের রাজনৈতিক ও ভূমি-ব্যবস্থার পরিবেশে সমগ্র হিন্দুস্থানের বিশাল সাম্রাজ্যে রাজাদেশ কার্যকর করা দুষ্কর ছিল। ধুরন্ধর জমিদারবর্গ—যাঁহাদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু এবং দেশের রাজনৈতিক ও কৃষি-ভিত্তিক জীবন যাঁহাদের কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইত—সফলতা লাভের সুযোগ পাইলে রাজাদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগে যদি শ্রেণী-সংঘাতের নিদর্শন খুঁজিতে হয়, তবে তাহা খুঁজিতে হইবে তদানীন্তন কালের রাষ্ট্রশক্তি অথবা ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের (অথবা তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ যাঁহাদের ভারত-পারসী ঐতিহাসিকগণ জমিদার বলিয়া অভিহিত করিতেন) পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। এই সংঘাত চলিত অবিরত, কখনও বা গোপনে আবার কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে। এই অবিরাম সংঘাতে জমিদারগণ সাময়িকভাবে বশীভূত হইলেও রাজশক্তির নিকট কখনই নতি স্বীকার করিয়া লইতেন না। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতি জমিদারগণের এইরূপ বৈরী মনোভাব থাকায় প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি হইতে দূরে অবস্থিত সাম্রাজ্যের এক ব্যাপক অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা যথেষ্ট অসুবিধাজনক ছিল। যখন যে সকল অঞ্চলে জমিদারগণ রাজস্ব আদায়কারী রাজ-কর্মচারিগণের সহিত সহযোগিতা প্রত্যাহার করিয়া লইতেন, সেই সময় বা সেই সকল অঞ্চল হইতে রাজস্ব সংগ্রহ অধিকতর দুরূহ হইয়া উঠিত। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগিদে, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এরূপ কিছু কিছু স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে লইয়া কিছু অঞ্চল সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই উদ্দেশ্য সফলের একমাত্র পথ ছিল বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মুসলিম ব্যক্তিগণকে দেশের অভ্যন্তরে বসবাস করিতে প্রবৃত্ত করিয়া তাঁহাদের নিশ্চিত জীবিকা অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক করমুক্ত জমি বিলির ব্যবস্থা করা। সর্বপ্রকার করমুক্ত মাদাদ্-মাস্

ভূমি বিলির প্রথা সেই শ্রেণীর মুসলমান পরিবারকে প্রচণ্ড উৎসাহিত করিয়াছিল, যাঁহারা পেশাগত ভাবে সৈনিকের কর্ম অপছন্দ করিতেন, অথচ বংশানুক্রমিক সম্মান ও ধারার পরিপন্থী বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্য ঘৃণা করিতেন। এই কারণে প্রায় প্রতিটি পরগনার একাধিক গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান পরিবার অধ্যুষিত অঞ্চল সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত মোঘল সরকার গ্রহণ করিলেন। এই কর্মের জন্য যাঁহাদের নির্বাচন করা হইয়াছিল, সাধারণভাবে তাঁহারা ছিলেন শেখ ও সৈয়দ বংশীয়[১৩৮]। তাঁহারা শুধুমাত্র ধার্মিক ও পণ্ডিত ছিলেন না, উপরন্তু, যথেষ্ট বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরের দূর-দূরান্তের গ্রামগুলিতে তাঁহারা বসতি স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ আদি মাদাদ্-মাস্ দান-গ্রহীতারা, তাঁহাদের সহানুভূতিশীল ও উদার মনোভাবের জন্য 'সিয়া' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই উপাধি দ্বারা উপরোক্ত ব্যক্তিগণের সদ্গুণ, দয়ালু মনোভাব এবং নম্রতার প্রতি জনগণ তাঁহাদের শ্রদ্ধা জানাইতেন। মাদাদ্-মাস্ গ্রহীতাদিগের প্রতি জনসাধারণের এই মনোভাব হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা হিন্দু জনগণের বিশ্বাস অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ অন্যায় দাবি ও অন্যান্য উৎপীড়ন হইতে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেন। স্থানীয় অধিবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকার রক্ষা করিতে সক্ষম হইলে তাঁহারা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদিগের বিশ্বাস অর্জন করিতেও সক্ষম হইতেন। অপরপক্ষে, স্থানীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁহারা সরকারী কর্মচারীদিগকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেন এবং আকস্মিক প্রয়োজনে, স্থানীয় বিক্ষোভ দমন কার্যে, রাষ্ট্রীয় সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করিতে পারিতেন। অর্থনৈতিক দিক হইতে, এই পদ্ধতি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী এমন একটি বিরাট সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল, যে শ্রেণী জীবিকার জন্য সম্পূর্ণরূপে জমি-নির্ভর, তাঁহাদের জমিদার না বলা হইলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে জমিতে জমিদারের যেরূপ স্বার্থ ও স্বত্ব ছিল, ইঁহাদেরও তাহাই ছিল। তাঁহারা এক অসাধারণ আর্থিক সুবিধা ভোগ করিতেন কারণ তাঁহাদের জমি সকল প্রকার কর হইতে মুক্ত ছিল।

কিন্তু, সাধারণতঃ দানের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায়—১০০ হইতে ১০০০ বিঘায় ইহার সীমানা নির্দিষ্ট থাকিত—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জমিদার অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থা উন্নততর ছিল না। এইভাবে, মাদাদ্-মাস্ প্রথায় ভূমিদানের ফলে এক শ্রেণীর গ্রামীণ মুসলমান জমিদার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরবর্তী যুগে ইঁহারা যখন প্রকৃত জমিদারী স্বত্ব[১৩৯] আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তখন অন্যান্য বংশানুক্রমিক জমিদার অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে যাঁহারা জমিদারী স্বত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় ইঁহারাও প্রচলিত হারে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে থাকিলেন। কিন্তু ইহার মানে এই নয় যে, পরবর্তী মোঘল আমলের সকল মুসলমান জমিদারই নিয়মিতভাবে দান গ্রহীতা অথবা আদি দান গ্রহীতাগণের উত্তরাধিকারী হিসাবে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ক্রয়ের

মাধ্যমে অথবা ইজারা প্রাপ্ত ভূমি জমিদারীতে রূপান্তরিত করিয়া মুসলমানগণ জমিদারীস্বত্ব অর্জন করিয়া ছিলেন। কিন্তু, ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে প্রতিটি ব্যাপারে মাদাদ্-মাস্ স্বত্বে প্রদত্ত জমি অবাধে জমিদারী স্বত্বে অর্জিত জমি হিসাবে গণ্য হইত এবং ক্রয়ের মাধ্যমে যে জমিদার জমির স্বত্ব অর্জন করিতেন তাঁহার সহিত গ্রহীতার উত্তরাধিকারী হিসাবে বংশানুক্রমিক স্বত্বভোগী জমির মালিকের কোন পার্থক্য করা যাইত না।

সামাজিকভাবে এই প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থানের গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় উদারতার ভাব সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যে সকল মুসলমান পরিবার গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রাদেশিক অথবা জেলা সদরের নগর-সভ্যতার সহিত তাঁহাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকায় মুসলিম নগরসভ্যতার বাণী তাঁহারা দূরান্তরের গ্রামাঞ্চলে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। এক নূতন অপরিচিত পরিবেশে তাঁহারা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু, দীর্ঘদিনের এক বিশেষ শিক্ষা-সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পালিত হওয়ায় এবং প্রাদেশিক সদর বা রাজধানীর সহিত সাংস্কৃতিক সূত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায়, স্থানীয় সংস্কৃতি তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে, নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতির মূল সীমানার মধ্যেই তাঁহারা বিচরণ করিতেন। তা সত্ত্বেও স্থানীয় রীতিনীতির যথেষ্ট সংমিশ্রণ ইঁহাদের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। কালক্রমে, স্থানীয় উৎসবাদিতে তাঁহারা যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, যোগদানের কারণ ইহা নহে যে, তাঁহারা ঐ সকল উৎসবাদির মূল দর্শনের সহিত একমত হইয়াছিলেন। প্রচলিত সামাজিক প্রথা হিসাবে এই সকল উৎসবে যোগদান করিয়া, বিধর্মী হইলেও গ্রামীণ জীবনের সার্বজনীন সমস্যাগুলি জানিবার জন্য গ্রামবাসীদের সহিত—যাহাদের সহিত আজীবন একযোগে মোকাবিলা করিতে হইবে—যুগ্মভাবে উৎসবের আনন্দ ভোগ করিতেন। একইভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন হইতে গ্রামের সরল স্বভাব হিন্দু অধিবাসিগণ মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিতে পারিতেন। ক্রমশঃ মুসলিম সম্পর্কে পূর্ব-পুরুষগণের—যাঁহারা মুসলিম বলিতে তুর্কী, ম্লেচ্ছ, অত্যাচারী ও অপবিত্র মনে করিতেন, নিকট হইতে আহৃত সেই ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে মুসলিমগণকে অধার্মিক বলা চলে না। মুসলিমদের সহিত ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় বহু অবজ্ঞাত তুর্কীর প্রতি হিন্দুদের উদার মনোভাব গড়িয়া উঠিল। ঘৃণিত ও অপ্রীতিকর সম্বোধন "তুর্কী"র পরিবর্তে প্রীতি ও শ্রদ্ধার প্রতীক "মিয়া"—যাহার দ্বারা অত্যন্ত নিরীহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বোঝান হয়—শব্দটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

গ্রামীণ জনসাধারণের এই দুই অংশ পরস্পরের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং একের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি অপরের জীবনে কতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা দুষ্কর। যে সকল গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সম্মিলিতভাবে বসবাস করে, অথবা যে সকল অঞ্চলে মাত্র কয়েকটি গ্রামে মুসলমান অধিবাসীর ঘন সমাবেশ দেখা যায়, সেই সকল

গ্রাম সম্পর্কে যাঁহার সম্যক পরিচয় আছে, তিনি বর্তমান লেখকের সহিত এ বিষয় একমত হইবেন যে, গ্রামাঞ্চলে মুসলমান পরিবারের বসতি ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই ধর্মীয় মনোভাব সম্পর্কে এক সুদৃঢ় উদারতা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভারতীয় গ্রামের সীমিত অথচ ঘনিষ্ঠ পরিবেশে গ্রামবাসীর উভয় অংশকে যে সকল সাধারণ সমস্যা ও চাহিদার সম্মুখীন হইতে হইত, তাহার তাগিদেই এই উদারতার সৃষ্টি হইয়াছিল। আজীবনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ—যাহা বংশপরম্পরায় রক্ষা করা হইত—গ্রামবাসীর এই দুই অংশের মধ্যে ঐক্য বা মিলন স্থাপন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহা দুর্বল করিয়া দেয়। ধর্মীয় উদারতার প্রভাব এতই গভীরে পৌঁছিয়াছিল যে একজন গ্রামবাসী, হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন ধর্মীয় উদারতায় শুধু বিশ্বাসী ছিলেন না, পরন্তু ব্যক্তিজীবনে তাহা অনুসরণ করিতেন এবং অপরের ধর্মীয় মনোভাবে আঘাত করিতে পারে, এরূপ কোন কর্ম হইতে বিরত থাকিতেই পছন্দ করিতেন। এইরূপে যদিও কর মুক্ত জমি বিলি প্রথা লুপ্ত হইয়াছে এবং গ্রহীতাদিগের উত্তরাধিকারিগণের অনেকেই তাঁহাদের পৈতৃক ভূমি ত্যাগ বরিয়া ভিন্ন দেশে চলিয়া গিয়াছেন, তবুও মাদাদ্-মাস্ জমি বিলির প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় উদারতার যে মনোভাব গ্রাম ভারতে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য বর্তমান যুগেও সযত্নে পালিত হয়।

পাদটীকা

১. মনসবদার: মনসব স্বত্ব অথবা সম্রাটের অধীনে কর্মরত উচ্চপদের অধিকারী ব্যক্তি, নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহীর ভরণ পোষণ এইরূপ পদস্থ কর্মচারীর পক্ষে আবশ্যিক ছিল।

২. সিয়াক-নামা, পৃঃ ৩৭-৩৯।

৩. এলাহাবাদ ডকুমেন্ট, ৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৬২নং।

৪. মিরাট-উল-ইস্তিলাহ, পৃঃ ১৫ক।

৫. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ১৪০।

৬. ওয়াক-ই-আজমীর, পৃঃ ৬৫।

৭. আকবর নামা, II, ৩৩৩ মাসির-উল-উমারা গ্রন্থে উল্লিখিত সাক্ষ্য হইতে এই অনুমান মোটের উপর সমর্থন লাভ করে। মাসির গ্রন্থের একটি অংশে মোঘল সাম্রাজ্যের আর্থিক ইতিহাস বর্ণিত আছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আকবরের আমলে সাম্রাজ্যের দ্রুত প্রসারের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি হইলেও তাহার সহিত আয়েরও দ্রুত বৃদ্ধি হয় এবং প্রচুর সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। মাসির-উল-উমারা, II, পৃঃ ৮১৪।

৮. মাসির-উল-উমর, II, পৃঃ ১৪৮; বাদশাহ্‌নামা গ্রন্থের একটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে, খালিসা ভূমির জমা বৃদ্ধি পাইয়া ৮০ কোটি দাম বা ২ কোটি মুদ্রায় পৌছিয়াছিল। এই যুগে খালিসা ভূমি সাম্রাজ্যের ১/১১শ অংশ জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল।

৯. বাদশাহ্-নামা, II, পৃঃ ৭১১, ৭১২ ; মাসির-উল-উমর, II, পৃঃ ৮১৫।

১০. মাসির-উল-উমর, II, পৃঃ ৮১৪, ৮১৫।

১১. একই গ্রন্থে, II, পৃঃ ৮১৩।

১২. প্রতিটি রাজত্বকালে অনির্দেশিত বৎসরগুলির জমা-অঙ্ক জাওয়া-বিত্-ই-আলমগিরি (পৃঃ ৮১ ক, খ) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

শাহজাহান	(ক)	১, ৩৪, ৪৬, ৭০. ২৪৫ দাম
	(খ)	১, ২৫, ৩৬, ৬০, ৬৪৭ দাম।
আওরঙ্গজেব	(ক)	১, ৩১, ৩৫, ৬১, ৩৬৫ দাম
	(খ)	১, ২৪, ৫৪, ৬৪, ৬৫০ দাম।

১৩. আওয়াল-উল-কাওয়াকিন্, পৃঃ ১৮২, শাহ-নামা-ই-মুনায়ার-উল-কলম্ পৃঃ ৮৬ ক।

১৪. মুন্তখাব-উল-লুবাব, II, পৃঃ ৪১৩, ৪১৪।

১৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য পঞ্চম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা দ্রষ্টব্য।

১৬. জমি ও কৃষি কর্মের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া বার্নিয়ার বলিয়াছেন, "মজুরের অভাবে যে সব জমি উর্বর, সেইখানেও কৃষি কর্ম হয় না।"
বার্নিয়ার, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫ (দ্রষ্টব্য : অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম, মোরল্যাণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ১২)

১৭. হাল-ই-হাসিল : রাজস্ব সংগ্রহ বলিয়াও অনুদিত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য : দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোঘল ইণ্ডিয়া, ইর্ফান্, পৃঃ ২৬৪)। বর্তমান লেখক এই ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে অপারগ। তবে, উপরে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল, সেটা একটি মোটামুটি ব্যাখ্যা।

১৮. উপরের সংক্ষিপ্তসার আকবর নামা এবং আইন গ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : আকবর নামা, II, পৃঃ ২০৭ ; আকবর নামা, III, পৃঃ ১৪৪-১১৭, ২৮২ ; আইন, II, পৃঃ ২।

১৯. 'অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম' পৃঃ ৯৭, ৯৮।

২০. আইন-ই-আকবরি, II, পৃঃ ৪৮।

২১. বাদশাহ্-নামা, II, পৃঃ ৭১১।

২২. তুজুক্-ই-জাহাঙ্গিরি, পৃঃ ৪, ৫। তুজুক্ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী, ১০ : ৩০ ও ১০ : ৪০ অনুপাতে মন্সব্ সংখ্যার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। মন্সবের সর্বনিম্ন বৃদ্ধির পরিমাণ ঘটিয়াছিল তদানীন্তন পরিমাণের অর্ধাংশ।

২৩. বাদশাহ্-নামা, II, পৃঃ ৫৬৬, ৫০৭ ; মিরাট I, পৃঃ ২২৭-২২৮ ; ইহার সহিত দ্রষ্টব্য : র‍্যাঙ্ক (মন্সব্) ইন দি মোঘল স্টেট সার্ভিস, ডবলু. এইচ্. মোরল্যাণ্ড. জার্নাল অব দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৬ ; দি মন্সব্দারী সিস্টেম, আবদুল আজিজ।

২৪. 'পেলসারেট' পৃঃ ৫৪।

২৫. এই ব্যাখ্যা শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রশাসন সংক্রান্ত পুথি পত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। নিম্নে মূল দলিলগুলির উল্লেখ করা হইল। সিলেক্টেড্ ডকুমেন্ট্স্, পৃঃ ৬৪, ২৪৮ ; রুকাত্-ই-আলমগী, পৃঃ ১০, ৮৮, ১০৭, ১১৮, ১২১, ২, ১৩০-১৩১, ১৩৫, ১৬৩-৬৪ ; বাদশাহ নামা, II, পৃঃ ৫০৬ ; মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ২২৭-২২৯।

২৬. পরিশিষ্ট ও দ্রষ্টব্য।

২৭. খুলাসাত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌, পৃঃ ৪৮খ।

২৮. মিরাট-উল্‌-ইস্তিলাহ্‌ গ্রন্থের লেখক জায়গীর ও তিয়ুল এর মধ্যে পার্থক্য টানিয়াছেন, কারণ অভিজাতশ্রেণী ও মনসবদারগণকে জায়গীর বিলি করা হইত এবং তিয়ুল প্রদান করা হইত রাজকুমার ও রাজ পুরুষগণকে। (দ্রষ্টব্য ঃ মিরাট-উল-ইস্তিলাহ্‌, পৃঃ ১৫ক)। তবে এই স্থলে স্মরণীয়, মোঘল যুগের লিখিত বিবরণাদি ও দলিলপত্রে উক্ত দুইটি পদ বলিতে রাজস্ব বিলি বুঝানো হইয়াছে; ইহাদের কোন পদটিরই কোন বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

২৯. রাজস্ব বিলি অর্থেও উক্‌তা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে ইহার ব্যবহার স্বল্প। দ্রষ্টব্যঃ মিরাট-ই-আহ্‌মদি, I, পৃঃ ৩৫৫।

৩০. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: "মনসবদারী সিস্টেম"—আবদুল আজিজ: সিলেক্‌টেড্‌ ডকুমেণ্ট্‌স অব শাহজাহান্‌স্‌ রেন, পৃঃ ৮০, ৮১, ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২১ক-২৪ক; খুলাসাত্‌-উস-সিয়াক, পৃঃ ৭৬ক-৭৭খ।

৩১. আমল-ই-সালিব, III, পৃঃ ৬৫, ১৪৯: মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ৩০৫, ৩২৯, ৩৩৭।

৩২. মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ২২৭-২২৮, ২২৯; নগদ মাহিনা হিসাব করিবার বিশদ নিয়মাবলী নিম্নলিখিত গ্রন্থে লিখিত আছে, খুলাসাত্‌-উস্‌-সিয়াক,৭৭খ-৮৩ক; ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ২৪ ক, খ।

৩৩. আলমগীর নামার লেখক বলিয়াছেন যে, মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে, রাজবংশীয় রাজকুমার বর্গ ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তির পদমর্যাদা ৭০০০/৭০০০ এর উর্ধ্বে উঠে নাই। ৭০০০/৭০০০ পদমর্যাদা সম্পন্ন কোন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের প্রতি অনুগ্রহ ও সমাদর প্রদান করিতে হইলে, তাঁহার মাহিনা বাবদ প্রাপ্ত জায়গীরের উপরেও কিছু অতিরিক্ত রাজস্ব-স্বত্ব বিলি করিতেন এবং ইহা ইনাম্‌ বলিয়া পরিচিত ছিল। আলমগীর নামা, I, পৃঃ ৬১৮। দ্রষ্টব্য ঃ—আমল-ই-সালিব্‌, III, পৃঃ ২০৭; মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ২৯১; ইনাম্‌ বলিতে করমুক্ত-জমি প্রদানও বুঝাইত।

৩৪. আকবর নামা, III, পৃঃ ৩৮১; নিগার-নামা-ই-মুনসি, পৃঃ ২৭; দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৬১ কখ, ৭৩ কখ।

৩৫. খুলাসাত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌, পৃঃ ৪৮খ; সিয়াক্‌-নামা, পৃঃ ৪০-৪৮।

৩৬. ১৬৩৫ খৃঃ অঃ ১৯শে মে তারিখে উজীর আফ্‌জল খান কর্তৃক প্রকাশিত এক পরোয়ানায় লিখিত আছে যে, সৈয়দ আবদুল আজিজ্‌কে বেরার সুবার অন্তর্গত সরকার গাবিল্‌-এ অবস্থিত দরিয়াপুর পরগনা হইতে ৩৬, ৬৮, ১০০ দাম রাজস্ব-স্বত্ব বিলি করা হইল এবং দেশমুখ, মোকাদ্দাম ও কৃষকগণের প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে তাঁহারা যেন উক্ত ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণের জায়গীরদার বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের দেয় ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর ঐ ব্যক্তির গোমস্তাগণকে দান করেন। সিলেক্‌টেড্‌ ডকুমেণ্ট্‌স্‌ অব শাহজাহান্‌স্‌ রেন, পৃঃ ৪, ৫; এবং পৃঃ ১৭, ১৮, ২৩, ১৪৭।

৩৭. আকবর নামা, II, পৃঃ ৩৩২, ৩৩৩।

৩৮. আকবর নামা II, পৃঃ ৩৩২, ৩৩৩।

৩৯. তুজুক্-ই-জাহাঙ্গিরি, পৃঃ ৪ ; নিগার-নামা-ই-মুনসি, পৃঃ ২৯, ৩০,৪০ ; মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ১৮৫, এবং বার্নিয়ার, পৃঃ ২৩ দ্রষ্টব্য।

৪০. যে সকল জায়গীর ভূমি পুণর্গ্রহণ করিবার পরেও পুনরায় বিলি করা হয় নাই, তাহাদের লইয়া মহাল-ই-পাইবাকি (বা বিলি যোগ্য মহাল) গঠিত হইত। সাময়িকভাবে এইরূপ মহালের শাসনকার্য একজন রাজকর্মচারী মারফৎ চালান হইত।

৪১. সিয়াক্-নামা, পৃঃ ৪০-৪৮।

৪২. মিরাট-ই-আহমদি, II, পৃঃ ২৬।

৪৩. একই গ্রন্থে, II, পৃঃ ১৬৫।

৪৪. মুন্তখাব-উল্-লুবাব্, II, পৃঃ ৮০১, ৮০২ ; মিরাট-ই-আহমদি, II, পৃঃ ৯৯, ১৬৫, ১৬৬, ২৩৯।

৪৫. মিরাট-ই-আহমদি, II, পৃঃ ২২. ২৩, ২৭, ৩০।

৪৬. মাসির-উল-উমর, I, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮, ৬৭ ; মিরাট-ই-আহমদি, II পৃঃ ১০৩, ৩৮১।

৪৭. আকবরের রাজত্বের ২৭তম বৎসরেই এই নিয়ম প্রচলিত হয় যে, দস্তুর মাফিক জায়গীর-দারগণ ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর সংগ্রহ করিবেন। দ্রষ্টব্যঃ আকবর-নামা, III, পৃঃ ৩৮১।

৪৮. ৯৯৩ হিঃ/১৫৮৫ খ্রীঃ অঃ আকবর এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও দিল্লী প্রদেশে খাজনা মকুব করিয়াছিলেন। খালিসা ভূমিতে মকুব খাজনার পরিমাণ ছিল ৭০, ৭৪, ৭৬২ দাম। আবুল ফজল মন্তব্য করেন, ইক্তা জায়গীরের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ খাজনা মকুব করা হইয়াছিল, তাহা তদনুসারে গণনা করা যাইবে। (আকবর নামা, III, পৃঃ ৪৬৩, দ্রষ্টব্যঃ আকবর নামা, III, পৃঃ ৪৯৪, ৫৩৪)।

৪৯. ১০৮৮ হিঃ/১৬৭২ খ্রীঃ অঃ আওরঙ্গজেব গুজরাটের প্রাদেশিক দেওয়ানের প্রতি কয়েকটি হুকুমনামা জারি করিয়াছিলেন। এই হুকুমনামায় বলা হইয়াছে যে, খালিসা ও জায়গীর মহালগুলিতে বিগত বৎসরের বকেয়া পাওনা মকুব করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সকল বকেয়া পাওনার জন্য রায়তগণের উপর কোনরূপ উৎপীড়ন করা চলিবে না (মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ২৯০)।

৫০. ৯৮৯ হিঃ/১৫৮১ খ্রীঃ অঃ জায়গীরদার ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি এই নির্দেশ জারি করা হয় যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের এলাকার সকল অধিবাসীগণের নাম, ধাম ও পেশা ইত্যাদির লিপিবদ্ধ বিবরণ রক্ষা করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে কর্মে নিয়োজিত থাকেন এবং বেকার না থাকেন, তাহার প্রতি নজর রাখিবার আদেশও উপরোক্ত জায়গীরদার ও সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি জারি করা হয়।

দ্রষ্টব্যঃ—আকবর নামা, III, পৃঃ ৩৪৬, ৩৪৭। আকবর নামার অপর একটি অংশে লিখিত হইয়াছে যে, জায়গীর সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিবার নির্দেশ জায়গীরদারগণের প্রতি জারি করা হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য : আকবর নামা, III, পঃ ৩৮১।

৫১. সিলেক্টেড্ ওয়াকাই অব দি ডেকান, I, পৃঃ ৪৬।

৫২. রুক্কাত-ই-আলমগিরি, পৃঃ ১১, ১৫, ৩৭।

৫৩. কোরা চাকলার জায়গীরদার, হাসান বেগ এর বিরুদ্ধে উৎপীড়নের অভিযোগ ওঠে এবং ঐ চাকলার অধিবাসীগণ এইরূপ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বদাই অভিযোগ করিতে থাকেন। বিকল্প জায়গীর বিলির কোন ব্যবস্থা না করিয়াই সম্রাট উক্ত জায়গীরদারের জায়গীর পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য : রুক্কাত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৪৩)। খবরে প্রকাশিত হয় যে সাহ বেগ খান নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য-সামন্তের ভরণ পোষণ করিতেন না। তিয়ুল স্বত্বে যে সকল পরগনা সাহ বেগ খান ভোগ করিতেন, সেইগুলি দখল করিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিবার জন্য আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহান এক আদেশ জারি করিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্যঃ রুক্কাত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৯৩)।

৫৪. রুক্কাত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৩৭।

৫৫. দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৯ক।

৫৬. দ্রষ্টব্যঃ ফৌজদার অ্যাণ্ড ফৌজদারী আণ্ডার দি মোঘলস্, মেডিয়াভেল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি, IV, পৃঃ ২২-২৫।

৫৭. নিগার-নামা-ই-মুনসি, পৃঃ ১২৭ ; দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৩৭খ, ৩৮ক।

৫৮. দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৩৭খ, ৩৮ক, ৪১খ, ৪২ক ; নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ৮৩, ৯০, ৯১, ১৪০।

৫৯. নিগার-নামা-ই-মুন্সি, পৃঃ ২৭।

৬০. দস্তুর-উল-অমাল-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৮ক ; 'ষ্টাডিস্ ইন্ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিস্টরি অফ বেঙ্গল' পৃঃ ১৬৪, ১৬৫ ; দস্তুর-উল-অমাল-ই-মেহদি আলিখান, পৃঃ ৬৬ক ; 'এলাহাবাদ ডকুমেণ্ট' ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২২৯ নং।

৬১. হাল-ই-হাসিল্ প্রচলিত বৎসরের ধার্য ভূমি রাজস্ব।

৬২. 'সিলেক্টেড্ ডকুমেণ্টস্ অফ শাহজাহান রেন' পৃঃ ৮৮, ৮৯, ৯০, ১৬৪ ; মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ৩২৭।

৬৩. মিরাট-ই-আহমদি, I, পৃঃ ৩২৭।

৬৪. মুন্তখব-উল-লুবাব, II, পৃঃ ৬০২, ৬০৩, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪১১, ৪১২ ; রুক্কাত্-ই-আলমগিরি, পৃঃ ৭। বিকল্প রাজস্ব স্বত্ব ভোগের অনুমতি লাভ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তাহার উত্তরে সম্রাট জানাইয়াছিলেন যে, রাজস্ব স্বত্ব বিলি করিবার মত জায়গীরের সংখ্যা অতি অল্প এবং জায়গীর আবেদনকারীর সংখ্যা সেই অনুপাতে অত্যধিক। সুতরাং বিকল্প জায়গীর বিলির ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

৬৫. মুস্খা-ই-দিল্খুশা, পৃঃ ১৬৯কখ ; এবং মুন্তখব্-উল্-লুবাব্, II. পৃঃ ৩৯৬, ৩৯৭, ৪১১, ৪১২ দ্রষ্টব্য।

৬৬. মুস্খা-ই-দিল্খুশা, পৃঃ ১৬৯কখ ; এবং মুন্তখব-উল-লুবাব, II, পৃঃ ৩৯৬, ৩৯৭, ৪১১, ৪১২ দ্রষ্টব্য।

৬৭. মুন্তখব-উল-লুবাব, পৃঃ ৬৩০। কাফি খান এর বিবরণ অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে বাহাদুর শাহ এতই অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন যে কয়েকজন দুর্বিনীত ব্যক্তি তাঁহার সিংহাসন লাভের তারিখটি "শাহ-ই-বেখবর বা তথ্য-বিহীন রাজা" হিসাবে গণ্য করিতেন।

৬৮. মুন্তখব্-উল-লুবাব্, II, পৃঃ ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০ ; সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরূন্, II, পৃঃ ৩৮০ ; মুস্খা-ই-দিলখুশা, পৃঃ ১৬৯ক। আহওয়াল-উল-কোয়াকিন গ্রন্থ লেখকের মতে, বাহাদুর শাহের পূর্ব পুরুষগণের রাজত্বকালে, সমগ্র জীবনব্যাপী কার্য করিলেও 'খান' উপাধি অর্জন করা সম্ভব হইত না, এবং শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক মন্সব্দার তাঁহাদের জীবদ্দশায় 'খান' উপাধি অর্জন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ এত বেশী উদার ছিলেন যে তাঁ ার রাজত্বকালে এমন কোন মন্সব্দার ছিলেন না যিনি খান উপাধি অর্জন করেন নাই। (আহ্ওয়াল-উল-কোয়াকিন, পৃঃ ৪৫ ক,খ)।

৬৯. মুন্তখব-উল-লুবাব, II, পৃঃ ৬২৮, ৬২৯। ইখ্লাস খান এই পদে নিয়োগ হন ১১১৯ হিঃ/ ১৭০৭ খ্রীঃ অঃ।

৭০. মুন্তখব্-উল-লুবাব্, II, পৃঃ ৬২৮, ৬২৯।

৭১. মুন্তখব্-উল-লুবাব্, II, পৃঃ ৬২৯।

৭২. মুন্তখব্-উল-লুবাব্, II, পৃঃ ৬০২, ৬০৩।

৭৩. আহ্ওয়াল-উল-কোয়াকিন, পৃঃ ১৮২ক, খ ; ১৪৩ক। মহম্মদ শাহ-এর রাজত্ব কালের প্রথম বর্ষে উজীরি দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবার পর নিজাম-উল-মুল্ক্ যখন নথী পত্রাদি পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে যে সকল তথ্য তাঁহার গোচরে আসে গ্রন্থের উক্ত অংশে সেইগুলির বিবরণ আছে। ইহা স্পষ্ট যে, পূর্বতন রাজন্যবর্গের আমলেই এইসব ঘটনাবলী বিবর্তিত হইয়াছিল। জাহান্দর শাহ-এর রাজত্ব স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল এবং তাঁহার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিনি অপসারিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে আলোচ্য সাক্ষ্য ফারুখ সিয়ারের রাজত্ব কালেরই নির্দেশ বহন করে।

৭৪. মুন্তখব্-উল-লুবাব্, II, পৃঃ ৭৭৫।

৭৫. ১২ই এপ্রিল, ১৭১৭ সালে ইনায়েতুল্লাহ খান দেওয়ান-ই-তান্ এবং খালিসা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ৪০০০ জাঠ ও ৩০০০ সোয়ার এর পদমর্যাদা তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। 'লেটার মোঘল্স্,' আরভিন, I, পৃঃ ৩৩৪।

৭৬. সুবার অন্তর্ভুক্ত সকল জায়গীর ও অন্যান্য ভূমির আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার। ইহাতে প্রতিটি গ্রামের রাজস্বের বিশদ বিবরণসহ প্রত্যেকটি সরকার ও পরগনার মোট আয়ের পরিমাণ উল্লিখিত থাকিত।

৭৭. একটি দলিল, যাহার মধ্যে মাহিনা বাবদ খরচের হিসাব, এবং প্রতিটি রাজস্ব প্রদানকারীর নাম, প্রদত্ত ও বাকী রাজস্বের পরিমাণ সংক্রান্ত রাজস্ব-বিবরণ লিখিত থাকিত।

৭৮. বাহাদুর শাহএর আমল হইতে প্রচণ্ডভাবে মন্সবের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অপব্যায় মন্সব্দারী প্রথার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমাদের প্রামাণ্য আকরগুলিতে যে মন্তব্য সাধারণভাবে করা হইয়াছে, ব্যক্তিগত ভাবে মন্সব্দারের পদমর্যাদা বৃদ্ধির ঘটনা সেই মন্তব্যের সমর্থন করে।

বাহাদুর শাহ :

(ক) মুনির খানকে খান-ই-খানান বাহাদুর জাফর জঙ্গ উপাধিতে বিভূষিত এবং ১৫৯০ হইতে ৭০০০ জাঠ ও ৭০০০ সওয়ার এ তাঁহার পদমর্যাদা উন্নীত করা হইয়াছিল।

(খ) আসাদ খানকে ৮০০০ জাঠ ও ৮০০০ সওয়ার 'দো অস্‌পাহ্‌ সিহ্‌ অসপাহ্‌'এর পদমর্যাদা প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র জুলফিকর খান-এর পদমর্যাদা ছিল ৭০০০ জাঠ ও ৭০০০ সওয়ার ('লেটার মোঘল্‌স্‌,' আরভিন, II, পৃঃ ৩৮, ৩৯)।

(গ) নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌কে খান-ই-খানান বাহাদুর উপাধিতে বিভূষিত করিয়া তাহাকে ৭০০০ জাঠ ও ৭০০০ সওয়ার এর পদমর্যাদা প্রদান করা হইয়াছিল।

জাহান্দর শাহ-এর রাজত্ব কালে ঃ

রাইমান নামক যে নারী জাহান্দর শাহ-এর উপর অতর্কিত আক্রমণের সময় বিপদ সংকেত দিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট সাহসের সহিত আততায়ীগণকে আক্রমণ করিয়া একজন আততায়ীকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই নারীকে এই বীরত্বপূর্ণ কর্মের জন্য রাজা বাহাদুর রুস্তম্‌ হিন্দ্‌ উপাধি এবং ৫০০০ জাঠ পদমর্যাদায় বিভূষিত করা হইয়াছিল (লেটার মোঘল্‌স্‌, আরভিন, I, পৃঃ ২৮১)।

ফারুখ সিয়ার ঃ

(ক) ১৭১৮ সালের জানুয়ারিতে মহম্মদ মুরাদ্‌ খান মীর তুজুক পদে বৃত হন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদমর্যাদা ৫০০ সংখ্যায় বৃদ্ধি করিয়া ৩০০০ জাঠ এ উন্নীত করা হয়। ১৭১৮ সালের মার্চ মাসে, ৫০০০ জাঠ ও ২০০০ সওয়ারের পদমর্যাদা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭১৮ সালের মে মাসে তাঁহার পদমর্যাদা ৬০০০ জাঠ ও ৫০০০ সওয়ারে উন্নীত হইয়াছিল। ১৭১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার পদমর্যাদা ৭০০০ জাঠ, ৭০০০ সওয়ার, ৪০০০ দো অস্‌পাহ্‌ সি অস্‌পাহ্‌-এ উন্নীত হয়। গুজরাট, দিল্লী ও আগ্রা প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গীরগুলি তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল (আরভিন, I, পৃঃ ৩৪০, ৩৪৪, ৩৬৪)।

(খ) ১৭৬৪ সালে রতন চাঁদকে রাজা উপাধি ও ২০০০ জাঠ এর পদমর্যাদায় বিভূষিত করা হইয়াছিল। ১৭২০ সালের মে মাসে, তাঁহার পদমর্যাদা ৫০০০ জাঠ ও ৫০০০ সওয়ারে উন্নীত হইয়াছিল (লেটার মোঘল্‌স্‌, আরভিন, II, পৃঃ ১৬)।

৭৯. বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তিনি রাজ কর্মচারী হিসাবে রাজকর্ম শুরু করিয়াছিলেন কিন্তু জাহান্দার শাহের আমলে সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ফারুখ সিয়ারের আমলে তিনি দেওয়ান-ই-খালিসা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মহম্মদ শাহের আমলে খান ই-সামান এর দপ্তর লাভ করেন এবং আহমদ শাহের আমলে তাঁহার মৃত্যু হয় (মাসির-উল-উমর, III, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৮)।

৮০. যে সকল মন্‌সব্‌দার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাটের শাসনভার গ্রহণের পরে রাজকার্যে যোগদান করিতেন।

৮১. সম্রাটের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সৈন্য বর্গ ব্যক্তিগত ভাবে যাহারা তাঁহার প্রতি অনুগত ছিল এবং রাজপুত্র থাকাকালীন যাহারা তাঁহার অধীনে কর্ম করিত।

৮২. মুন্তখব-উল-লুবাব, II, পৃঃ ৭৬৯ ; সায়ের-উল্‌-মুতাক্ষারীন, II, পৃঃ ৪০৫। সায়ের-উল-মুতাক্ষারীণ গ্রন্থ লেখকের মতে, নূতন মন্‌সব্‌দার সংগ্রহ করিবার আদেশ রাজত্বের পঞ্চম

বর্ষে জারি করা হইয়াছিল। নবনিযুক্ত মনসবদারের অধিকাংশই ২০ হইতে ৯০০ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইহাতে পাদশাহি ও ওয়ালাশাহি মনসবদারগণকে পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

৮৩. আওয়াল্-উস-কোওয়াকিন, পৃঃ ১৮২ কখ, ১৮৩ক। শাহনামা-ই-মুনাওয়ার-উল্-কলম, পৃঃ ৮খ, ক।

৮৪. তাজকিরাত্-উল-মুলুক, পৃঃ ১৩১ কখ।

৮৫. আওয়াল-উস-কোয়াকিন, পৃঃ ১৮৫ক ; সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন্, II, পৃঃ ৪৫৬, 'লেটার মোঘলস্', আরভিন, II, পৃঃ ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭।

৮৬. মিরাট-উল-ইস্তিলাহ্, পৃঃ ৬৪খ।

৮৭. আইন-ই-আকবরি, I, পৃঃ ১৪১।

৮৮. একই গ্রন্থে, I, পৃঃ ১৪০।

৮৯. একই গ্রন্থে, I, পৃঃ ১৪০ ; সিয়ারথল্ কথাটি মূলতঃ মোঙ্গল ভাষা হইতে আহৃত এবং আক্ষরিক অর্থে ইহার অর্থ হইল অনুগ্রহ বা দান। মৌলিক অর্থে, যে সকল দলিল পত্রের মাধ্যমে ভিয়ুল জায়গীর প্রদান করা হইত, সেই দলিল পত্রাদিকেই সিয়ারথল্ বলা হইত।

৯০. আইন-ই-আকবরি, I, পৃঃ ১৪০, ১৪১।

৯১. একই গ্রন্থে, I, পৃঃ ১৪০, ১৪১।

৯২. 'এলাহাবাদ ডকুমেন্ট্স্' ১৬৭, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৫, ১৫৪ নং।

৯৩. একই গ্রন্থে, ৯, ১৬৫, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮ নং।

৯৪. একই গ্রন্থে, ১৬১ নং।

৯৫. ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৯খ ; এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্, ৬০ নং এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তথ্যশালায় সংরক্ষিত আকবরের একটি ফারমানে মকুব খাজনা সমূহের তালিকা উল্লিখিত আছে। এইগুলি হইল : কুনশিখা (পরোওয়ানা খরচ) : পেশকাশ (উপহার), জরিবানা (জমি পরিমাপ সংক্রান্ত খরচের হার) ; জবিতানা (রাজস্ব সংগ্রহকারীর পারিশ্রমিক) মুহরীয়ানা (দলিল পত্রে সীল লাগাইবার পারিশ্রমিক) দারোগানা (তদারকি খরচ), বেগার (বিনা পারিশ্রমিকে মজুর নিয়োগ), শিকার (শিকার করিবার অনুমতি বাবদ কর), দাহ্ নিসি (৫% হারে আরোপিত কর), কানুনগোই (জোতস্বত্ব তত্ত্বাবধানকারী রাজকর্মচারীগণের পারিশ্রমিক) এবং জব্ত্-ই-হারসালা (বাৎসরিক রাজস্ব বন্দোবস্তের খরচ)। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ 'সিলেকটেড্ ডকুমেন্টস্' অফ্ শাহজাহান্স্ রেন, পৃঃ ১৯০।

৯৬. এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্, ১নং।

৯৭. একই গ্রন্থে ২১৮ নংঃ ১১৭৯ হিঃ/১৭৬৪ খ্রীঃ তারিখ।

৯৮. একই গ্রন্থে ২১৮ নং ; ১১৭৯ হিঃ/১৭৬৪ খ্রীঃ তারিখ।

৯৯. দস্তুর-ই-অমাল-ই-বেকাস্, পৃঃ ৪০কখ।

১০০. আকবরের ফারমান (৯৮৬ হিঃ), এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্, ৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৬২ নং।

১০১. এলাহাবাদ ডকুমেন্ট্স্, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬২ নং।

১০২. একই গ্রন্থে, ১০, ১৮০, ১৬০ নং।

১০৩. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ২৪ নং।

১০৪. ৯৮৬ হিঃ প্রকাশিত আকবরের ফারমান হইতে জানা যায় যে, জমার অন্তর্ভুক্ত আবাদী ভূমি হইতেই সমগ্র মাদাদ্-মাস্ জমি বিলি করা হইযাছিল। কৃষক ও দান গ্রহীতা কর্তৃক কর্ষিত জমির পরিমাণ আলাদা ভাবে ঐ ফারমানে উল্লিখিত আছে। মধ্যে মধ্যে পরগনার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গ্রামকে আয়মা গ্রাম হিসাবে স্বতন্ত্র করিয়া জমা তালিকা হইতে সেইগুলি বাদ দেওয়া হইত (দ্রষ্টব্যঃ সিযাক নামা, পৃঃ ৩৩-৩৯)।

১০৫. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৩ নং; ফারহঙ্গ-ই-কারদানি; পৃঃ ৩৯ক।

১০৬. আইন্-ই-আকবরি, I, পৃঃ ১৪১।

১০৭. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ১৬২ নং; এই দলিলের তারিখ হইল জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ১৪শ বর্ষ; ১০০৪ হিঃ তারিখের দলিলে (২৯৬ নং) ৩৯ বিঘা, ২০ বিঘা আবাদী, ৯ বিঘা পতিত জমি বিলির উল্লেখ আছে।

১০৮. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ১৫৪ নং।

১০৯. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ১৫৪ নং (তারিখ, শাহজাহানের রাজত্বের ১২শ বৎসর, ১০৪৯ হিঃ/ ১৬৩৯—৪০ খ্রীঃ অঃ: এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস, ১৪৪, ১৮০, ১৯৯ নং; এই দলিলগুলিতে যথাক্রমে ১৫৬২ বিঘা, ৩০৩৯ বিঘা ও ২২২০ বিঘা জমি বিলির কথা উল্লিখিত আছে।

১১০. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস, ২২০, ২২৬ নং।

১১১. ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৯ক।

১১২. একই গ্রন্থে, পৃঃ ৩৯ক।

১১৩. সম্ভবতঃ সিয়াহা-ওয়াকাই বা শুনানীর রেজিষ্টার।

১১৪. মনে হয়, আকবরের আমলে, ৯৮৬ সাল পর্যন্ত যে পরিমাপের জমি মাদাদ্-মাস্ বাবদ বিলি করা হইয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ ফারমানে লিখিত আছে। দ্রষ্টব্য: আকবরের ফারমান, তারিখ ৯৮৬ হিঃ/১৫৭৮ খ্রীঃ অঃ। ইতিহাস বিভাগ, মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়।

১১৫. গোমস্তা, প্রতিনিধি।

১১৬. সনদ, একটি আদেশ নামা বা সনন্দ।

১১৭. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ২, ১৬১, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮নং।

১১৮. একই গ্রন্থে, ১৬৮, ১৭১, ১৭৫নং।

১১৯. মৃত মাদাদ্-মাস্ দান গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণের ক্ষেত্রে ঐ দানের পুনর্নবীকরণ ও অনুমোদনের কম-বেশী দশটি ঘটনা বর্তমান লেখক অনুধাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই দশটি ঘটনার মধ্যে নয়টি ঘটনার ক্ষেত্রে হাসাব্-উল-হুকুম্ এর ধারা অনুযায়ী পুণর্নবীকরণ ও অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়। কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে ফারমানের ভিত্তিতে পুণর্নবীকরণ ও অনুমোদন মঞ্জুর করা হয় এবং মাদাদ্-মাস্ হিসাবে প্রদত্ত জমির পরিমাণ ছিল চার হাজার বিঘার অধিক। (এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ১৫৪৭ নং)। মনে হয়, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই ফারমানের সাহায্যে পুণর্নবীকরণ ও অনুমোদনের আদেশ জারি করা

হইত ; কারণ এই প্রথায় প্রদত্ত মাদাদ্-মাস্ জমির পরিমাপ অত্যধিক হইত। হাসাব-উল-হুকুম্ অনুযায়ী :পুণর্বীকরণ ও অনুমোদনের ঘটনার জন্য দ্রষ্টব্য : এলাহাবাদ ডকুমেন্টস্, যথাক্রমে ৯, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৩ ও ১৭৫ নং।

১২০. আইন্-ই-আকবরি, I, পৃঃ ১৪০।

১২১. একই গ্রন্থে I, পৃঃ ১৪১।

১২২. আকবরের ফারমান্, ৯৮৬ হিঃ তারিখে।

১২৩. মিরাট-ই-আহমদি, ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৭৩।

১২৪. ঐ, পৃঃ ১৭৩ ; এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ৫৫ নং।

১২৫. আইন-ই-আকবরি, I, পৃঃ ১৪১।

১২৬. সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্চার অফ মোঘল এম্পায়ার, ইব্‌ন-ই-হাসান, পৃঃ ২৭২-২৭৩।

১২৭. 'সেণ্ট্রাল স্ট্রাক্চার অব মোঘল এম্পায়ার' ইব্‌ন-ই-হাসান, পৃঃ ২৭৫ ; বাদশাহ-নামা, II, পৃঃ ৩৬৫, ৩৬৬।

১২৮. মিরাট-ই-আহমদি, ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৭৩।

১২৯. মুন্তখব্-উল্-লুবাব্, II, পৃঃ ৮৪৩।

১৩০. আকবর নামা, III, পৃঃ ৩৭২।

১৩১. মিরাট-ই-আহমদি, ক্রোড়পত্র পৃঃ ১৭৩।

১৩২. মুতাওয়ালি : কোন ধর্মীয় আনুকূল্য প্রদানকারী সংস্থার তত্ত্বাবধায়ক বা উকিল।

১৩৩. ইমাম : যে ব্যক্তি প্রার্থনা সভার নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৩৪. মোয়াজ্জিন : মস্জিদের চূড়া হইতে যে ব্যক্তি প্রার্থনায় যোগদান করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে জনগণকে আহ্বান জানান।

১৩৫. মুহ্‌তাসিব : পুলিশ দপ্তরের একজন কর্মচারী, যিনি ক্রয়-বিক্রয়ের মাপ-বাটখারা ও খাদ্যসম্ভার পরীক্ষা এবং জুয়াখেলা মদ্যপান ইত্যাদি নিবারণ করিতেন।

১৩৬. ১০১৯ হিঃ/১৬১০ খ্রীঃ অঃ তারিখের একটি দলিলে মুতাওয়ালীকে একটি চক্‌নামার একজন সাক্ষ্যকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী সময়ের একটি দলিল হইতে জানা যায় যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন পরগনা স্তরের মাদাদ্-মাস্ জমির তত্ত্বাবধানের সহিত সংশ্লিষ্ট একজন সরকারী কর্মচারী (দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস পৃঃ ৩৮-৩৯)। সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীর বা তাঁহার পূর্ববর্তীকালে মুতাওয়ালি-দপ্তর সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৩৭. দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস, পৃঃ ৩৮, ৩৯।

১৩৮. তবে আকবরের আমলে অ-মুসলিম সম্প্রদায়কেও কিছু জমি দান করা হইয়াছিল। দান গ্রহীতাদের মধ্যে ছিলেন কাইকুবাদ নামে একজন পার্শী ও গোকুল নামক একজন হিন্দু পুরোহিত। পার্শী গ্রহীতাকে যে দান করা হয় তাহা মাদাদ্-মাস্, কিন্তু গোকুলকে প্রদত্ত গ্রাম সম্পর্কে ফারমানে কেবল এই কথা বলা হইয়াছে যে, মন্দিরের খরচ বাবদ উক্ত গ্রাম প্রদান করা হইল এবং গ্রহীতাকে ভূমি-রাজস্ব সহ অন্যান্য সকল প্রকার কর হইতে রেহাই দেওয়া হইল। দ্রষ্টব্য : 'দি পার্শী অ্যাট দি কোর্ট অফ আকবর,' পৃঃ ১১৯, ১৯৩ ; ইম্পিরিয়েল ফারমান্স্, IV নং ; এবং VII নং ফারমান।

১৩৯. এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ৪৩৯ নং।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও উপসংহার

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ও নাদিরশাহ্ এর ভারত আক্রমণের মধ্যে যে তিনটি দশক অতিবাহিত হয়, তাহা মোঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভাঙ্গনের যুগ। ১৭০৭ সালে এই সাম্রাজ্য বিস্তৃতির শীর্ষসীমায় পৌঁছায়, আওরঙ্গজেবের হস্তে মারাঠাদের পরাজয়ে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ এই উভয়বিধ সংকট হইতে আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁহার উত্তরাধিকারীকে শিখ, জাঠ ও রাজপুত বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হয়। মারাঠাগণ আশ্চর্য ও আশাতীত শক্তিমত্তায় পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়ান এবং মোঘল সাম্রাজ্যের চরম আশঙ্কার বস্তু হইয়া উঠেন। এই যুগে মোঘল রাজদরবারে দলীয় কলহ চরমে উঠিবার দরুন রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা যথেষ্ট ব্যাহত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৩৯ সালে নাদিরশাহ্ পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন এবং অতি সহজেই পারসী সৈন্যের নিকট মোঘল সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল। পারসীদের বিজয় মোঘলশক্তির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করে, এবং মোঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

সপ্তদশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধ হইতে সাম্রাজ্যের ঘুণধরা প্রশাসনিক সংস্থাগুলি ইহার প্রাণশক্তি দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ শেষ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিদ্রোহ, ধর্মীয় সংঘর্ষ, রাজদরবারে দলীয় কলহ ও শাসক শ্রেণীগুলির অধঃপতনের মধ্য দিয়া ভূমি ও প্রশাসনিক সংকট পরিস্ফুট হইতে লাগিল। এইরূপে, ক্রমশঃ সংকট অধিকতর ঘণীভূত ও জটিলরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ঘটায়। ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংকটের একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটিয়া উঠে, এবং ভূমি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংকটের সহিত রাজনৈতিক বিঘটনের সম্পর্ক কি ছিল, তাহা জানা যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে, জায়গীরদারী প্রথা তদানীন্তন যুগের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও ভূমি ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। রাজস্ব বিলি পদ্ধতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব লুক্কায়িত ছিল, তাহা মনসবদারের পদমর্যাদা ও সংখ্যার প্রবল বৃদ্ধি ও সেই অনুপাতে বিলি করিবার মত জায়গীর ভূমির স্বল্পতার মধ্য দিয়া স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জমার স্ফীতহার এবং সাম্রাজ্যের পুরাতন কর্মচারীগণের উত্তরাধিকারী ও মনসবজায়গীরের নূতন দাবিদারের মধ্যে চরম প্রতিযোগিতা, এই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ ফলাফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জায়গীর প্রথার এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। অধিকাংশ খালিসা ভূমির জায়গীরে রূপান্তর, আওরঙ্গজেবের পরবর্তী যুগে সর্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু ইহাতেও অবস্থার উন্নতি হয় নাই। সময়ে সময়ে জরুরী অবস্থায় নগদ মাহিনায় সৈন্য নিয়োগের প্রথা হইতে প্রমাণ হয় যে, হয় কেন্দ্রীয় সরকার জায়গীরদারগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল, না হয় অত্যধিক উচ্চহারে জমা নির্ধারিত হওয়ায় অধিকাংশ জায়গীরদারগণের আর্থিক অবস্থা এরূপ পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছিল, যে জায়গীর ও মনসবের প্রতিদানে নির্ধারিত সংখ্যার সৈন্য ভরণপোষণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরপক্ষে এরূপ তথ্যও পাওয়া যায় যে, একাধিক বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত মনসবদার - যাঁহারা উচ্চপদমর্যাদার মনসব্ ও লাভজনক জায়গীর অর্জন করিয়াছিলেন—নির্ধারিত সংখ্যার সৈন্য ভরণপোষণ করিতেন না এবং সামরিক প্রয়োজনে তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইত না। এই ঘটনা-বৃত্তের মোট ফলাফল হইল এই যে, জায়গীরদারী প্রথা শক্তিশালী ও সুদক্ষ সামরিকবাহিনী সরবরাহ করিয়া রাষ্ট্রকে সাহায্য করিতে ব্যর্থ হয়।

জায়গীরদারী পদ্ধতির সংকট বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক দক্ষতাও ব্যাহত করিয়াছিল, কারণ তাঁহাদের জায়গীর হইতে অতি স্বল্প আমদানি হওয়ায় থানাদার, ফৌজদার ও সুবাদারগণ প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে কালযাপন করিতে বাধ্য হইতেন। অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ জায়গীরদারগণের নিকট হইতে যথাযথ প্রশাসনিক বা সামরিক দায়িত্বপালনের কথা অচিন্তনীয়। কারণ, তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনোচিত সৈন্যবাহিনী অথবা উপযুক্ত কর্মচারী সংগ্রহ করিয়া ভরণপোষণ করা সম্ভব হইত না।

উপরন্তু, জায়গীরদারী পদ্ধতির সংকটের ফলে কৃষক শ্রেণীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জমার পরিমাণ অত্যধিক উচ্চহারে নির্ধারিত হওয়ায় জায়গীরদারগণ তাঁহাদের জায়গীরের জমা এতই উচ্চহারে নির্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় জমিদারগণের পক্ষে ঐ পরিমাণ রাজস্ব প্রদান সম্ভব ছিল না। সুতরাং জমিদারগণ বর্ধিত হারের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিতেন। অথবা ঐ অতিরিক্ত করের বোঝা কৃষকগণের উপর চাপাইয়া দিতেন। জমিদারগণ রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিলে, মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে রাজস্ব ক্ষেত্রে ইজারাদারের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত, এবং ইহার ফলে কৃষকের উৎপীড়নের চাপ অধিকতর বৃদ্ধি পাইত।

জায়গীরদারী পদ্ধতির অবনতির কারণ, ঐ পদ্ধতির নিজস্ব দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত এবং তাহার সূচনাকাল হইতেই এই অবনতির লক্ষণগুলি অঙ্কুরিত অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছিল। নগদ মূল্যে নির্ধারিত বেতন, রাজস্ব বিলিব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করাই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রথার প্রচলনের জন্য সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ—যাহা অর্থনীতির ভাষায় জমা বলিয়া পরিচিত—অবশ্যম্ভাবী ছিল। মোঘল যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় জমা, হাল-ই-হাসিল ও আয়ের বিরাট ব্যবধান সর্বদাই দুশ্চিন্তার উদ্রেক করিত। আকবরের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষের মধ্যেই এই সমস্যার মূল রূপটি প্রকট হয়।

কর্মক্ষেত্রে জমা-ই-রকম্‌ই কলমি হিসাবে জমার হার অত্যাধিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। জমা অথবা রাজস্বের নিরূপিত মূল্য এবং হাল-ই-হাসিল বা নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব ও যে পরিমাণ রাজস্ব প্রকৃতই সংগৃহীত হইত, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু উচ্চহারে জমা নিরূপণ প্রশাসনিক তাগিদে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল; কারণ যদিও রাজস্ব বিলি করিবার মত সহজপ্রাপ্য জায়গীরের সংখ্যা খুবই স্বল্প ছিল, তবুও আকবরকে রাজস্ব বিলির মাধ্যমেই এক বৃহৎ সংখ্যক মন্‌সব্‌দারগণের বেতন প্রদান করিতে হইত। সুতরাং উচ্চহারে জমা নিরূপণের প্রবণতা খর্ব করিয়া একদিকে, জায়গীর সমূহ হইতে প্রাপ্ত আয়ের ও ইহাদের উপর ধার্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণের মধ্যে এবং অপরদিকে, ধার্য ভূমি-রাজস্ব ও রাজকার্যে নিযুক্ত মন্‌সব্‌দার ও অশ্বারোহীর মোট সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ছিল মূল সমস্যা।

আকবরের আমলে জমা ও হাল-ই-হাসিলের পার্থক্য হ্রাস করিবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চলিয়াছিল এবং বিভিন্ন জমা প্রস্তুতির প্রচেষ্টা হইতে দেখা যায় যে আকবরের ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফল হইয়াছিল। কিন্ত জাহাঙ্গীরের আমলে জমার অঙ্ক অত্যন্ত উচ্চহারে নিরূপিত হইয়াছিল। শাহজাহানের আমলে জায়গীরদারী পদ্ধতির মধ্যে গভীর সমস্যা দেখা গিয়াছিল এবং জায়গীরদারী ও মন্‌সব্‌দারী পদ্ধতিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সূচনা তাঁহাকে করিতে হয়। তিনি কয়েকটি বিধান জারি করিয়া— যাহাদের মাসিক হার ও মাসিক অনুপাত বলা যায়—বন্টিত রাজস্ব হইতে মন্‌সব্‌দারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল বিধানের ফলে, মন্‌সব্‌দারগণের বেতন হ্রাস এবং সেই অনুপাতে তাঁহাদের দ্বারা পালিত অশ্বারোহীর সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছিল। বর্ধিত হারে জমা নির্ধারণের ক্ষতিকর প্রথা রোধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল পরোক্ষ ও জটিল ভাবে। উচ্চ পদমর্যাদার মন্‌সব্‌ ও বৃহৎ জমা অঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া যে কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অব্যাহত রাখা হইল এবং কোন এক নির্দিষ্ট সময় বিলি ব্যবস্থায় প্রদত্ত জমা হইতে আয় কত তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ সমস্যা ছিল। হাল-ই-হাসিল হিসাবে প্রদত্ত অঙ্ক লইয়া রাজস্ব-মন্ত্রক ও জায়গীরদারগণের মধ্যে সর্বদাই বাদ-প্রতিবাদ লাগিয়া থাকিত। আওরঙ্গজেব—বিশেষ করিয়া তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে যে সময় মারাঠাদিগকে পরাভূত করিবার জন্য তাঁহার সকল ক্ষমতা ও সময় অতিবাহিত হইত—প্রশাসনিক কর্মের খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর যথাযথ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। বাহাদুর শাহের আমলে যে সংস্কারের প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে আন্তরিকতা ছিল না; সম্রাটের উদাসীনতা ও তাঁহার প্রিয় পারিষদবর্গের চক্রান্তে সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। অনুরূপ পরিণতি ঘটিয়াছিল নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌-এর বিলম্বিত সংস্কার পরিকল্পনায়। ইহার ফলে, উচ্চহারে জমা নিরূপণ পদ্ধতির প্রবণতা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে থাকিয়া গিয়াছিল।

জায়গীরদারী পদ্ধতির স্থিতিস্থাপকতা নাশের অপর একটি কারণ হইল নিয়মিত

জায়গীর হস্তান্তরের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা। ইহার ফলে যে শুধু মাত্র জমিদার ও কৃষকের উপর উচ্চ হারে করের বোঝা চাপানো বা কৃষি কর্মের বিনাশসাধন করা হইয়াছিল তাহা নহে, উপরন্তু পরোক্ষভাবে মনসবদারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধারণতঃ একটি জায়গীরের পুনর্গ্রহণ ও তাহার স্থলে বিকল্প জায়গীরের রাজস্ব বিলিব্যবস্থা, যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ছিল। এই অন্তবর্তী সময়ের জন্য মহাল-ই-পাই-বাকি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ পুনর্গৃহীত জায়গীরের তদারকি করিতেন। যে কোন সময়ে, এরূপ বহু মনসবদারের খোঁজ পাওয়া যাইত, যাঁহাদের নাম সরকারের মাহিনা তালিকায় থাকিলেও জায়গীরবিহীন অবস্থায় তাঁহাদের কাল কাটাইতে হইত। অবশ্য যথাসময়ে তাঁহাদের দাবির মীমাংসা করা হইত, কিন্তু হিসাবনিকাশের যথাযথ নিষ্পত্তি করিতে যে প্রচুর সময় অতিবাহিত হইত, সেই সময়ের জন্য সরকার মনসবদারগণের মাহিনা আটক রাখিতেন। সুতরাং জায়গীর হস্তান্তর প্রথার সুযোগ লইয়া সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকা সত্ত্বেও এবং তাহাদের ন্যায্য আর্থিক দাবি কোন এক অনির্দিষ্ট কালের মধ্যে পূরণ করিতে সরকার প্রতিশ্রুত থাকিলেও, যে কোন সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক বেতনভূক মনসবদার নিয়োগ করিতে সক্ষম হইতেন। এইরূপ ব্যবস্থায় সরকারী তহবিলের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইত এবং মনসবদারগণের মনে অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তা উদ্রেক করিয়া রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর সামরিক দক্ষতা খর্ব করিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে নির্দিষ্ট সংখ্যক জায়গীরদার ও সৈনিক—যাঁহাদের বেতন জায়গীরের প্রাপ্ত আয় হইতে সম্পূর্ণ মেটানো যাইত, তাঁহাদের নিয়োগ করা হইত না কেন এবং কেনই বা মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রবণতা হ্রাস করা হয় নাই? ইহার উত্তর খুঁজিতে হইবে; মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে ইরান ও তুরান হইতে বহিরাগতদিগের অবিশ্রান্ত স্রোতে এবং মনসবদারী পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতার মধ্যে।

মোঘল যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অবকাশ মুহূর্ত ব্যতিরেকে, নূতন রাজ্যজয় অথবা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শক্তিশালী বিদ্রোহীগণকে দমন করিবার কর্মে মোঘল বাহিনীকে অবিরাম লিপ্ত থাকিতে হইত। এই পরিবেশে মনসবদার ও তাঁহাদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। মনসবদার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার অপর একটি কারণ হইল মনসবদারী পদ্ধতির অর্ধ সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে অভিজাত-শ্রেণীর ক্ষমতা ও দাবি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে একটি আমলাতান্ত্রিক শ্রেণী হিসাবে মনসবদারী পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। মনসবদার নিয়োগের নিয়মকানুন, তাঁহার অধিকার ও দায়িত্ব উত্তরাধিকারীর অভাবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের আইন, প্রায়শঃ জায়গীর হস্তান্তরের প্রথা, এই সকল ঘটনা হইতে যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে অভিজাত-শ্রেণীর ক্ষমতা ও দাবি যথেষ্ট সাফল্যের সহিত খর্ব করিয়া তাঁহাদের রাজকীয় সামরিক বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে সংগঠিত করা হইয়াছিল। তত্ত্বগতভাবে, মনসবের উপরেও কোন বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃত হইত

না। কিন্তু প্রত্যক্ষ আমলাতন্ত্রের আবরণে পরোক্ষ সামন্ততান্ত্রিক[১] প্রবণতা লুক্কায়িত ছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে মনসবের উপর বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মনসবদারের পুত্র ও উত্তরাধিকারী-গণকে মনসব্ প্রদান করা হইত। বস্তুতঃ এইরূপ নিদর্শন আছে যে, দীর্ঘকাল যাবৎ খানা জাদায় নামে পরিচিত পুরাতন শ্রেণীর মনসবদারের উত্তরাধিকারী-গণের দাবিগুলি সম্রাটগণ সযত্নে ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিবেচনা করিতেন, এবং এইরূপ ব্যক্তিগণ যথেষ্ট উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন মনসবের অধিকারী হইয়াই তাঁহাদের কর্মজীবন শুরু করিতেন। পুনরায়, দেশের উচ্চ বংশীয় ভূস্বামী-গণকে—রাজপুত, আফগানী ও দক্ষিণ দেশীয় মুসলমান ইত্যাদি—কোনও প্রকারে মনসবদারী পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। মারাঠাগণকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তবে তাহা সফল হয় নাই। কালক্রমে মনসব্ ও জায়গীর দাবির পরিমাণ ও তীব্রতা প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল এবং অভিজাতশ্রেণীর এই প্রখর দাবির নিকট রাষ্ট্রকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে তদানীন্তন যুগের মনসব্ ও জায়গীর লাভের তীব্র প্রতিযোগিতার চাপ সুবর্ণিত আছে। মারাঠা ও জাঠ শক্তির অভ্যুত্থান, বুন্দেলখণ্ড ও রাজপুতানার অস্থিরতা ও নিয়মিত বিদ্রোহ এবং রাজ পরিষদের দলীয় চক্রান্ত আংশিকভাবে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও, মূল কারণ হিসাবে ইহাদের পশ্চাতে বিরাজ করিতেছিল ভূসম্পত্তি ও রাজ্যলাভের তীব্র ক্ষুধা, কারণ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থায়িত্ব জমি ও জায়গীর ভিন্ন অপর কোন উপায়ে অর্জন করা সম্ভব ছিল না। শাসক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দাবির নিকট শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে নতি স্বীকার করিতেই হইল এবং খালিসা ভূমিগুলি পর্যন্ত জায়গীর হিসাবে বিলি করিতে হইল। এই সকল ঘটনার ফলে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভাঙ্গন ও তাহারই আনুষঙ্গিক হিসাবে জায়গীরদারশ্রেণীর সর্বনাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সত্বেও, কয়েকজন অতি শক্তিশালী মনসবদার হয় তাঁহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, না হয় নিজেদের জন্য স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল রাজপুত রাজন্যবর্গকে জায়গীর-দারের পদমর্যাদায় অবনত করা হইয়াছিল, তাহারা মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতি বশ্যতা ত্যাগ করিয়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। অযোধ্যা, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণা-পথের শক্তিশালী রাজন্য বর্গ নিজেদের জন্য স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে ইজারা বিলির পুরাতন প্রথা পুনরায় প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক জুড়িয়া ইহার তাণ্ডবলীলা চালিয়াছিল। যদিও জায়গীর ভূমির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হারে এই প্রথার প্রচলন ছিল, খালিসা ভূমির ক্ষেত্রে ইহার প্রচলন সীমিত থাকিত এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই ইহার প্রচলন অনুমোদিত হইত। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর, খালিসা ও জায়গীর ভূমি উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে এই প্রথার প্রচলন হইয়াছিল। এই ঘটনায় ভূমি-রাজস্ব পরিচালন সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িল। জায়গীর

ভূমির ক্ষেত্রে উচ্চতর হারে জমা—যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় সংগ্রহ করা দুষ্কর—নির্ধারণ করার ফলেই এই প্রথার প্রচলন শুরু হয়। জায়গীর হইতে নির্ধারিত রাজস্বের মোট পরিমাণ সংগ্রহ করা যাইবে কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও প্রচুর অর্থ ও সময় অপব্যবহার করিয়া, স্বয়ং জায়গীর পরিচালন অপেক্ষা ইজারাদারের নিকট হইতে সীমিত হইলেও নিশ্চিত প্রাপ্তির অঙ্গীকার জায়গীরদারের নিকট অধিকতর সুবিবেচিত পন্থা বলিয়া মনে হইত। জমিদার ও কৃষকের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সমূহ ক্ষতিসাধন করিয়াছিল। রাজস্ব-ইজারা-পদ্ধতি এক শ্রেণীর মহাজন ও ফাট্কাবাজ সৃষ্টি করিল, যাঁহারা এই ব্যবস্থায় অর্থ লগ্নী করিয়া বংশানুক্রমিক জমিদারশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক মধ্যস্বত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এই নূতন শ্রেণীর অভ্যুদয়, স্বাভাবিক জমার অধিকহারে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিবার তীব্র প্রতিযোগিতার অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পরিবেশে বংশানুক্রমিক জমিদার প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইজারাদারের হার হইলে, অথবা জমিদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া আসিলে উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিত। বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই প্রথার মোট ফলাফল হইল, এক বৃহৎ সংখ্যক প্রাচীন বংশানুক্রমিক জমিদার-শ্রেণীর উচ্ছেদ। ইহাদের উৎখাত করিয়া শূন্য স্থান পূরণ করিতে আসিল দুইটি শ্রেণী ঃ পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী জমিদারবর্গ, যাঁহারা পুরাতন জমিদারির[২] ধ্বংসের উপর নিজস্ব তালুকদারি গঠন করিলেন অথবা নগর ও শহর হইতে আগত ধনী মহাজনশ্রেণী, যাঁহারা পুরাতন জমিদারশ্রেণী উচ্ছেদ করিয়া ভূ-সম্পত্তির প্রবাসী মালিক হিসাবে নিজদিগকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

জায়গীর ভূমির ইজারা প্রদান প্রথা, জায়গীরদারী পদ্ধতির সংকটের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তদানীন্তন যুগের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আবহাওয়ায় রাজস্ব-মন্ত্রক জায়গীরদারগণের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তবে খালিসা ভূমির ক্ষেত্রে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলন হইয়াছিল এবং ইহার মাধ্যমে মহাজনশ্রেণীর (এবং যাহারা নিজ স্বার্থে ঐ শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করিত) কায়েমী স্বার্থ দৃঢ়তর হইয়াছিল। রাজপরিষদের প্রিয়পাত্রগণের নেতৃত্বে কায়েমী স্বার্থ এই প্রথা রদ করিবার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল। তাঁহাদের চাপের নিকট দুর্বল চিত্ত সম্রাটগনকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং তাহার ফলে, সংস্কারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

আলোচনা সূত্রে আমরা অন্যত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে মোঘল যুগে প্রায় প্রতিটি মহালে ভূমি-রাজস্ব প্রদানকারী গ্রামীণ জমিদার বিদ্যমান ছিলেন। জমিদার যে জমির—তাহা খালিসা অথবা জায়গীর ভূমি যাহাই হউক—মালিকানা ভোগ করিতেন, রাজস্ব-মন্ত্রকের প্রচলিত আইনকানুন অনুযায়ী, সেই জমির উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব করিয়া রাজস্ব ধার্য করা হইত। মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে এই জমিদারশ্রেণী রাজস্ব সংগ্রহ ও তাহা প্রদান করিতেন;

কিন্তু এই জমিদারগণ, সামন্ত রাজন্যবর্গ—মোঘল ইতিবৃত্ত সমূহে ইঁহাদিগকে জমিদার বলিয়া অভিহিত করা হইলেও শ্রেণীগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। পরোক্ত জমিদারগণ অথবা সামন্ত রাজন্যবর্গ নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদান করিতেন অথবা তাঁহাদিগকে জমিদারি বিলি করা হইত। ভূমি-রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারগণ ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব ভোগ করিতেন। ১৭শ ও ১৮শ শতকে গ্রামের কৃষিভিত্তিক সমাজে তাহাদের স্থান পূর্বাপর একই ছিল। তবে, নাসাক্ বা সমবায় ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করিবার প্রথাটি প্রচলিত থাকায় পরগনায় কয়েকজন জমিদারের—পরগনার সমগ্র জমা ক্ষুদ্র জমিদারগণের ভূ-সম্পত্তির উপর চাপাইয়া দিবার অধিকার যাঁহাদের প্রদান করা হইয়াছিল এবং যাঁহারা এই প্রথার সুযোগে ক্ষুদ্র জমিদারবর্গের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধি করিতেন—তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু রাজস্ব-ইজারা-প্রদান পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলনের ফলে, নাসাক্ প্রথায় তাঁহারা যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেন, তাহা হইতে অনেকাংশেই বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। ইজারা প্রথায় গ্রামীণ জমিদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্বাভাবিক জমা হইতে উচ্চহারে রাজস্ব প্রদানে সম্মত হইয়া ভূ-সম্পত্তি অধিকার করিবার যে তীব্র প্রতিযোগিতা ইজারাদার ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রতিযোগিতায় প্রাচীন ও বংশানুক্রমিক জমিদারশ্রেণীর বহু পরিবার বিনষ্ট হইয়া যায়। উত্তর প্রদেশের সরকারী মহাফেজখানায় (এলাহাবাদ) রক্ষিত এক বিরাট সংখ্যক বিক্রয় কবালা হইতে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যাপকহারে জমিদারী স্বত্ব বিক্রয় করা হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইজারা প্রথা ক্ষুদ্র জমিদার বর্গের বিনাশসাধন করিয়াছিল। তবে, বৃহৎ ও শক্তিশালী জমিদারশ্রেণীর ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজস্ব সংগ্রহ কর্মে যোগ্য ও শক্তিশালী স্থানীয় পুলিস বা সৈন্যবাহিনী পালন করিবার মত আর্থিক ক্ষমতার অভাবে কোন শক্তিশালী জমিদার স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, ঐ কর্মচারীর পক্ষে, এমন কি, স্বাভাবিক সময়েও জমা সংগ্রহ করা দুষ্কর হইত। তদানীন্তন যুগের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আবহাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাইবার আশা না থাকায়, স্থানীয়, সুলভ সঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়াই ঐ কর্মচারীকে তাঁহার পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইত। সুতরাং এই অবস্থায় শক্তিশালী জমিদারের উপর বল প্রয়োগের ব্যর্থ প্রচেষ্টা হইতে তাঁহার সহিত আপস করা স্থানীয় কর্মচারী যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন। শহর হইতে আগত কোন ইজারাদার বা পার্শ্ববর্তী কোন জমিদার ঐ জমিদারের ইজারা স্বত্ব গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন না। অপরপক্ষে একজন শক্তিশালী জমিদার ক্ষুদ্র জমিদারের অধিকারভুক্ত গ্রামগুলি ইজারা সত্বে দখল করিতে পারিতেন এবং সম্ভব হইলে প্রকৃত মূল্য হইতে স্বল্প হারে ঐ গ্রামগুলি ক্রয় করিয়া লইবার মতলব করিতেন।

গ্রাম হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর মাদাদ্-মাস্ ভূমি প্রদান পদ্ধতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিভিন্ন এলাকায় প্রভাবসম্পন্ন মণ্ডল অথবা অঞ্চল গঠন করার উদ্দেশ্যেই মুসলিমদের, বিশেষতঃ শেখ ও সৈয়দ বংশীয়দের মধ্যে করমুক্ত জমি বিলি করার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল; কারণ রাষ্ট্র তাঁহাদের আনুগত্যের উপর সর্বদাই নির্ভর করিতে পারিত। রাজস্বমুক্ত জমির মুসলিম গ্রহীতাগণ দূরান্তরের গ্রামগুলিতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারা স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মনে হয়, একদিকে অন্যায় দাবি ও অন্যান্য ধরনের উৎপীড়ন হইতে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর তাঁহারা তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেন; অপরদিকে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষকে নির্ভরযোগ্য সংবাদ তাঁহাদের পরিবেশন করিতে হইত। আর্থিক দিক হইতে, এই প্রথা সমগ্র দেশ জুড়িয়া এক শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাঁহারা জীবিকা অর্জনের জন্য জমিদার শ্রেণীর মত জমির উদ্বৃত্ত পণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সাধারণতঃ মাদাদ্-মাস্ গ্রহীতাগণকে কর প্রদান হইতে রেহাই দেওয়া হইত। কিন্তু এই দানের পরিমাণ সাধারণতঃ স্বল্প হওয়ায়, আর্থিক অবস্থার দিক হইতে তাঁহারা গ্রামীণ জমিদারের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। এরূপ তথ্য পাওয়া যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মাদাদ্-মাস্ ভূমি গ্রহীতাগণ জমিদার শ্রেণীর মত, জমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার অধিকার ভোগ করিতেন। মাদাদ্-মাস্ স্বত্বের উপর উত্তরাধিকারীর দাবি ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিল (অবশ্য এই দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্নবীকরণ ও অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল)। তবে মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কয়েক প্রকারের মাদাদ্-মাস্ ভূমি, জমিদারী ভূমির অনুরূপ চরিত্র ধারণ করিয়াছিল এবং এইরূপ জমি হইতে রাজস্ব আদায় করা হইত। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই সংস্থাটি জমিদারী সংস্থার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। অবশ্য, এখানে এইরূপ ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে না যে, ১৮শ শতকের সকল মুসলিম জমিদারই অবশ্যম্ভাবীরূপে মাদাদ্-মাস্ ভূমি গ্রহীতা বা তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। মুসলিম জমিদারগণও ক্রয়ের ও কোন কোন সময় ইজারা স্বত্বের রূপান্তরের মাধ্যমে জমিদারী স্বত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে ১৮শ শতকের মধ্যকালে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাদাদ্মাস্ ভূমি যথেচ্ছ ভাবে জমিদারী ভূমির মত ব্যবহৃত হইত এবং জমিদার ও মাদাদ্-মাস্ ভূমি গ্রহীতার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হইত না।

সামাজিক দিক হইতে এই সংস্থা গ্রামীণ মানুষের মনে ধর্মীয় উদারতা সঞ্চার করিয়াছিল। দেশের অভ্যন্তরে মুসলিমগণ বসতি স্থাপন করিয়া গ্রামীণ হিন্দু অধিবাসীগণের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল মুসলিমগণ মূলতঃ তাঁহাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতি বজায় রাখিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও স্থানীয় রীতি তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং তাহারা স্থানীয় উৎসবাদিতে যোগদান করিতে শুরু করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় ধর্ম ও রীতি নীতিতে আস্থাবান হইয়া যে তাঁহারা এইরূপ যোগদান করিতেন তাহা নহে। ইহার কারণ, এইরূপ যোগদান করিয়া তাঁহারা সেই সকল প্রতিবেশীর আনন্দে অংশীদার হইতেন, যাঁহাদের ধর্ম বিশ্বাস ভিন্ন হইলেও গ্রামজীবনের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা আজীবন একযোগে করিতে হইত। অনুরূপভাবে গ্রামের সরল হিন্দু অধিবাসী, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানিতে পারিলেন। ক্রমশঃ হিন্দু অধিবাসীগণ মুসলিম চরিত্র সম্পর্কে পূর্বপুরুষগণের—যাঁহারা মুসলিম বলিতে তুর্কী, ম্লেচ্ছ, অত্যাচারী ও অপবিত্র মনে করিতেন—তাঁহাদের আহৃত সেই ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে মুসলিমগণকে অধার্মিক বলা চলে না। ইহার ফলে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই ধর্মীয় সম্পর্কে এক সুদৃঢ় উদারতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভারতীয় গ্রামের সীমিত অথচ ঘনিষ্ঠ পরিবেশে গ্রামবাসীর উভয় অংশকে যে সকল সাধারণ সমস্যা ও চাহিদার সম্মুখীন হইতে হইত, তাহার তাগিদেই এই উদারতার সৃষ্টি হইয়াছিল। মাদাদ্-মাস্ জমি বিলির প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় উদারতার যে মনোভাব গ্রাম-ভারতে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য বর্তমান যুগেও সযত্নে পালিত হয়।

আওরঙ্গজেবের আমলে, নাসাক্ বা সমবায় ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্যের প্রথা, রাজস্ব ধার্যের সাধারণ প্রথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও সেই স্বীকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত কৃষকের ভূ-সম্পত্তির পরিবর্তে সমগ্র গ্রাম বা টপ্পা অথবা পরগনাকে রাজস্ব ধার্যের একক বলিয়া গণ্য করা হইত। এই পদ্ধতিতে ধার্য রাজস্বের বণ্টন সেই সকল বৃহৎ জমিদার বা তালুকদারের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, যাঁহারা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রদান করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতেন। ইহার দ্বারা বৃহৎ জমিদার ও ইজারাদারগণ ক্ষুদ্র জমিদারগণের উপর রাজস্বের হার বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা লাভ করিতেন এবং ক্ষুদ্র জমিদারগণ করের বোঝা কৃষকের উপর চাপাইয়া মুক্তি লাভ করিতেন। ফলে, তাঁহার ভূ-সম্পত্তির উপর যে পরিমাণ রাজস্ব স্বাভাবিকভাবে ধার্য করা উচিত ছিল, তাহার অধিক কৃষককে প্রদান করিতে হইত।

রাজস্ব ধার্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে জবত্-এর পরিবর্তে নাসাক্ প্রথার প্রচলন হইতে বোঝা যায় যে প্রশাসনিক যন্ত্র সর্বস্তরে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জবত্ প্রথা পরিমাপ সংক্রান্ত কর্মের জন্য প্রচুর অর্থের এবং বহু দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হইত। বিশ্বাসী কর্মচারীর অভাবে জবত্ প্রথায় নানাবিধ দুর্নীতি ঢুকিয়া সংশ্লিষ্ট সকল দলের অসুবিধার সৃষ্টি করিত এবং সেই কারণে সাধারণভাবে ইহাকে লোকে অপছন্দ করিত। অপরপক্ষে, পূর্ববর্তী কালের দলিল পত্রাদির ভিত্তিতে গঠিত হওয়ায়, নাসাক্ প্রথা অপেক্ষাকৃত সরল

হইত এবং ইহার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভারের প্রয়োজন হইত না। প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল হইয়া পড়ায়, যথোচিত সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইত না, স্বাভাবিকভাবেই রাজস্ব ধার্য পদ্ধতি হিসাবে নাসাক্ প্রথাই সর্বাধিক সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইত; সেই কারণেই—যদিও ইহার দ্বারা রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগতভাবে জমিদারের পরিবর্তে মধ্যস্বত্বভোগীগণই অধিকতর উপকৃত হইতেন—সাধারণভাবে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রেণীগত ভাবে নিজস্ব স্বার্থে মধ্যস্বত্বভোগী নাসাক্ প্রথাকে রাজস্ব নির্ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করিতেন। পরিমাপ সংক্রান্ত কর্মসমূহ যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য হওয়ায় এবং মধ্যস্বত্বভোগীগণের প্রভাবের ফলে সরকারী কর্মচারীগণও ক্রমশঃ নাসাক্ প্রথার সপক্ষে আসিয়াছিলেন।

প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে একথা মনে হয় না যে, রাজস্ব মন্ত্রক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকের মত, আলোচ্য যুগেও এই পরিমাণ উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ হইতে অর্ধাংশের মধ্যে নির্ধারিত হইত। তবে আলোচ্য যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা (যথা নাসাক্ বা সমবায় প্রথায় রাজস্ব নিরূপণ, রাজস্বের ইজারা দান এবং বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক শিথিলতা একযোগে কৃষকের—বিশেষ করিয়া রায়তি মহালের কৃষকের—বোঝার ভার বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

পাদটীক

১. সামন্ততান্ত্রিক বলিতে ইহানে [illegible] কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইতেছে:

(ক) রাজস্ব-স্বত্ব বিলির মাধ্যমে [illegible] শাসক দেওয়া হইলেও মনসবদারগণের জমিতে কিছু ভোগ-স্বত্ব ছিল [illegible] উৎপন্ন আত্মসাৎ করিয়াই তাঁহারা জীবনযাপন করিতেন।

(খ) বাস্তবে দেশের অভিজাত ও জমিদার [illegible] উপর বংশগত অধিকার এই পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

২. বৃটিশ দলিলপত্রাদি অনুধাবন করিলে [illegible] যে অযোধ্যা প্রদেশের অধিকাংশ তালুকদারগণই ইজারাদার-শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট 'ক'

অষ্টাদশ শতকে গ্রামসমূহ দুইটি ভাগে তালিকাভুক্ত হইত, একদিকে থাকিত আসলী ও দখলী এবং অপরদিকে রায়তি ও তালুক। প্রথম অধ্যায়ে এই সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন আমরা কয়েকটি সাক্ষ্যের বিশদ পর্যালোচনা করিব, যেগুলি রায়তি ও তালুক সংজ্ঞা দুইটি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করে।

সিয়াক্‌নামা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে ফতেপুর পরগনার অন্তর্গত সতেরটি গ্রামের মধ্যে আটটি ছিল রায়তি এবং নয়টি তালুক গ্রাম। এই আটটি গ্রামের মধ্যে দুইটি গ্রাম আয়েমা স্বত্বে দখল করা হইয়াছিল, দুইটি ছিল পরিত্যক্ত এবং আসলী ও দখলী মিলাইয়া কেবলমাত্র চারটি গ্রামের রাজস্ব ৬৫৯ টাকা জমায় নিরূপিত হইয়াছিল। যে দুইটি আসলী ও রায়তি গ্রামের কথা বলা হইয়াছে সেগুলি গণেশপুর এবং ভবানীপুর[১]। আমরা ইহাও জানিতে পারি যে গণেশপুরের রাজস্ব জব্‌ত্‌ প্রথা অনুযায়ী নিরূপিত হইয়াছিল এবং রামচাঁদ ভবানীপুরের রাজস্ব প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, রায়তি গ্রামে এক অথবা একাধিক ব্যক্তি ভূমি-রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিতেন। ঐ গ্রন্থের অপর একটি দলিলে গণেশপুর গ্রামের জমা, সংগৃহীত রাজস্ব এবং বকেয়া পাওনার হিসাব দেখানো হইয়াছে। উক্ত হিসাবে মিন্‌জালিক শিরোনামায় একটি দফা লিখিত আছে। হিসাবনিকাশের ফর্দে ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিত প্রকৃত সংগৃহীত রাজস্ব এবং যাহা সংগৃহীত হইলেও করোরী বা ফতাদারের নিকট জমা না পড়িয়া, কোন ব্যক্তির দস্তুরি বা বেতন হিসাবে ব্যয় করা হইয়াছে। মিন্‌জালিক খাতে ১০৪ টাকা জমা অর্থের পরিমাণ নিম্নলিখিত হিসাব অনুযায়ী দেখানো হইয়াছে ঃ

(ক)	ফতাদারের নিকট গচ্ছিত নগদ অর্থ—	৮৪ টাকা
(খ)	নান্‌কার-ভাতা (জমা হইতে প্রদান করা হইয়াছে)	২০ টাকা
	মোট বাট্টা	১০৪ টাকা

বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়টি হইল এই যে, রায়তি, গ্রামেও এরূপ কিছু ব্যক্তি ছিলেন, নান্‌কার স্বত্বেও যাঁহাদের অধিকার স্বীকৃত ছিল এবং সাধারণ কৃষক হইতে যাঁহাদের সামাজিক পদমর্যাদা পৃথক বলিয়া গণ্য হইত। জমা অথবা উৎপন্নের উপর সরকারের প্রাপ্যাংশ হইতে ইঁহাদের ভাতা প্রদান করা হইত। গণেশপুরের জমা বা ভূমি-রাজস্ব, সংগৃহীত অর্থ ও বকেয়া পাওনার যে পাটোয়ারী হিসাবপত্র আছে তাহার অনুবাদ হইতে জানা যায় যে, ঐ গ্রামের বকেয়া পাওনার পরিমাণ ৮৪ টাকা ৭ আনা। ইহার মধ্যে খোরাক-ই-মোকাদ্দামান বা মোকাদ্দামের[২] দৈনিক ভাতা বাবদ ধার হইয়াছে ৪ টাকা ৭ আনা। (এই সকল তথ্যগুলি একত্রে সন্নিবেশ করিলে দেখা যায় যে, গণেশপুর ছিল রায়তি গ্রাম এবং সেই গ্রামে একাধিক মোকাদ্দাম ছিলেন ও কিছু ব্যক্তিকে—যাহাদের নাম হিসাবের ফর্দে থাকিত না—নান্‌কার ভাতা

হ করা হইত। উপরন্তু একাধিক ব্যক্তি গ্রামের ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতেন বলিয়া মনে হয়। আলোচনার বর্তমান স্তরে, মোকাদ্দামগণকে নানকার ভাতা প্রাপ্যকারী ব্যক্তি বলিয়া সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু অপর এক আকর গ্রন্থের[৩] তথ্যানুযায়ী একথা অনুমান করা যায় যে কৃষি-কর্ম এবং রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে, মোকাদ্দাম ও জমিদারগণকে নানকার ভাতা প্রদান করা হইত। সুতরাং রায়তি গ্রামে যে জমিদার থাকিতেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

সম্ভবতঃ বিহার প্রদেশে রচিত হিদায়াৎ-উল্-কাওয়াদ নামক প্রশাসনিক সার গ্রন্থে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য আমাদের অনুমান প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করে। এই সাক্ষ্য গ্রন্থের দুইটি ভিন্ন অংশ, এক অংশে জায়গীর বিলি এবং অপর অংশে রায়তি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে ভূমি সম্পর্কীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। প্রথম অংশ[৪] হইতে জানা যায় যে, জায়গীর বিলির পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সমূহ স্থূল হিসাবে, তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথাঃ মহাল-ই-জোর তলব, মহাল ই-আউসাত্ এবং মহাল ই-রায়তি। মনসব্দারগণকেও নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিলঃ (১) নাজিম, (২) দেওয়ান, বক্সী ও অন্যান্য উচ্চ পদমর্যাদার মনসব্দার এবং (৩) ক্ষুদ্র মনসব্দার। আলোচ্য সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূমি সম্পর্কীয় ব্যবস্থার সহিত বিভিন্ন স্তরের রাজকর্মচারীগণকে জায়গীর বাবদ প্রদত্ত অঞ্চলগুলির সম্পর্ক স্পষ্ট ছিল। যে সকল মহালের ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রায়শঃই বল প্রয়োগ অথবা বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করিতে হইত, সেই সকল মহালগুলি যথেষ্ট সামরিক ক্ষমতা সম্পন্ন মনসব্দারগণকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হইত। এই ধরনের অঞ্চলগুলি জোর তলব[৫] ও আউসত্ বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষুদ্র মনসব্দারগণকে—যাঁহাদের সামরিক ক্ষমতা স্বল্পই ছিল—এরূপ অঞ্চল বা মহাল জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হইত, যাহার রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইত না। এই সকল অঞ্চল রায়তি বলিয়া পরিচিত ছিল। মনে হয়, নিম্নলিখিত কারণগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছিলঃ (১) ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রকার ভেদ; (২) রাজস্ব বন্দোবস্তের রীতি (নির্দিষ্ট করদান বাবদ অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তিতে); (৩) কতগুলি গ্রামের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি রাজস্ব চুক্তিতে আবদ্ধ; (৪) জাতিগত চরিত্র; (৫) সরকার ও স্থানীয় সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব। এই সকল কারণে, রায়তি বন্দোবস্ত সেইরূপ অঞ্চলেই করা হইত, যে সকল অঞ্চল হইতে ক্ষুদ্র মনসব্দার বিনা বল প্রয়োগে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইতেন। এইরূপ অঞ্চলে যাঁহারা রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেন, তাঁহাদের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অতি স্বল্প হওয়ায়, একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদারের গোমস্তার আদেশ অমান্য করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

অতঃপর, আমাদের গবেষণার বিষয়, রায়তি গ্রামে কাহারা রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেন ? তাহারা কি সাধারণ কৃষক বা আসামী অথবা এক শ্রেণীর জমিদার যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিতেন ? "জমিদারির পথে" এই শিরোনামায় হিদায়াৎ-উল-কাওয়াদ্ গ্রন্থের একটি অংশে আমাদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। এই অংশে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে জোরতল্‌ব্ ও রায়তি অঞ্চল সমূহের ভূমি সংক্রান্ত অবস্থার একটি বিবরণ আছে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি স্বল্প পদমর্যাদার মন্‌সব্‌দারগণকে—যাঁহাদের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য স্বল্প সংখ্যক সৈন্যবাহিনী পোষণ করিবার ক্ষমতা ছিল, তাঁহাদের দেওয়া হইত। যাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন, রাজস্ব প্রদান করিতে অসম্মত হইতেন এবং বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকি ব্যতিরেকে যাঁহাদের বশীভূত করা যাইত না, স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে তাঁহাদের দমন করা সম্ভব হইত না। এই সকল কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত পদোন্নতির লোভে, বর্ধিত হারে জমা প্রদর্শন করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। ফলে, ইঁহারা (ক্ষুদ্র) জমিদারগণের অধিকৃত ভূ-সম্পত্তির সকল প্রকার সম্ভাব্য সম্পদ নির্ণয় করিয়া তাঁহাদের উপর অত্যধিক হারে রাজস্ব নিরূপণ করিতেন। আবার জমিদারগণও করের বোঝা রায়তের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতেন এবং রায়তের পক্ষ হইতে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিত। উৎপীড়ন চরমে উঠিলে, মুল্‌ক-ই-রায়তি এলাকা ত্যাগ করিয়া রায়ত জোরতল্‌ব্ জমিদারের অন্তর্গত এলাকায় (মুলক্) বসতি স্থাপন করিতেন। ইহার ফলে, জোরতল্‌ব্ জমিদারের এলাকাগুলি ঘনবসতিপূর্ণ, সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ক্ষুদ্র রায়তি জমিদারশ্রেণী চরম আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হন। তাঁহারা ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে অক্ষম হন এবং জমিদারী পদমর্যাদা অপমানজনক হইয়া ওঠে।[৬]

সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, মুলক্-ই-রায়তি ও মহাল ই-রায়তি বলিতে একাধিক গ্রামের সমবায় বোঝান হইত। এই সকল সমবায় গুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিতে ক্ষুদ্র জমিদারগণ চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন ; এবং সেই শ্রেণীর জমিদার হইতে—যাঁহারা জোর তল্‌ব্ নামে খ্যাত ছিলেন এবং যাঁহারা কেবলমাত্র বল প্রয়োগ অথবা বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শনেই ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হইতেন—পৃথক করিবার জন্য ইঁহাদের রায়তি জমিদার বলা হইত। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এইরূপ জমিদারগণ সাধারণতঃ একাধিক গ্রাম, এক অথবা একাধিক পরগনারও মালিকানা ভোগ করিতেন। হয়ত, ইঁহাদের কিছু সংখ্যক জমিদার মাল-ওয়াজিব বা ভূমি-রাজস্বের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেশকাশ প্রদান করিতেন। আলোচ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা এরূপও অনুমান করিতে পারি যে, রায়তি গ্রামে কৃষক বা রায়ত ভূমি-রাজস্ব প্রদানে চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন না ; কৃষিকর্মে নিয়োজিত জমির জন্য তাঁহারা উৎপন্নের একাংশ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদান করিতেন এবং এই পরিমাণ নির্ধারিত হইত, তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের জমিদারের চুক্তির মারফৎ। ভূমি-রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধিতে জমিদারই সর্বপ্রথম উদবিগ্ন হইতেন।

এই প্রশ্ন সংক্রান্ত যে সকল তথ্য মিরাট-ই-আহমদি গ্রন্থ ও তাহার ক্রোড়পত্রে[৭] উল্লিখিত আছে, আমরা এক্ষণে সে সকল তথ্য আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মোটামুটিভাবে গুজরাটে তিন প্রকার গ্রাম ছিল, যথা : ইজ্মি বা উমদাহ্ জমিদারের—যিনি এক বা একাধিক পরগনার মালিকানা ভোগ করিতেন—জমিদারী বা তালুক অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সমূহ। এইগুলিকে ঘায়ের আসালি গ্রাম—অর্থাৎ সেইরূপ গ্রাম যেখানে মোঘল সরকার সরাসরি জমির উপর ভূমি-রাজস্ব ধার্য করিতেন না—বলা হইত। তবে, এই সকল জমিদারগণকে হয় পেশকাশ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, না হয় পেশকাশের পরিবর্তে সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, বান্থ্ প্রথায় অর্জিত জমিদারের তালুকে যে সকল গ্রাম থাকিত। এই সকল গ্রামের এক-চতুর্থাংশ ভূমি (অথবা সময় সময় রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) কোলি অথবা রাজপুত জমিদারগণ দাবি করিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এইরূপ গ্রাম বা গ্রামের জমির জন্য সালামি বা পেশকাশ বাবদ নামমাত্র কর আদায় করা হইত। এই সকল তালুকের সীমানার বাহিরে যে জমি বা গ্রাম ছিল, তাহাদের যথাক্রমে তলপদ ও দেহাৎ-ই-রায়াত বলা হইত। সরকার এই সকল জমি ও গ্রাম পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ এই সবল অঞ্চলে ও গ্রামে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে কার্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং যে সকল ব্যক্তি জমি দখল করিতেন অথবা জমির মালিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতেন, তাঁহাদের সহিত সরকারী কর্মচারীগণ কারবার করিতেন। ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ প্রসঙ্গে মিরাট-ই-আহমাদ গ্রন্থে উল্লিখিত ফারমানে স্পষ্টভাবে যাঁহাদের মালিক বলা হইয়াছে, তাঁহাদের পরিচয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার পূর্বে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তলপদ-ভূমি সমূহ রায়তি গ্রামের অন্তভুক্ত ছিল। তবে বান্থ্ গ্রহীতাগণের অধিকৃত গ্রামেও কিছু তলপদ-ভূমি থাকিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে এবং সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের গ্রামগুলিকে রায়াত গ্রাম বলা চলিত না।

সুতরাং একথা বলা চলে যে, গুজরাটে সেই গ্রামগুলিকেই রায়তি বলা হইত, যেগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর জমিদারের অধিকৃত তালুক বহির্ভূত ছিল এবং সেই সকল গ্রামের ক্ষেত্রে, ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে পারণত হইত। আমরা এখন পর্যন্ত এই সকল গ্রামের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আলোচনা করি নাই : কোন ধরনের কৃষক জমি কর্ষণ করিতেন ; গ্রামের কৃষি-ভিত্তিক সমাজে একাধিক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন কিনা ; কৃষি-ভিত্তিক সমাজের কোন বিশিষ্ট অংশের গ্রামবাসী অপরাপর অংশের তুলনায় জমিতে উচ্চতর স্বত্ব ভোগ করিতেন কিনা ; এবং ভূমি-রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি নিছক খাস্তকার বা আসামী বলিতে যাহা বুঝাইত সেইরূপ একজন সাধারণ কৃষক অথবা জমিতে উচ্চতর স্বত্বভোগী ছিলেন কিনা। এই সকল প্রশ্নের অনুসন্ধান

করিলে রায়তি গ্রাম সম্পর্কে এবং মোঘল আমলে ভূমি সম্পর্কিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে, মিরাট-ই আহমদ[৮] গ্রন্থে উল্লিখিত, আওরঙ্গজেবের একটি ফারমান হইতে রায়তি গ্রামের অভ্যন্তরীণ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়।

ফারমানের প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদগুলি অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, গ্রামের কৃষিভিত্তিক সমাজে অন্ততঃ দুই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন: রাইয়া বা সাধারণ কৃষক, উত্তর ভারতে যাঁহাদের আসামী বা খাস্তকার বলা হয়। তাঁহারা কৃষি কর্ম করিতেন এবং সম্ভবতঃ জমি হস্তান্তরের স্বত্ব ভোগ করিতেন না। অন্ততঃ নিয়মাবলীতে এইরূপ হস্তান্তরের কোনও উল্লেখ নাই। ফারমানে আরাবাব-ই-জিরাতএর—যাহার প্রকৃত অর্থ হইল ক্ষেত-খামারের মালিক বা কৃষক—উল্লেখও আছে। কিন্তু, এই শ্রেণীর স্বত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করা হয় নাই। মনে হয় এই শব্দটি সাধারণভাবে কৃষিকর্মে নিযুক্ত সকলের ক্ষেত্রেই—রাইয়া (সাধারণ কৃষক) অথবা সেইরূপ কৃষক যিনি কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকিলেও জমির উপর কয়েকটি স্বত্ব ভোগ করিতেন—প্রযোজ্য হইত। কৃষি-ভিত্তিক সমাজের অপর এক অংশকে মালিক ও আরবাব-ই-জমিন বলা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা ভূস্বামী বোঝানো হইয়াছে। প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যের বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এই দুইটি পদ সমার্থক। জমির নিম্নলিখিত স্বত্ব ও অধিকার মালিক ভোগ করিতেন:

(১) জমি কর্ষণ না করিলেও এবং মালিক হিসাবে নিরূপিত জমির ধার্য ভূমি-রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে তিনি আবদ্ধ না হইলেও উৎপন্নের উপর তাঁহার দাবি থাকিত। উপরোক্ত ব্যবস্থায় তাঁহার প্রাপ্য অংশের পরিমাণ দাঁড়াইত, মালিক হিসাবে উৎপন্নে তাঁহার মূল প্রাপ্য যাহা ছিল এবং ভূমি রাজস্ব হিসাবে সরকার যাহা পাইতেন, সেই দুই অঙ্কের বিয়োগফল।

(২) সাময়িকভাবে ভূমি-রাজস্ব প্রদান না করিলেও, জমি কর্ষণ অথবা পরিচালন করিবার পুনরাধিকার তাঁহার থাকিত।

(৩) জমি অথবা জমির মালিকানা স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার তিনি ভোগ করিতেন।

(৪) তিনি জমি বন্ধকী রাখিতে পারিতেন।

(৫) মালিকানা স্বত্ব বংশানুক্রমে বর্তাইত।

প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যের উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসার হইতে দেখা যায় যে, ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর এবং ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিবার অধিকার মালিক ভোগ করিতেন; উপরন্তু, এই পদটি কৃষি-ভিত্তিক সমাজের এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল—যথা, দিল্লী, আজমীর, অযোধ্যা, বিহার ও বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত দলিল পত্রাদিতে এবং বিভিন্ন ইতিবৃত্তে উল্লিখিত সাক্ষ্যাদি স্বতন্ত্র ও প্রত্যক্ষভাবে আমাদের উক্ত অনুমানগুলি সমর্থন করে। জমিদার ও জমিদারী সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে

শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, ভূসম্পত্তির হস্তান্তরের স্বত্ব, বিভিন্নভাবে বিশওয়াই, সাতারাহি, মিলকিয়াত্, জমিদারি, মালিকানা ও মোকাদ্দামী (ভূমি রাজস্ব প্রদানের অধিকার সহ) নামে আমাদের দলিল পত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই সকল স্বত্বাধিকারীগণকে জমিদার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বে আলোচিত ফারমানে উল্লিখিত মালিকগণের ন্যায়, এই সকল জমিদার—সাময়িকভাবে জমিতে কর্ষণের কর্মে লিপ্ত না থাকিলে বা ভূমি-রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইলেও—মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন। এই সকল ঘটনার সামগ্রিক বিচারে নিম্নলিখিত একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ফারমানের ভিত্তিতে যে সকল অধিকার মালিক ভোগ করিতেন, সেইগুলি মূলতঃ, জমিদার বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তিগণের—যাঁহারা পুঙ্খানপুঙ্খভাবে নিরূপিত ভূমি-রাজস্ব প্রদানের অধিকার সহ জমি হস্তান্তরের কয়েকটি স্বত্ব ভোগ করিতেন—প্রদত্ত অধিকারের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। আমরা জানি মালিকের অধিকারভুক্ত জমির উপরেও এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব আরোপ করা হইত। সুতরাং মালিককে জমিদার বলিয়া সনাক্ত করিবার এবং জমিদারেরই অপর একটি প্রতিশব্দ মালিক, এই কথা অনুমান করিবার পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। কিন্তু, এই দুইটি পদ অভিন্ন, এই অনুমান আমরা জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে অপারগ, কারণ জমিদার হইতে মালিক পদটি বোধহয় অধিকতর সামগ্রিক ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। এক বিশেষ শ্রেণীর জমিদার বলিতে যাহা বুঝাইত, মালিক বলিতেও তাহাই বুঝাইত; উপরন্তু, মালিক বলিতে জমিদার ব্যতিরেকে, এরূপ ব্যক্তিকেও বুঝাইত, যিনি জমিদারের সর্বপ্রকার অধিকার—ভিন্ন নামে হইলেও—ভোগ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, রাজপুতানার পাট্টায়াট ও গিরসিয়া এবং দাক্ষিণাত্যের পুলিগরশ্রেণী, নামে ভিন্ন হইলেও, মূলতঃ গ্রামীণ জমিদার ছিলেন। গুজরাট প্রদেশে যাঁহারা মালিকের ন্যায় জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন, তাঁহাদের জমিদার বা অপর কোন আখ্যা ছিল কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। এরূপ কোন লিখিত তথ্যাদি আমাদের গোচরে আসে নাই, যাহার সাহায্যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করা যায়। স্থানীয় অনুসন্ধানের ফলে, প্রয়োজনীয় আবশ্যিক তথ্যাদির সন্ধান মিলিতে পারে এবং নূতন তথ্যাদির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত, কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে না আসাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে, পূর্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্তসার এইভাবে করা চলিতে পারে :

(১) রায়তি গ্রামগুলি, সেই সকল জমিদারের তালুক বহির্ভূত ছিল, যাঁহারা পেশকাশ প্রদান করিতেন অথবা বানৃথ্ প্রথায় তালুক দখল করিতেন।

(২) এই সকল রায়তি গ্রামে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ সংক্রান্ত রাজাদেশাবলী সম্পূর্ণ বলবৎ থাকিত।

(৩) এই সকল গ্রামের অন্তর্ভুক্ত কৃষিভিত্তিক সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন যাঁহারা ভূমি-রাজস্ব প্রদানের অধিকার সহ জমি হস্তান্তরের কয়েকটি স্বত্ব

ভোগ করিতেন ; কিন্তু রাইয়া নামে পরিচিত এই সমাজের অপর এক শ্রেণী ঐ সকল স্বত্ব হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের দলিল পত্রাদি, ইতিবৃত্ত ও প্রশাসনিক সার গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির উপর আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই সকল তথ্য পরস্পর পরস্পরের অনুমোদন করে এবং ইহার সাহায্যে—যে পর্যন্ত না আমাদের এই অনুমানের সপক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যাইতেছে —রায়তি গ্রামের চরিত্র সম্পর্কে এক পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আপাততঃ, রায়তি গ্রামের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সারাংশ এইভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ

(১) সেই সকল অঞ্চল বা গ্রামসমষ্টি মুলক্-ই-রায়তি, মহাল-ই-রায়তি বা দেহাত-ই-রায়তি বলিয়া গণ্য হইত, যে সকল অঞ্চলে এক বিশেষ শ্রেণীর জমিদার তাঁহাদের ভূসম্পত্তি বা জমিদারির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরূপিত ধার্য রাজস্ব প্রদান করিবার স্বত্ব সহ ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তরের কয়েকটি স্বত্ব ভোগ করিতেন।

(২) হিদায়ৎ-উল্-কাওয়াদ্ নামক এক সমকালীন গ্রন্থে, তাঁহাদের রায়তি জমিদার বলা হইয়াছে।

(৩) রায়তি গ্রাম নামকরণ হইতে এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই, যে উক্ত গ্রামের সাধারণ ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তরের অথবা ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিবার অধিকার ভোগ করিতেন।

পূর্ববর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে যে, তালুক বলিতে রায়তি গ্রামের পরিবর্তে সেই সকল গ্রাম বুঝানো হইত, পেশকাশ প্রদানের শর্তে অথবা মোঘল সম্রাটকে সামরিক সাহায্য দানের বিনিময়ে জায়গীর হিসাবে যে গ্রাম-গুলির দখলি স্বত্ব জমিদারগণ ভোগ করিতেন। বান্থ্ প্রথায় অর্জিত গ্রাম-গুলিকেও তালুক বলা হইত। এইরূপ গ্রামগুলি হয় সম্পূর্ণভাবে ভূমি-রাজস্ব মুক্ত থাকিত, নতুবা পেশকাশ হিসাবে নামমাত্র কর প্রদানের পরিবর্তে এইরূপ গ্রামের এক-চতুর্থাংশ জমি বান্থ্-গ্রহীতাগণ ভোগ করিতেন। সিয়াকনামা গ্রন্থে তালুক পদটি যেভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে কেবল মাত্র এই তথ্যই পাওয়া যায় যে, পরগনার অন্তর্ভুক্ত সতেরটি গ্রামের মধ্যে আটটি রায়তি গ্রাম ও নয়টি ছিল তালুক গ্রাম। উক্ত দুই পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি অবিভক্ত গ্রাম আয়েমা স্বত্বে ভোগ করা হইত। নয়টি তালুক গ্রামের মধ্যে চারটি গ্রাম আয়েমা স্বত্বে ভোগ করা হইত এবং কেবলমাত্র পাঁচটি গ্রামের জমা ১৬০০ টাকা ধার্য করা হইয়াছিল। এরূপ কোন তথ্য নাই, যাহার সাহায্যে বলা যায় যে তালুক গ্রাম সেই সকল জমিদারের অধিকারে ছিল, যাঁহারা পেশকাশ প্রদান করিতেন অথবা বান্থ্-গ্রহীতা ছিলেন। অপরপক্ষে আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, রায়তি গ্রামের মত এই সকল গ্রামের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরূপিত রাজস্ব ধার্য করা হইত এবং এই সকল গ্রামের ধার্য রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি আমিনের নিকট রক্ষিত থাকিত। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, সিয়াকনামায় উল্লিখিত তালুক পদটির স্পষ্ট তাৎপর্য কি?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রচিত একটি পারসী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরূপিত রাজস্ব নির্ধারণ সাপেক্ষ, তালুকের অস্তিত্ব মোঘল আমলে ছিল এবং একাধিক ধরনের তালুকের নিদর্শন মিলিত।[৯]

প্রশাসনিক কর্মের সুবিধার জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্টি কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি বা মন্ডলকে তালুক বলিয়া আলোচ্য গ্রন্থে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু, অন্যধরণের তালুকও সুবিদিত ছিল। অন্য জমিদারের তরফ হইতে যে ব্যক্তি ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ হইতেন, তিনিও তালুকদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং যে সকল গ্রামের রাজস্ব প্রদানে তিনি সম্মত থাকিতেন, তাহাদেরও তালুক বলা হইত। সুতরাং, তালুকদার এক বা একাধিক জমিদারের পক্ষ হইতে, তাঁহাদের অনুমতিক্রমে তাঁহাদের গ্রামগুলির অথবা একাধিক গ্রামে তাঁহাদের অধিকৃত অংশ সমূহের রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন। পুনরায়, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইবার পরিবর্তে সাম্প্রতিককালে ক্রীত জমিদারিকেও তালুক বলা হইত।

সুতরাং তালুকের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কোন একটি বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন থাকিত বলিয়া মনে হয় ঃ

(১) একাধিক গ্রামের সমষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল জমিদার এই গ্রামগুলির মালিকানা অথবা ইহাদের অংশ বিশেষের উপর এজমালী স্বত্ব ভোগ করিতেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তি উক্ত গ্রামগুলির রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত থাকিতেন।

(২) ক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত নূতন জমিদারি।

(৩) প্রশাসনিক কর্মের সুবিধার জন্য সৃষ্ট একাধিক গ্রামের সমষ্টি বা মণ্ডল।

সিয়াকনামায় যে তালুকের কথা বলা হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত কোন্ তালুক ? প্রশাসনিক কর্মের জন্য সৃষ্ট একাধিক গ্রামের সমষ্টি বা মণ্ডল বলিয়া যে তালুক পরিচিত, আলোচ্য তালুকটিকে সেই পর্যায়ভুক্ত করা চলে না ; কারণ রায়তি গ্রাম হইতে এই গ্রামগুলির স্বাতন্ত্র্য উক্ত ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি লাভ করে না— অথচ, দুইটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ইহাদের তালিকাভুক্ত করিবার পশ্চাতে ইহাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা হইলে আমরা কি ধরিয়া লইব যে, আলোচ্য তালুক বলিতে নবলব্ধ জমিদারি বুঝানো হইতেছে ? রায়তি পদের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার আমাদের উক্ত অনুমানও সমর্থন করে না, কারণ, রায়তি বলিতে কালক্রমে বর্তমানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুপ্রাচীন জমিদারি বুঝায় না। অতএব, সিয়াকনামায় বর্ণিত তালুকের ব্যাখ্যা মাত্র এক ভাবেই করা চলে এবং তাহা হইল ঃ একাধিক গ্রামের সমষ্টি, যাহার রাজস্ব প্রদান করিতে একাধিক জমিদারের পক্ষ হইতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন এবং এই সকল জমিদারগণ জমিদারীর সহ-অংশীদার অথবা এজমালী স্বত্বভোগী হইতে অথবা না হইতে পারিতেন। অযোধ্যা[১০] বলিয়া পরিচিত অঞ্চলের এইরূপ তালুকদারী ভূমি স্বত্বের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া কিছু সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অপর পক্ষে বঙ্গদেশে

নবলব্ধ জমিদারি অথবা পূর্বতন বিস্তৃত ভূমিসম্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জমিদারি, তালুক বলিয়া সুপরিচিত ছিল[১১]। তালুকের উক্ত ব্যাখ্যা করা হইলে, আলোচ্য পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রায়তি বলিতে সেইরূপ গ্রাম ধরিতে হইবে, যে গ্রামে প্রত্যেক জমিদার গ্রামীণ জমিদারির অন্তর্গত তাঁহার অংশের রাজস্ব স্বয়ং প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন। রায়তি পদের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই রায়তি পদটি বিশেষণ হিসাবে সেইরূপ জমিদারের বর্ণনায় ব্যবহৃত হইত, যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে গ্রামীণ জমিদারির নিজ নিজ অংশের রাজস্ব প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ থাকিতেন এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে এই কর্মে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতেন না। অর্থাৎ সেইগুলিকেই রায়তি গ্রাম বলা হইত, যেখানে জমিদার হিসাবে পরিচিত প্রতিটি ভূসম্পত্তির মালিকের সহিত সরকার প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করিতেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, গণেশপুর নামক রায়তি গ্রামে মোকাদ্দামের উল্লেখ আছে। সুতরাং আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে, জমিদার অথবা জমিদারের প্রতিনিধি হিসাবে এই মোকাদ্দামগণকে আমরা এক্ষণে চিহ্নিত করিতে পারি, কারণ আলোচ্য যুগের রাজস্ব সংক্রান্ত পুঁথিপত্রে মোকাদ্দাম পদের দ্বারা গ্রামীণ জমিদার ও তাঁহার প্রতিনিধিকেও বোঝানো হইয়াছে।

পাদটীকা

১. সিয়াক্-নামা পৃঃ ৩৮।

২. সিয়াক্-নামা পৃঃ ৭৯।

৩. অ্যাডিশনাল্; ৬৬০৩ পৃঃ ৭৯খ; অ্যাডিশনাল্ পৃঃ ১০০ক। দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৫০ক-৫২খ।

৪. হিদায়ৎ-উল্-কোওয়াইদ, পৃঃ ৭ক-৯খ।

৫. আলোচ্য পরিবেশে জোরতলব্ বলিতে সেই সকল অঞ্চল বুঝানো হইতেছে যেখানে বল প্রয়োগ অথবা বল প্রয়োগের হুমকি প্রদান প্রয়োজন হইত। আক্ষরিক অর্থে, অউসাত্ বলিতে গড় পরিমাণ বুঝায়। আলোচ্য পরিবেশে মহাল-ই-আউসাত্ সেইরূপ অঞ্চলকে বলা হইত যাহা জোরতলব্ও নহে, আবার রায়তও নহে। অর্থাৎ, এই সকল অঞ্চলের কৃষি সম্পর্কিত ভূমি-ব্যবস্থা এরূপ ছিল, যেখানে বল প্রয়োগের হুমকি প্রদান বা বল প্রয়োগ প্রায়শঃই করিতে হইত।

৬. হিদায়াৎ-উল্-কোয়ায়েদ, পৃঃ ৬৪খ-৬৬খ; বার্নিয়ার, পৃঃ ২০৫। "কোন কোন সময় তাঁহারা (সম্রাটের অধিকৃত অঞ্চলে যে সকল কৃষকের উপর উৎপীড়ন হইত) কোন রাজার রাজত্ব সীমানায় পলায়ন করিতেন, কারণ শেষোক্ত অঞ্চলগুলিতে তাঁহাদের উপর অপেক্ষাকৃত কম উৎপীড়ন হইত এবং অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহারা ভোগ করিতেন।"

৭. মিরাট-ই-আহমদি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১, ২২, ১৭৩, ১৭৪; মিরাট, ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২২৮-২২৯।

৮. সাক্ষ্যের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, আলোচ্য দলিলের ধারা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করা চলিতে পারে। এই ফারমান ১০৭৯ হিঃ ১৬৬৯-৭০ সালে গুজরাটের দেওয়ান

মহম্মদ হাসিমকে পাঠানো হইয়াছিল এবং ইহার শিরোনামা হইল, খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত ফারমান। রাজস্ব-ধার্য ও রাজস্ব সংগ্রহের কর্মে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে, তাহাদের সহিত মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে এই ফারমানে মোট ১৮টি ধারার উল্লেখ আছে। মুসলিম ফিকহ্ অনুসারে, অত্যন্ত সাধারণভাবে আলোচ্য বিধিগুলি বর্ণিত থাকায়, নিয়মিত রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের কর্মে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীগণের পথ-প্রদর্শক-নিয়মাবলী হিসাবে গণ্য না করিয়া আলোচ্য ফারমানকে নিছক মুসলিম ধর্মের মতাবলী হিসাবে কোন কোন ব্যক্তি নস্যাৎ করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহাকে মুসলিম ব্যবহার তত্ত্বের ভাষায় বর্ণিত, বাস্তব নিয়মাবলী—যাহা গুজরাটের ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক কর্মে লিপ্ত কর্মচারীগণ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিতেন—হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

যে সকল ব্যক্তি আলোচ্য ফারমানকে নিছক ইসলাম ধর্মের মতাবলী মনে করিয়া নস্যাৎ করিতে উৎসুক, বর্তমান লেখক তাঁহাদের সহিত একমত হইতে অপারগ। বস্তুতঃ এইগুলি ছিল ভূমি-রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্মচারীগণের পথ প্রদর্শক নিয়মাবলী এবং ফারমানের ভূমিকা হইতে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে মোঘল সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যেই এই নিয়মাবলী রচিত হইয়াছিল। ইহা মনে করা ভ্রমাত্মক যে, আলোচ্য নিয়মাবলী কেবলমাত্র গুজরাট প্রদেশের জন্যই রচিত হইয়াছিল এবং সেই কারণেই ভারতীয় ধারায় ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক কর্মে যে সকল শব্দ ও পদের ব্যবহার হয়, তাহা এই দলিলে সযত্নে বর্জন করা হইয়াছে। সমসাময়িক কালের রাজস্ব সংক্রান্ত রচনাবলীর সহিত যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন যে কোন একটি বিশেষ প্রদেশে যে সকল রাজস্ব সংক্রান্ত শব্দ ও পদের প্রচলন ছিল, অপর প্রদেশে সে সকল শব্দ বা পদ অপ্রচলিত ছিল অথবা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ঐ শব্দ বা পদগুলি ব্যবহৃত হইত। এই অবস্থায় সমগ্র সাম্রাজ্যের রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্মচারীগণের পথ প্রদর্শক নিয়মাবলীর ফারমানে কিছু কিছু সাধারণ ও পক্ষপাতশূন্য পদের উল্লেখ থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সকল পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা চলিত। সুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, নিছক গুজরাটের কৃষি-সংক্রান্ত ভূমি-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া আলোচ্য ফারমানের পদগুলির ব্যাখ্যা করা যুক্তি-যুক্ত হইবে না। বস্তুতঃ উক্ত নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করিতে হইলে, সমগ্র সাম্রাজ্যের কৃষি-সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা করিতে হইবে।

৯. অ্যাডিশানাল, ৬৬০৩, পৃঃ ৫৪খ, ৫৫ক।

১০. 'ক্রনিকলস্ অব্ ওয়াও', পৃঃ ১৪৬-১৫৬।

১১. দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস, পৃঃ ৯খ, ১০ক ; ফিফথ্ কমিটি রিপোর্ট III, গ্রসারি, পৃঃ ৫১ ; অ্যাডিশানাল, ৬৬০৩ পৃঃ ৫৪খ, ৫৫ক।

পরিশিষ্ট 'খ'

মিরাট-ই-আহমদি গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে উল্লিখিত, খিরাজী সরকারগুলির অন্তর্ভুক্ত ঘয়ের অমালি[1] পরগনা ও গ্রাম সমূহের তালিকা।

(ক) **সরকার আহ্‌মেদাবাদ**[2] :

মহাল : মোট সংখ্যা	ঘয়ের অমালি জমিদারগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত পরগণা সংখ্যা	ঘয়ের অমালি গ্রাম অধ্যুষিত পরগনা সংখ্যা
৩৩	১	৩

তিনটি মহালের অন্তর্গত গ্রামসমূহের (যে গ্রামগুলির মধ্যে ঘয়ের অমালি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল) বিশদ বিবরণ।

পরগনা	গ্রাম-সংখ্যা	ঘয়ের অমালি গ্রাম	জামাদি সহ অবশিষ্ট গ্রাম
১। ইদর	৭৬৭	২৯০	৪৭৭
২। বীরপুর	১৪৫	৭	১৩৮
৩। বীর মকনম্	৬২৮	১০৫	৫২৩

(খ) **সরকার পাটান**[3] :

মহাল মোট সংখ্যা	জমিদারগণ কর্তৃক অধিকৃত পরগনা সংখ্যা	পরগনা (যাহার মধ্যে ঘয়ের অমালি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল) সংখ্যা
১৭	২	৪

চারিটি পরগনার অন্তর্গত গ্রাম সমূহের (যে গ্রামগুলির মধ্যে ঘয়ের অমালি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল) বিশদ বিবরণ।

পরগনা	গ্রাম মোটসংখ্যা	ঘয়ের অমালি গ্রাম	জামাদিসহ অবশিষ্ট গ্রাম
১। পালামপুর	১৭৯	২৯	১৫০
২। তিরওয়ারা	১০৪	৭২	৩২
৩। ওয়ালিয়া	২৫৮	১৩৭	১২১
৪। সান্‌তালপুর	—	—	—

(গ) **সরকার বরোদা**[4] : চারিটি মহাল ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন ঘয়ের অমালি গ্রাম বা পরগনার উল্লেখ নাই। এই চারিটি মহালকেই খিরাজী বলা হইয়াছে এবং প্রতি পরগনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যাসহ জমাদামি অঙ্কের পরিমাণ নির্দেশিত আছে।

(ঘ) **সরকার ভারোচ**[৫] ঃ

মহাল ঃ মোট সংখ্যা	জমিদার কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত পরগণা ঃ সংখ্যা	পরগনা (যাহার মধ্যে ঘয়ের অমালি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল) ঃ সংখ্যা
১২	৩	৩

জমিদার কর্তৃক অধিকৃত তিনটি পরগনার নামসহ মিরাট-ই-আহমদি গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে এই পরগনাগুলির উপর যে টীকা আছে, তাহার বিবরণ।

পরগনা	গ্রন্থে উল্লিখিত টীকা
১। আল্‌তেসর	সম্পূর্ণ ঘয়ের অমালি জমিদার কর্তৃক অধিকৃত। সুরাটের মুৎসুদ্দিকে অথবা বিরাট সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ করে, এরূপ কোন ব্যক্তিকে ইহার রাজস্ববিলি করিবার সময়, সেনাবাহিনীর সংখ্যার অনুপাতে রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত ; দলিলপত্রে গ্রামগুলির বিশদ বিবরণ নাই।
২। তর্কেসর	পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ; নাজিম ও জায়গীরদার তাঁহাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। জমিদারের দখলে।
৩। চাহার মণ্ড্‌ভী	জোর-তলব্‌-জমিদারী অঞ্চল। সকল সময় ইহার রাজস্ব, সুরাটের মুৎসুদ্দিকে বিলি করা হইত। অভিযান চালাইবার সময় তিনি পেশকাশ সংগ্রহ করিতেন। তিন লক্ষ দামে ইহার জমাদামি নির্ধারিত হইয়াছিল। দলিলপত্রাদিতে গ্রামগুলির বিশদ বিবরণ নাই।

পাদটীকা

১. দাক্ষিণাত্যেও ঘয়ের অমালি জমিদারের পরিচয় পাওয়া যায়। নান্দের-পার নালা পরগনার ৩৭টি মহালের মধ্যে, দুইটি মহাল ঘয়ের অমালি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে একটি সম্পূর্ণ সরকার যে ঘয়ের অমালি হিসাবে দেখানো হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ঃ দস্তুর-উল-অমল-ই-শাহানশাহী, পৃঃ ৪৯ ক, ৫৯ক)।

২. মিরাট-ই-আহমদি ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৮৮–১৯৮।

৩. মিরাট-ই-আহমদি ক্রোড়পত্র, পৃঃ ১৯৮–২০৪।

৪. মিরাট-ই-আহমদি ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২০৪–২০৫।

৫. মিরাট-ই-আহমদি ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২০৫–২০৬।

পরিশিষ্ট 'গ'

মাল-ও-জিহাত এবং সেয়ার জিহাত্ করের প্রকৃতি ঃ—মোঘল সরকার কৃষিকর্মে নিয়োজিত ভূমি, গোচারণ ভূমি, নদী-পুষ্করিণী হইতে প্রাপ্ত পণ্য শিল্পোৎপাদন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং প্রশাসনিক ব্যয়ভার (বহন করিবার উদ্দেশ্যে আরোপিত কর), বাবদ বিভিন্ন করের প্রচলন করিয়াছিলেন। মাল-জিহাত্, সেয়ার-জিহাত ও সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্, এই তিনটি শিরোনামায় উপরোক্ত করগুলি তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। তবে মবৃত্ প্রথার অন্তর্ভুক্ত গ্রামের নির্ধারিত রাজস্বের হিসাবে, মাল-জিহাত্ ও সেয়ার-জিহাত কর ভূমি-রাজস্ব (জমা) বলিয়া গণ্য হইত।

মোঘল যুগে ভূমি-রাজস্ব দাবির বৈশিষ্ট্য এবং ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যে সরকারের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে, উপরোক্ত পদগুলির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যের বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমান লেখকের মতে, এ যুগের ঐতিহাসিকগণ এ পর্যন্ত বিষয়টির উপর যথেষ্ট গভীর অনুসন্ধান বা দৃষ্টিপাত করেন নাই।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই পদগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আবুল ফজল বলিতেছেন সংক্ষেপে "রাই বা নির্দিষ্ট শস্য হার অনুযায়ী কৃষিকর্মে নিয়োজিত ভূমির উপর যে কর আরোপিত হইত, তাহাই মাল বলিয়া বিবেচিত হইত। বিভিন্ন কারুশিল্প হইতে যাহা কর বাবদ আদায় করা হইত, তাহাকে জিহাত বলা হইত এবং অবশিষ্ট কর সমূহ সেয়ার জিহাত[১] নামে পরিচিত ছিল।" আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সংকলিত একটি হিসাব সংক্রান্ত সারগ্রন্থ (খুলাসত্-উস্-সিয়াক) রচয়িতার মতে "উৎপন্ন শস্য হইতে যাহা সংগ্রহ করা হইত, তাহা মাল বলিয়া পরিচিত ছিল এবং কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ অধিকর্তার সীমানায় যে সকল কর জমার অন্তর্ভুক্ত করা হইত, তাহাদের জিহাত বলা হইত। পরবর্তীকালে, জিহাত করটি মালের অন্তর্ভুক্ত অথবা কবলিত হইয়া পড়ে এবং যৌগিক বাক্যাংশের সংমিশ্রণে মাল ও জিহাত্ একটি পদ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। অপর পক্ষে, চর্ম, তৈল শস্য, খাদ্যসামগ্রী ও ঔষধ, অশ্ব ও উটের উপর আরোপিত করসমূহ—যাহা বিভিন্ন গঞ্জ অথবা চবুতর-ই-কোতয়ালী[২] হইতে সংগ্রহ করা হইত—সেয়ার-ই-জিহাত্[৩] নামে পরিচিত ছিল।"

উপরোক্ত দুই গ্রন্থের, ব্যাখ্যাগুলি তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মাল পদটির ব্যাখ্যায় উভয় গ্রন্থকার অভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তবে, আইন গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিভিন্ন ধরনের চারু ও কারুশিল্পের উপর ধার্য কর জিহাত নামে পরিচিত। অপরপক্ষে, খুলাসাত উস্-সিয়াক গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিহাত্ ছিল উল্লিখিত জমায় মাল-এর এক অখণ্ড অংশ। উপরন্তু মাল-ও-জিহাত ব্যতিরেকেও যে সকল কর সংগ্রহ করা হইত,

আইন গ্রন্থে সেগুলিকে সেয়ার-জিহাত্ বলা হইয়াছে। খুলাসাত-উস্-সিয়াক গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মাল-ও-জিহাত ব্যতিরেকেও যে সকল কর চবুর ই কোতওয়ালী হইতে সংগ্রহ করা হইত, সেইগুলি সেয়ার জিহাত এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রচিত একটি প্রশাসনিক সারগ্রন্থে, মালকে আসল বা আদি কর, এবং মাল নির্ধারণ[৪] সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করিতে যে খরচপত্র সংগ্রহ করা হইত, তাহাকে জিহাত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, জিহাতের উক্ত বিশ্লেষণ, খুলাসাত-উস্-সিয়াক গ্রন্থের ব্যাখ্যার সহিত অভিন্ন। তবে, আলোচ্য সারগ্রন্থে, জিহাতের প্রকৃতি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং, আমরা অনুমান করিতে পারি যে, আইন গ্রন্থে জিহাত শব্দটি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, আওরঙ্গজেবের আমল শুরু হইবার সময় তাহা সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত না, শব্দটির সংজ্ঞা ভিন্নতর অর্থ বহন করিত। দস্তুর-উল-অমাল-ই-মুজমালাই নামক প্রশাসনিক সার গ্রন্থে, মাল এবং জিহাত শব্দের ব্যাখ্যা অন্তে, সেয়ার-উল-ওয়াজুহ্ পদের ব্যাখ্যা রহিয়াছে—ইহা মাল-ও-জিহাত[৫] ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল প্রকার কর। সিয়াক নামা গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মাল-ও-জিহাত ব্যতিরেকেও যে সবল কর সংগৃহীত হইত, সেইগুলি সেয়ার-উল-ওয়াজুহ্[৬] খাতে তালিকাভুক্ত থাকিত। কিন্তু হুবহু এইরূপ ব্যাখ্যা আইন ও খলাসাত্-উস্-সিয়াক গ্রন্থদ্বয়ে করা হইয়াছে; যদিও পরোক্ত গ্রন্থে, ইহার দ্বারা কেবলমাত্র সেই সকল কর বোঝানো হইয়াছে, যেগুলি গঞ্জ অথবা চবুতর-ই-কোতয়ালী হইতে সংগৃহীত হইত। নিছক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিতে হইলে. সেয়ার-জিহাত এবং সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ পদ দুইটি সমার্থক বলা চলিতে পারে। কিন্তু গ্রন্থদ্বয়ে সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ শব্দটির ব্যাখ্যার অব্যবহিত পরে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পদ দুইটিকে সমার্থক বলা দুষ্কর। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ শব্দটির ব্যাখ্যা করিবার পর দস্তুর-উল-অমাল-ই-মুজ্মালাই গ্রন্থে, কর চাপান যায়, এইরূপ দ্রব্যাদির[৭] একটি তালিকা, হাসিল-ই-সেয়ার, বাজেয়াপ্ত ও সেয়ার-জিহাত, ইত্যাদি বিভিন্ন উপখাতে শ্রেণীবন্ধ করা হইয়াছে। ইহা বাদেও, অপর একটি উপখাতের উল্লেখ আছে যাহার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।[৮] আলোচ্য পুস্তকদ্বয়ের মূল বক্তব্য ও কর-যোগ্য-দ্রব্যাদির যে তালিকার উল্লেখ আছে[৯], সতর্কতার সহিত তাহা পর্যালোচনা করিলে এইরূপ অনুমান হয় যে, এই দুই গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মাল-ও জিহাত ব্যতিরেকেও যে সকল কর করোরী কর্তৃক সংগৃহীত হইত, সেইগুলিই সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ নামে পরিচিত ছিল এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট উপখাতে (সেয়ার-জিহাত বা সেয়ার-উল্-জিহাত) ইহাদের পুনরায় শ্রেণীবন্ধ করা হইয়াছে। দস্তুর-উল্-অমাল-ই-মুজ্মালাই গ্রন্থে বিভিন্ন উপখাতে বিভিন্ন কর-যোগ্য দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট হইলেও সেয়ার-ই-জিহাত এর অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ কর সংগ্রহ করা হইত মূল রচনায় তাহার—নির্দেশ নাই। তবে, একটি সংক্ষিপ্ত টীকায় বলা হইয়াছে,

সেয়ার-উল্-জিহাত বাবদ যে সকল কর-যোগ্য-দ্রব্যাদির শ্রেণী বিভাগ করা হইত, সেইগুলি মাল-ও জিহাতএর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। অর্থাৎ মাল-ও-জিহাত নিরূপণ বা সংগ্রহ বাবদ যে সকল কর ধার্য করা হইত সেগুলি সেয়ার-জিহাত নামে চিহ্নিত ছিল। সিয়াক-নামায়[১০] উল্লিখিত গণেশপুর গ্রামের রাজস্ব নির্ধারণের একটি হিসাবের তথ্য হইতে উক্ত অনুমানের প্রত্যক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। এই সাক্ষ্য হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেয়ার-জিহাত ছিল এরূপ একটি কর-[এ বিষয় আমরা অল্প বিস্তর বিশদ আলোচনা করিব]—যাহা গ্রাম ও কৃষি-প্রধান অঞ্চলসমূহে আরোপিত হইত এবং মাল-ও-জিহাত[১১] এর সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আইন-গ্রন্থে সেয়ার-জিহাত বলিতে মাল-ও-জিহাত ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল প্রকার কর ধরা হইলেও, আওরঙ্গজেবের আমলে সেয়ার-জিহাত বা সেয়ার-উল্-জিহাত বলিতে এক ধরনের কৃষি-কর বোঝানো হইত এবং মাল-ও-জিহাত বাবদ ধার্য করের পরিমাণের সহিত ইহা ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। অপর পক্ষে, সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ বলিতে মাল-ও-জিহাত ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল প্রকার কর বোঝানো হইত এবং মনে হয় সেয়ার-ই-জিহাত গণ্য হইত সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্‌রই একটি অংশ বা উপখাত হিসাবে।

গণেশপুর গ্রামের নির্ধারিত রাজস্বের হিসাব হইতে শুধুমাত্র আলোচ্য করগুলি সম্পর্কে আমাদের অনুমান সমর্থিত হয় না, উপরন্তু মাল-ও-জিহাত এবং সেয়ার-জিহাত নামে পরিচিত তিনটি করের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোকপাত করে। ইহার সাহায্যে ভূমি-রাজস্ব দাবির পরিমাণ সম্পর্কেও যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ১১০৪ ফজলি সালের গণেশপুর গ্রামের খসড়া-ই-জবত্[১২] এবং জমাবন্দীর[১৩] হিসাব পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে, বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত মোট জমির পরিমাপ—কৃষিকর্মে দুইবার নিয়োগ করা হইয়াছিল এরূপ জমির পরিমাপ—৩৪ বিঘা ও ১৫ বিঘা। সমগ্র বৎসরের জন্য এই গ্রামের উপর ধার্য রাজস্বের (খারিফ[১৪] এবং রবি[১৫] শস্য বাবদ ধার্য রাজস্ব সহ) পরিমাণ ছিল ১০৬ টাকা ৯ আনা। জমা বা মোট ভূমি-রাজস্ব দাবির পরিমাণ মাল, জিহাত এবং সেয়ার-জিহাত খাতে পৃথকভাবে গণনা করিয়া নিম্নলিখিত ছকে সাজানো হইল :

মাল—৮৮ টাঃ ২½ আঃ	মাল ও জিহাত	৯২ টাঃ ১০ আঃ
জিহাত—৪ টাঃ ৭½ আঃ		১৩ টাঃ ১৫ আঃ
সেয়ার জিহাত—১৩ টাঃ ১৫ আঃ		১০৬ টাঃ ৯ আঃ

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, মাল নিরূপণে বিভিন্ন শস্যের জন্য নগদ হারের প্রচলন থাকিলেও, শতকরা ৫ হারে জরিমানা[১৬] ও দেহ্‌নিমি[১৭], এই দুইটি খাতে জিহাত করের নিরূপণ করা হইত। খরচপত্র বাবদ মাল-এর—আলোচনা হিসাবে যাহার পরিমাণ ৮৮ টাঃ ২½ আঃ—উপর শতকরা ৫ হারে ধার্য হইবে অঙ্কের পরিমাণ প্রায় ৪ টাঃ ৭½ আঃ হয় এবং জিহাত হিসাবে ধার্য

করের পরিমাণ ও আলোচ্য হিসাবে-তাহাই দেখানো হইয়াছে। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি মাল বা উৎপন্নের উপর রাজস্ব হিসাবে রাষ্ট্রের মূল দাবির অংশ বলিয়া যাহা স্বীকৃত ছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই জিহাত কর আরোপিত হইত। জিহাত সম্পর্কে এই অনুমান পূর্বে আলোচিত আকর গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাখ্যা সমর্থন করে। ধার্য রাজস্বের আলোচ্য হিসাবে সেয়ার জিহাত বাবদ ধার্য করের পরিমাণ, খারিফ ও রবি শস্যের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে দেখানো হইয়াছে এবং উক্ত হিসাব হইতে জানা যায় যে শতকরা ১৫ হারে এই কর ধার্য করা হইয়াছিল। মাল-ও জিহাতের—যাহার পরিমাণ ৯২ টাঃ ১০ আঃ —উপর শতকরা ১৫ হারে ধার্য করের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৩ টাঃ ১৫ আঃ, যাহা সেয়ার-জিহাত বাবদ ধার্য করের উপরোক্ত পরিমাণের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। অতএব সেয়ার-জিহাত বলিতে কয়েকটি নির্দিষ্ট খরচপত্র বোঝানো হইয়াছে এবং মাল-ও-জিহাত বাবদ ধার্য করের পরিমাণ নির্ধারিত হইত, এবং এই কর গ্রামীন ও কৃষিভিত্তিক সমাজ হইতে আদায় করা হইত। উপরন্তু, খুব সম্ভবতঃ, মাল-ও-জিহাত কর সংগ্রহ করিবার কার্যে উক্ত খরচপত্রের প্রয়োজন হইত। তবে, আমাদের আলোচ্য হিসাবে সায়ের-জিহাত বাবদ শ্রেণীবদ্ধ করের বিভিন্ন দফাগুলির নির্দেশ নাই। তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে আমাদের অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সিয়াক-নামায় উল্লিখিত, অপর একটি হিসাব হইতে সেয়ার-জিহাত খাতে সংগৃহীত করের বিভিন্ন দফাগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ফতেপুর পরগনার আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে আলোচ্য বিষয়ের উপর কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[১৮] এই হিসাবপত্রে, সংগৃহীত অর্থ সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ সহ তিনটি পৃথক খাতে দেখানো হইয়াছে। পরোক্ত করের বিভিন্ন দফাগুলি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, এবং প্রতি দফায় সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের আলোচনার বিভিন্ন বিষয়গুলির সঠিক বিশ্লেষণের জন্য, নিম্নে সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ বাবদ্ সংগৃহীত অঙ্ক উদ্ধৃত করা হইল।[১৯]

সেয়ার-উল্-ওয়াজুহ্ ৬৯৭ টাকা

(এই হিসাবকে বিভিন্ন খাতে ভাগ করিলে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি পাওয়া যায় *

করের বিভিন্ন দফা[২০]	পরিমাণ
সাদির্-ও-ওয়ারিদ্	৩০০ টাঃ
শাহ্নাগী[২১] ও টপ্পাদারী[২২]	১২৫ টাঃ (১২৬ টাঃ)*
ওলবানা[২৩]	২০০ টাঃ
সর্ফ-ই-সিক্কা[২৪]	৭১ টাঃ
মোট[২৫]	৬৯৬টাঃ (৬৯৭ টাঃ)*

সতর্কতার সহিত কর সমূহের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে,—প্রচলিত মুদ্রায় কর প্রদান না করা হইলে—সর্ফ-ই-সিক্কা বা মুদ্রার উপর শতকরা হারে আরোপিত কর ব্যতিরেকে, অবশিষ্ট তিন দফায় সংগৃহীত করগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রাম বা কৃষিভিত্তিক। উপরন্তু এই সকল খরচপত্র

বা দস্তুরি অনেকাংশেই ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারীগণের পারিশ্রমিক মিটাইবার জন্য সংগ্রহ করা হইত। তলবানা, শাহনাগী ও টপ্পাদারী করগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। সাদির-ও-ওয়ারিদ যাহা অন্যত্র মেহ্মানি[২৬] বলিয়া পরিচিত ছিল শিরোনামায় সংগৃহীত দস্তুরি পর্যটক, তীর্থযাত্রী ও আগন্তুক ব্যক্তিগণের পরিচর্যা বাবদ ব্যয় করা হইত।[২৭]

'ফিফ্থ্ রিপোর্টে'-উল্লিখিত, অনুরূপ দলিল তথ্যাদি হইতে, আমাদের পূর্বোক্ত অনুমানগুলির সমর্থন পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত আকবরশাহী পরগনার ১৬৯১ সালের তুমার-ই-জমা[২৮]-র একটি নকল উদ্ধৃত করা আছে। উক্ত তুমার-ই-জমার (বা নির্ধারিত রাজস্বের হিসাব) ভূমিকা হিসাবে যে ব্যাখ্যার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, নির্ধারিত রাজস্বের এই হিসাবে মাল-ও-জিহাত এবং সেয়ার-জিহাত, অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, আদি মাল-ও-জিহাত হিসাবে ধার্য রাজস্ব ব্যতিরেকেও যে সকল কর সংগ্রহ করা হইত, তাহাদের সেয়ার জিহাত বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং এই সকল কর ছিল মূলতঃ গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক। উপরন্তু মাল ও-জিহাতের উপর শতকরা হারে এই করগুলি ধার্য হইত। তবে, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সিয়াক নামা গ্রন্থে যে শতকরা হারের উল্লেখ আছে, তাহা ছিল স্বীকৃত ঢালাও হার; অথচ 'ফিফ্থ রিপোর্ট' বর্ণিত দলিলে, বিভিন্ন সামগ্রীর করের হার বিভিন্ন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। দলিলে যে সকল করের উল্লেখ আছে, সেইগুলি দাম্নি[২৯] ফতাদারী[৩০], দেহদারী[৩১], তুকি[৩২], বিহাই[৩৩], কাগজ[৩৪] কস্তুর এবং মেহ্মানি[৩৫]। এই সকল করের ধারাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে যে খরচপত্র হইত তাহা বহন করিবার উদ্দেশ্যে এই করগুলি ধার্য করা হইত, এবং এই সকল খরচ-পত্রের ব্যয়ভার যুগ্মভাবে কৃষক সম্প্রদায়কেও বহন করিতে হইত।

উত্তর পশ্চিম প্রাদেশিক রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্রের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, কয়েকটি জিলায় কৃষি-কর্মে নিয়োজিত জমির উপর কয়েকটি নির্দিষ্ট কর ধার্য করা হইত এবং ইহাদের পরিমাণ ছিল প্রাথমিক ধার্য রাজস্বের এক চতুর্থাংশ। 'গ্রাম-সংক্রান্ত খরচপত্র' এই শিরোনামায় উল্লিখিত থাকায়, পূর্বতন ব্রিটিশ শাসকবর্গ ইহাদের সেয়ার-জিহাত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেন নাই। এই সকল কর এবং পারসিক দলিল পত্রাদিতে উল্লিখিত কয়েকটি দস্তুরির অত্যন্ত পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকায় আলোচ্য পংক্তিটি বিশদভাবে উদ্ধৃত করা হইল। "পাট্টায় নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতিরেকেও প্রজাকে গ্রাম সংক্রান্ত-খরচপত্র বাবদ নির্দিষ্ট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ভূস্বামীকে প্রদান করিতে হইত; মনে হয়, কোন ক্ষেত্রেই এই করের পরিমাণ উক্ত অঙ্কের অধিক হইত না এবং সাধারণ ভাবে, নির্ধারিত প্রয়োজনের তুলনায় এই অঙ্কের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী ছিল। পাটোয়ারীর (গ্রামীণ হিসাব রক্ষক) ভাতা, বাট্টা বা প্রাপ্য মুদ্রার—প্রচলিত মুদ্রায় কর প্রদান না করিলে—উপর শতকরা হারে আরোপিত কর, শস্যের পরিমাণ ও নির্ধারণ কর্মে লিপ্ত শাহ্না নামক কর্মচারী-গণের খরচপত্র বাবদ আদায়, তলবানা বা রাজস্ব প্রদান সংক্রান্ত মামলায় আদালতে

পরোয়ানাবাহীগণের ভাতা, জীবিকাবিহীন পথিক, ভিক্ষুক ও ব্রাহ্মণগণের জন্য অনুমোদিত ভিক্ষা ও খোরাকী ভাতা এবং ফসল তুলিবার সময় ভূস্বামীর নিকট হইতে তহশীলদার বা দেশীয় রাজস্ব সংগ্রহকারীর—ভূস্বামী যাহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিতেন—প্রাপ্য নজরানা হিসাবে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা, উক্ত করের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৬]

তলবানা, শাহ্‌নাগী (এবং সার্ফ-ই-সিক্কা ও সাদির-ও-ওয়ারিদ নামে যে করের উল্লেখ পারসিক দলিল পত্রে আছে) করগুলির প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা উপরে উদ্ধৃত পংক্তি হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই করগুলি যে গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক ছিল এবং ধার্য রাজস্বের আসল পরিমাণের সহিত ইহাদের পরিমাণ সংযুক্ত করা হইত, আলোচ্য পংক্তি হইতে তাহাও জানা যায়। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য পংক্তিতে শস্যের পরিমাপ ও নির্ধারণ বাবদ খরচ-পত্র গ্রাম বাবদ খরচের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু পারসী দলিলপত্রে উহাকে ধার্য রাজস্বের উপর আরোপিত করের সর্বপ্রথম পৃথক দফা বলা হইয়াছে। উপরন্তু, রাজস্ব-সংক্রান্ত দলিল পত্রে পুলিসী খরচ—যাহা পূর্বে ফৌজদারী দস্তুরি বলিয়া পরিচিত ছিল—বাবদ নিরূপিত করের সাক্ষ্যও আছে, কিন্তু আমাদের আকর গ্রন্থগুলিতে এই কর সেয়ার-জিহাত শিরোনামায় উল্লিখিত হয় নাই। স্থানীয় প্রকারভেদে অথবা কালক্রমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় উক্ত প্রভেদ ঘটিয়া থাকিবে।

পাদটীকা

১. আইন-ই- আকবরি, I, পৃঃ ২০৫।

২. চবুতরঃ ভূম হইতে অল্প উচ্চে অবস্থিত মাটি বা ইঁটের তৈয়ারী মঞ্চ। কোতয়াল বা উচ্চতম পুলিস অধিকারিকের দপ্তর এই নামে পরিচত ছিল।

৩. খুলাসাত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌ পৃঃ ১৩খ, 'সাইর-ই-জিহাত্‌' এর সংজ্ঞা জানাবার জন্য, 'ফারহঙ্গ-ই-কারদানি'—পৃঃ ৩৪খ দ্রষ্টব্য।

৪. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই- মুজ্‌মালাই—পৃঃ ২৮ক।

৫. একই গ্রন্থে, পৃঃ ২৮ক।

৬. সিয়াক-নামা, পৃঃ ৩০৭।

৭. দস্তুর উল্‌-অমাল-ই-মুজ্‌মালাই, পৃঃ ২৮খ—২৯ক

৮. দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-মুজমালাই, পৃঃ ২৮ক-২৯ক ; দ্রঃ সিয়াক-নামা, পৃঃ ৩০৭ ; সিয়াক-নামা গ্রন্থে সেয়ার-ওয়াজুহ্‌ খাতে নিম্নলিখিত উপ-শিরোনামা রহিয়াছে। পেশকাশ, লুক্কায়িত ধন দৌলত, বেত্‌-উল্‌-মাল্‌। হাসিল-ই-বাঘাত্‌ ও বাজিয়াপ্ত।

৯. সেয়ার্‌-উল্‌ ওয়াজুহ্‌ খাতে যে সকল করের উল্লেখ দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-মুজমালাই এবং সিয়াক-নামা, উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায় তাহাদের কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) পেশকাশ, করোরী কর্তৃক সংগৃহীত।

(খ) ভূমিতে প্রাপ্ত অথবা ভূমি খনন করিয়া যে সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে।

(গ) উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের (উত্তরাধিকারীর অভাবে) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি।

(ঘ) আইন সম্মত কোন উত্তরাধিকারী যে সম্পত্তি দাবি করেন নাই, তাহার উপর আরোপিত কর।

(ঙ) পেষণ কল।

(চ) ফলন্ত বাগান।

(ছ) বিপণি।

(জ) বাজার-গঞ্জ।

১০. সিয়াক-নামা, পৃঃ ৩৩-৩৪।

১১. রেভিনিউ-রেকর্ড, পৃঃ ২৬০ দ্রষ্টব্য ; ফিফ্‌থ্‌ কমিটি রিপোর্ট—II, পৃঃ ৭৪২।

১২. সিয়াক-নামা, ৩২,৩৩।

১৩. সিয়াক-নামা, পৃঃ ৩৩,৩৪।

১৪. খারিফ ঃ বর্ষার পূর্বে অর্থাৎ এপ্রিল মে মাসে যে শস্য বপন করা হয় এবং বর্ষার পরেই (অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) যাহা মাঠ হইতে তোলা হয়। দ্রষ্টব্য ঃ উইলসনস্‌ গ্লোসারী।

১৫. রবি ঃ বসন্তকালের ফসল, অর্থাৎ বর্ষার পরে যে শস্য বপন করা হয় এবং বৎসরের প্রথম তিন বা চার মাসের মধ্যেই যাহা মাঠ হইতে তোলা হয়। দ্রষ্টব্য ঃ উইলসনস্‌ গ্লোসারী।

১৬. সিয়াক-নামা, পৃঃ ৬২-৬৫।

১৭. একই গ্রন্থে, পৃঃ ৬৪।

১৮. সিয়াক-নামা, পৃঃ ৬২-৬৪।

১৯. একই গ্রন্থে, পৃঃ ৬৪।

২০. সাদির-ও-ওয়ারিদ ঃ আক্ষরিক অর্থে গ্রাম দর্শনকারী। আইনতঃ ইহা একপ্রকার দস্তুরি যাহা ভ্রমণকারী, তীর্থযাত্রী ও আগন্তুক ব্যক্তি গ্রাম পরিদর্শনে আসিলে তাঁহাদের আপ্যায়ন বাবদ সাধারণভাবে খরচ হইত (দ্রষ্টব্য ঃ 'রেভিনিউ রেকর্ডস্‌', পৃঃ ২৬০)। সম্ভবতঃ ইহাকেই অন্যত্র মেহ্‌মানি দস্তুরি বলা হইয়াছে ; দ্রঃ সিয়াক-নামা, পৃঃ ৭৯ ; 'ফিফ্‌থ্‌ কমিটি রিপোর্ট', I', পৃঃ ৪৭২।

২১. শাহ্‌নাগী ঃ শস্য পাহারায় নিযুক্ত শানাগণের বেতন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত পারিশ্রমিক বা কর (রেভিনিউ রেকর্ড্‌স্‌, পৃঃ ২৬০)।

২২. টপ্পাদারী ঃ টপ্পাদার বা টপ্পার রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর প্রাপ্য দস্তুরি।

২৩. তলবানা ঃ ভূমি-রাজস্ব প্রদান করিবার জন্য আদালতের আদেশ-বাহীর খোরাকী ভাতা (দেওয়ান-ই-পসন্দ্‌, পৃঃ ৩৭, ৩৮ ; ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩৭ক ; চহর গুলজার-ই-সুজয়, ৯৪খ ; দস্তুর-উল-অমাল-ই-বেকাস্‌ পৃঃ ২৯খ,

৩০ক, দস্তুর-উল অমাল-ই-মুজমালাই, পৃঃ ৪৬ক, ৪৭ক ; রেভিনিউ রেকর্ড্স্, পৃঃ ২৬০)। দেওয়ান-ই-পসন্দ্ গ্রন্থের লেখকের মতে, দৈনিক ভাতা হিসাবে সওয়ারকে ২টাঃ ৪আঃ এবং পেয়াদাকে ২আঃ দেওয়া হইত।

২৪. সার্ফ-ই-সিক্কা (বাট্টা বলিয়াও পরিচিত) ঃ প্রচলিত মুদ্রায় অর্থ প্রদান না করা হইলে, মুদ্রার ওজনে ঘাট্তি থাকায় এই দস্তুরি মুদ্রা প্রতি নির্দিষ্ট হারে সংগ্রহ করা হইত (রেভিনিউ রেকর্ড্স্, পৃঃ ২৬০)।

২৫. প্রকৃত মোট পরিমাণ হয় ৬৯৬ টাকা,—অথচ হিসাবের শুরুতে এই পরিমাণ ৬৯৭ টাকা দেখানো হইয়াছে। হিসাবে এক টাকার গরমিল রহিয়াছে। হয়ত লিখিবার ভুলে এইরূপ গরমিল হইয়া থাকিবে।

২৬. সিয়াক্-নামা, পৃঃ ৭৮, ৭৯ ; ফিফ্থ্ রিপোর্ট, II, পৃঃ ৭৪২।

২৭. ফিফ্থ্ রিপোর্ট, II, পৃঃ ৭৪২ ; দ্রষ্টব্য ঃ দস্তুর-উল-অমাল-ই-মুজ্মালাই, পৃঃ ৪৬ কখ, ৪৭ক।

২৮. বঙ্গাব্দ ১০৯৮ বা ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দের তুমার-ই-জমা (যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, মাল-ও-জিহাত্ বা জমির রাজস্ব এবং সেয়ার-জিহাত্ বা উলুম্বর সরকারের অন্তর্গত, আকবরশাহী পরগনায় যে সকল (পরিবর্তনশীল) দ্রব্যের আমদানি হইত ঃ

মোজা বা গ্রাম		১৩৫ ৫ ১০	
মহল		১৫ ০ ০	
		১৫০ ৫ ১০	
জমা বা নির্ধারিত হুবুবুবত্ অথবা কর			১৫,৫০৭ ৮ ৯
দামি (শতকরা হারে)	২ ৮ ০	৪১৪ ৬ ২	
ফতাদারী	১ ৯ ০	২৫৮ ১৫ ১১	
ভিদারী	১ ৪ ০	২০৭ ২ ১৫	
শতকরা হার	৫ ৫ ০	৮৮০ ৮ ৮	
তুক্কা শতকরা হার	১ ০ ০	১৬৫ ১১ ১৪	
বেহাই কাগজ	০ ১ ১ ২	১৬ ৯ ২	
(কাগজের মূল্য)	১১ ১ ২	১৮২ ৪ ১৬	১০৬২ ১৩ ৪
মোট			১৬,৫৭০ ৫ ১৩

ফেরা বা উপরোক্ত মোট পরিমাণের উপর ধার্য অতিরিক্ত কর

কুস্থর, শতকরা হার	১৫ ০ ০	২৪৮৫ ১০ ৫	
ফতাদারী	০ ৮ ০	৯৭ ৪ ১৭	
হাওয়া	১ ৯ ০	৩০৪ ১ ৫	
	১৭ ১ ০		২,৮৮৭ ০ ৭
মেহ্মানি			৪৮ ১০ ০
হাবুব্ বা কর মোট			৩,৯৯৮ ১৩ ১১
মোট জমা			১৯,৫০৬ ৬ ০

২৯. দামী : জমিদারকে প্রদত্ত বিঘা প্রতি এক দাম হারে নির্ধারিত দস্তুরি।

৩০. দস্তুরি : ফতাদারের দপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত।

৩১. গ্রাম বাবদ খরচের একটি দফা; রায়তগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দর্শনী (যাহা গ্রামের কয়েকজন নির্দিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক অন্যান্য খরচের জন্য ব্যয় হইত)।

৩২. এক টাকা দস্তুরি (বঙ্গদেশে)।

৩৩. গ্রাম সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির প্রয়োজনে ক্রীত কাগজ পত্রাদির মূল্য বাবদ খরচ।

৩৪. কুসুর : ছাড়।

৩৫. মোঘল রাজত্বে ভ্রমণকারী, তীর্থযাত্রী ও আগন্তুক ব্যক্তিগণের আতিথেয়তা বাবদ সাধারণভাবে যাহা খরচ হইত তাহা পূরণ করিবার জন্য জমিদারগণকে রাজস্ব হইতে কিয়ৎ পরিমাণ ছাড়ের অনুমতি। দ্রষ্টব্যঃ উইলসনস্ গ্লোসারী।

৩৬. 'রেভিনিউ রেকর্ডস্ অফ দি নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্স'—পৃঃ ২৬০।

পরিশিষ্ট 'ঘ'

দেওয়ান-ই-সুবা তাঁহার পূর্বতন দেওয়ানের নিকট হইতে নিম্নলিখিত দলিলপত্রাদি অর্জন করিতেন :

(১) আমিন, কানুনগো ও জমিদারগণের সীলাঙ্কিত খালিসা মহালগুলির তুমার।

(২) পাইবাকি মহাল সংক্রান্ত দলিলপত্র।

(৩) পরগনার ফুতাখান সংক্রান্ত দস্তুর-উল-অমাল।

(৪) কানুনগোগণের সীলাঙ্কিত রেজিস্টার, যাহাতে পরগনা প্রতি কুপের সংখ্যা উল্লিখিত থাকিত।

(৫) মহাল-ই-জায়গীরের রেজিস্টার, যাহাতে রাজস্বমন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ উল্লিখিত থাকিত।

(৬) করোরী ও ফুতাদারের সীলাঙ্কিত রাজকোষাগার সংক্রান্ত আবেদন পত্রাদি।

(৭) আমিন, দরোগা ও মুশ্‌রিফের সীলাঙ্কিত, মহাল-ই-সেয়ার সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি।

(৮) আমিন ও দরোগার সীলাঙ্কিত তুমার, যাহাতে পদচ্যুত আমিলগণের বার-আমাদ উল্লিখিত থাকিত।

(৯) আমিলের জামিনদার প্রদত্ত তম্‌সুক্‌।

(১০) জমিদারের নিকট হইতে প্রাপ্য পেশকাশের রেজিস্টার।

(১১) রাজস্বমন্ত্রক কর্তৃক প্রস্তুত, আমিলের হিসাব পরীক্ষা পত্রের প্রতিলিপি।

(১২) আমিল ও অন্যান্যদের প্রতি প্রেরিত পরোয়ানার প্রতিলিপি।

(১৩) রাজ কোষাগারের (খিজানা-ই-আমিরা) আয় ব্যয়ের রেজিস্টার।

(১৪) নগ্‌দি মন্‌সব্‌দার, মাহিয়ানাদার ও রেজিনদারগণের বেতন ফর্দের রেজিস্টার।

(১৫) যে সকল জেলখানায় দেওয়ানী আদালতে সাজা প্রাপ্ত কয়েদীগণ থাকিত, তাহাদের রেজিস্টার।

(১৬) দেওয়ান-ই-সুবার দপ্তরে নিম্নলিখিত দলিলপত্রাদি রক্ষিত থাকিত :

(ক) দেওয়ানী দপ্তর হইতে প্রেরিতে আদেশ সমূহও তাহাদের প্রত্যুত্তরের রেজিস্টার।

(খ) করোরীর সীলাঙ্কিত আয় ব্যয়ের (আওয়ার্‌জা) সংক্ষিপ্ত হিসাব।

(গ) পরগনার দস্তুর-উল্‌-অমাল, যাহাতে মাল, হুবুবত্‌ ও সেয়ার-জিহাত খাদে সংগৃহীত করের উল্লেখ থাকিত।

(ঘ) কানুনগোর সীলাঙ্কিত পরগনার মুয়াজিনা (রাজস্বের সূচনাকাল হইতে)।

(ঙ) চৌধুরী, কানুনগো ও মোকাদ্দাম ইত্যাদি ব্যক্তিগণের প্রদত্ত ইনাম ও নান্‌কার স্বত্বদানের রেজিস্টার।

(চ) নিরিখ্‌-নবীশের (বা মূল্য তালিকা প্রেরক) সীলাঙ্কিত পণ্যদ্রব্যের মূল্য তালিকা।

(ছ) কোষাগার ও তুমার সংক্রান্ত রেজিস্টার; ইহাতে থাকিত আমিন ও মুশ্‌রিফের ছাপ সহ জমা ও মুজ্‌মল বা আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

(জ) পরগনা হইতে রাজস্বমন্ত্রকের নিকট প্রেরিত ও প্রেরকের সীলাঙ্কিত দলিল পত্র।

(ঝ) নিয়োজিত ও পদচ্যুত আমিলগণের তালিকা।

(ঞ) আমিল ও জমিদারগণের নিকট হইতে সরকারের প্রাপ্য আওয়ার্‌জা।

(ত) বিগত বৎসরগুলির বকেয়া পাওনার সংক্ষিপ্ত বিবরণের রেজিস্টার।

(থ) পরগনা হইতে প্রেরিত আমিল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের আবেদন পত্রাদি।

(দ) আয়েমা বিলির রেজিস্টার; রাজস্বমন্ত্রক কর্তৃক প্রেরিত ফারমান ও পরোয়ানা এবং প্রাদেশিক সদর কর্তৃক প্রেরিত তাশিহাগুলির প্রতিলিপি ইহাতে থাকিত।

(ধ) প্রদেশে নিযুক্ত মন্‌সব্‌দারগণের তালিকা।

(ন) প্রাদেশিক টাঁকশাল সংক্রান্ত রেজিস্টার।

পাদটীকা

(১) খুলাসত্‌-উস্‌-সিয়াক্‌ পৃঃ ১৬কখ, দ্রষ্টব্য : ফারহঙ্গ-ই-কারদানি, পৃঃ ৩১খ, ৩২ক।

পরিশিষ্ট 'ঙ'

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অঙ্ক (দামে)
বাংলা	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	৫৯,৮৪,৫৯,৩৯৯
	বাদশাহ্-নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৫০,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-শাহান্শাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	৫২,৪৬,৩৬,১০৪
	দস্তুর উল্-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৪৫,৭৮,৫৮,০০০
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৫২,৩৬,৩৬,২৪০
	খুলাসৎ-উস্-সিয়াক্	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	১৭,২৮,৪১,০০০
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	১৭,২৮,৪১,০০০
	দার-ইল্ম্-ই-নর্বিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৭২,৭১,৯১,০০০
	মালুমৎ-উল্-অফাক্	১৭১৩ খৃঃ	৫২,৩৭,৩৯,১১০
	তারিখ্-ই-শাকিরখানি	মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল	৪৬,২৯,১০,৫১৫
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-গুলাম আহ্মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৪৯,২৯,১০,৫১৫
উড়িষ্যা	আইন-ই-আকবরি	১৬৯৫-৯৬ খৃঃ	—
	বাদশাহ্নামা	১৬৪৭-৪৮ খৃঃ	২০,০০,০০,০০০
	দস্তুর উল্-অমাল-ই-শাহান্শাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	১৮,৪১,০০,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	১২,৫৫,৮০,০০০
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	—
	খুলাসৎ উস্-সিয়াক্	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	১৭,২৮,৪১,০০০
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	১৭,২৮,৪১,০০০
	দার-ইল্ম্-ই-নর্বিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	১৯,২০,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্-অফাক্	১৭১৩ খৃঃ	১৯,৭১,০০,০০০
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল	১৮,৯৭,৭০,৫৯০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-গুলাম আহ্মদ	১৭৪৮ খৃঃ	১৭,১৮,৪১,০০০

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অঙ্ক (দামে)
বিহার	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	২২,১৯,১৯,৪০৪
	ইক্‌বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	২৬,২৭,৭৪,১৬৭
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃ	৪০,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহান্‌শাহী	১৭৩৮-৫৮ খৃঃ	৩৯,৪৩,৪৪,৫৩২
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৫৪,৫৩,০০,৯৩৫
	জাবাবিৎ ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ৩১-৩৫ বৎসর	৪২,৭১,৮১,০০০
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের ৪১ বৎসর	৩৯,৪৩,৪৪,৫৩২
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৩৯,৪৩,৪৪,৫৩২
	দার্‌-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৩৭,৩২,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	৩৭,১৭,৯৭,০১৯
	তারিখ-ই-শাকির খানি	মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল	৩৭,১৭,৩০,০০০
	দস্তুর-উল্‌ অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৩৯,৪৩,৪৪,৫৩২
অযোধ্যা	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	২০,১৯,৫৮,১৭২
	ইক্‌বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	২২,৯৮,৬৫,০১৪
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৩০,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌ অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	২৭,৯৫,৭৯,৬১৯
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৩০,৩৯,৮২,৮৫৯
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৩২,১৩,১৭,১১৯
	খুলাসৎ উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের ৪১ বৎসর	৪৭,৯৫,৭৯,৬১৯
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	২৭,৯৫,৭৯,৬১৯
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	২৫,৮২,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌ অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	৩২,০০,৭২,১৯৩
	তারিখ ই-শাকির খানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	—
	দস্তুর-উল্‌ অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	২৭,৯৫,৭৯,৬১৯

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অংক (দামে)
এলাহাবাদ	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	২১,২৪,২৭,৮১৯
	ইক্‌বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	৩০,৪৩,৫৫,৭৪৬
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৪০,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	৪২,২৩,৪৬,৬২৭
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৫২,৭৮,৮১,১৯৬
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৪৫,৬৫,৪৩,২৭৮
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	৪২,২৩,৩৬,৬২২
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৪২,২৩,৪৬,৬২৮
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৩৭,৮৮,০০,০০০
	মাল্‌মৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	৪৩,৬৬,৮৮,০৭২
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	৩০,৭৫,২০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৪২,২৩,৪৬,৬২৭
আগ্রা	আইন-ই-আকবরি	১৬৯৫-৯৬ খৃঃ	৫৪,৬২,৫০,৩০৪
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৯০,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহান্‌শাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	৯৬,১২,৬৭,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	১,৩৬,৪৬,০২,১১৭
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	১,১৪,১৭,০০,১৫৭
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	———
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৯৬,১২,৫৭,০১৫
	দার ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	১,০০,৯০,০০,০০০
	মাল্‌মৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	১,০৫,১৭,০৯,২৮৩
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	৯৭,৫৬,৯৩,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৯৬,১২,৬৬,৮০৫
দিল্লি	আইন-ই-আকবরি	১৬৯৫-৯৬ খৃঃ	৬০,১৬,১৫,৫৫৫
	ইক্‌বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	৬২,৬২,৩৩,৯৫৬

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অঙ্ক (দামে)
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	১,০০,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	১,২২,২৯,৫০,১৩৭
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	১,৫৫,৮৮,৩৯,১০৭
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	১,২২,২৯,৫০,১৭৭
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	১,২২,১৯,৫০,১৩৭
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুর শাহের রাজত্বকাল	১,২২,১৯,৫০,১৩৭
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৭৮,২০,০০,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	১,১৬,৮৩,৯৮,২৬৩
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	৯৪,৯৩,৪৫,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	১,২২,২৯,৫০,১৩৭
লাহোর	আইন-ই-আকবরি	১৬৯৫-৯৬খৃঃ	৫৫,৯৪,৫৮,৪২৩
	ইক্‌বালনামা	১৬০৫খৃঃ	৬৪,৬৭,৩০,৩১১
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৯০,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল্‌-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	৮৯,৩০,৩৯,৩৩৯
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	১,০৮,৯৭,৫৯,৭৭৬
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৮৯,৮৯,৩২,১৭০
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	৮৯,৩০,৩৯,০৩৯
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৯৯,৩০,৩৭,৫১৯
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৯৩,৪৮,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	৯০,৭০,১৬,১২৫
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	৯৫,৬৫,৭০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৯৬,৩০,৩৯,৩১৯
মুলতান	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	১৫,১৪,০৩,৬১৯
	ইক্‌বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	২৫,৩৯,৬৪,১৭৩

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অংক (দামে)
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	২৮,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	২১,৯৮,০২,৩৬৮
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৩৩,৮৪,২১,৭১৮
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	২১,৪৩,৪৯,৮৯৬
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	২১,৭৭,০২,৪১৮
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	২১,৯৮,০২,৭১৮
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	২২,৫৫,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌-আফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	২৪,৫৩,১৮,৫৭৫
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	২৩,৯৫,৬০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	২১,৯৮,০২,৪১৮
থাট্টা	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	———
	বাদশাহ্‌নামা	১৮৪৬-৪৭ খৃঃ	৮,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৮৩৮-৫০ খৃঃ	৬,০১,৩৮৮
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৮,৯২,৩০,০০০
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ৩১-৩৫ বৎসর	৬,৮৮,১৬,৮১০
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ৪১ বৎসর	——
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৬,৩০,৮১,৫৮৭
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৯,২৮,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	৯,৪৯,৮৬,৯০০
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল	৪,৫১,৯৫,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৬,৩০,৮১,৩৮৮
কাশ্মীর	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	৭,৪৬,৭০,৪১১ ৭,২৯,২১,৯৭৬
	তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি		৭,৪৬,৭০,৪১১

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অঙ্ক (দামে)
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	১৫,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	২৫,৭৯,১১,৩০৬
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	১১.৪৩,৯০,০০০
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	২২,৪৯,১১,৬৮৭
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	২৭,৭৯,১০,৩৯৭
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	২৭,২৯,২১,৩৯৭
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	১৪,০২,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	২১,৩০,৭৪,৮২৬
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল	১২,৬২,৮৫,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	২৭,৭৯,২১,৩৯৭
কাবুল	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	৭,৪৬,৭০,৪১১
	বাদশাহ্‌নামা	১৮৪৬-৪৭ খৃঃ	১,৬০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	২০,১১,৮১,৬৪২
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	১৯.৭০,৭৮,০০০
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	১৬,১০,৪৯,৩৫৪
	খুলাসৎ-উস্‌-সিয়াক্‌	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	২০,২০,৮১,৬৪২
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	১১,২১,৮১,৬৪২
	দার-ইল্‌ম্‌-ই-নবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	১৩,০৯,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্‌-অফাক্‌	১৭১৩ খৃঃ	১৫,৭৬,২৫,৩৮০
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	১৯,২৪,১৮,০০০
	দস্তুর-উল্‌-অমাল-ই-গুলাম আহ্‌মদ	১৭৪৮ খৃঃ	২০,২১,৮১,৬৪২
আজমীর	আইন-ই-আকবরি	১৬৯৫-৯৬ খৃঃ	২৮,৮৪,০১,৫৫৭
	ইক্‌বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	৩০,৯৯,১৭,৭২৪
	বাদশাহ্‌নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৫৫,০০,০০,০০০

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অঙ্ক (দামে)
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	৬০,২৯,৮০,২৭০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৬৪,৮৬,৬১,৬৫৮
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৮৫,২৬,৪৫,৭০২
	খুলাসৎ-উস্-সিয়াক্	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	৬০,২৯,৮০,২৭০
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	১,২৯,৮০,২৭০
	দার-ইল্ম্-ই-নর্বাসিন্দিগ	১৭১১ খৃঃ	৮৭,০০,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্-অফাক্	১৭১৩ খৃঃ	৬৩,৬৮,৯৪,৮০০
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	——
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-গুলাম আহ্মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৬০,২৯,৮০,২৭০
মালব	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	২৪,০৬,৯৫,০৫২
	ইক্বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	২৫,৭৩,৭৮,২০১
	বাদশাহ্নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৪৬,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	৪০,৮৩,৪৬,৯২৫
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৩৯,৮৫,০০,০০০
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৪০,৩৯,৮০,৬৫৮
	খুলাসৎ-উস্-সিয়াক্	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	৪০,৮৩,৪৬,৭১৮
	হাকিকৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৪০,৮৩,৪৬,৭১৩
	দার-ইল্ম্-ই-নর্বাসিন্দিগ	১৭১১ খৃঃ	৩৯,৮৫,০০,০০০
	মালুমৎ উল্-অফাক্	১৭১৩ খৃঃ	৪২,৫৪,৮৬,৬৭০
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	৩৩,৯০,১০,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-গুলাম আহ্মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৪০,৮৩,৪৬,৮১৮
গুজরাট	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	৪৩,৬৮,২২,৩০১
	ইক্বালনামা	১৬০৫ খৃঃ	৪৬,৯১,৫৯,৬২৪
	বাদশাহ্নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৫৩,০০,০০,০০০

প্রদেশ	উৎস	তারিখ	জমার অঙ্ক (দামে)
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	৫৩,৮৫,২৫,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৮৬,৯২,৮৮,০৬৯
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৪৫,৪৭,৪২,১৫৩
	খুলাসৎ-উস্-সিয়াক্	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	৫৩,৬৫,২৫,০০০
	হাকিক্ৎ-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৫৩,৬৫,২৫,০০০
	দার-ইল্ম্-ই-নাবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৫৩,০০,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্-অফাক্	১৭১৩ খৃঃ	৪৪,৮৩,৮৩,০৯৬
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদশাহের রাজত্বকাল	৪৬,৫১,৫০,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-গুলাম-আহ্মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৫৩,৬৫,২৫,০০০
বেরার	আইন-ই-আকবরি	১৫৯৫-৯৬ খৃঃ	৬৪,০০,০০,০০০
	বাদশাহ্নামা	১৬৪৬-৪৭ খৃঃ	৫৫,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-শাহানশাহী	১৬৩৮-৫০ খৃঃ	—
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি	১৬৫৮-৫৯ খৃঃ	৯২,৬৫,৪৬,০০০
	জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৩১-৩৫ বৎসর	৯২,৬৫,৪৫,০০০
	খুলাসৎ-উস্-সিয়াক্	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালের ৪১ বৎসর	৯২,৬৫,৪৫,০০০
	হাকিক্ত-ই-দামি	বাহাদুরশাহের রাজত্বকাল	৯২,৬৫,৪৫,০০০
	দার-ইল্ম্-ই-নাবিসিন্দিগি	১৭১১ খৃঃ	৬৩,৫০,০০,০০০
	মালুমৎ-উল্-অফাক্	মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল	৯৫,০০,০০,০০০
	তারিখ-ই-শাকিরখানি	মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল	৯৫,০০,০০,০০০
	দস্তুর-উল্-অমাল-ই-গুলাম আহ্মদ	১৭৪৮ খৃঃ	৯২,৬৫,৪৫,০০০

গ্রন্থ-বিবরণী

ইতিবৃত্ত-পাণ্ডুলিপি

(১) নুস্‌খা-ই-দিলখুসা, ভীম সেন, ১৭০৯ খৃঃ বৃটিশ মিউজিয়াম রিউ ১, অর ২৩।

(২) মুন্তখাব্‌-উল্‌-তবারিখ্‌, জগজীবন দাস, ১১২১ হিঃ/১৭০৯-১০ খৃঃ, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অ্যাড ২৬২৫৩।

(৩) জাহান্দার নামা, নূর উদ্দীন ফারুকি-১১২৮ হিঃ/১৭১৫-১৬ খৃঃ, ইণ্ডিয়া অফিস্‌ ৩৯৮৮।

(৪) ফারুখ্‌-সিয়র নামা, মীর মহম্মদ আহ্‌সান ইজাদ্‌, ১১২৫ হিঃ/১৭১৩-১৪ খৃঃ, বৃটিশ মিউজিয়াম রিউ ১, অর ২৫।

(৫) হাফ্‌ৎ-ই-গুলসান-ই-মহম্মদ শাহী, মহম্মদ হাদি কামবার খান, ১১৩২ হিঃ, ১৭১৯-২৯ খৃঃ, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অর ১৭৯৫।

(৬) শাহ্‌নামা-ই-মুনাব্বর-উল্‌-কালাম, সিউ দাশ লক্ষ্ণৌভি, ১১৩৪ হিঃ/১৭২১-২২ খৃঃ বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অর ২৬।

(৭) ফারুখ সিয়র নামা, মহম্মদ কাশিম, ইব্রাত্‌ হুসেন লাহোরি, ১১৩৫ হিঃ, ১৭২২-২৩ খৃঃ, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অ্যাড ২৬৪৫।

(৮) তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-হিন্দি, লালরাম, ১১৪৮ হিঃ/১৭৩৫-৩৬ খৃঃ বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অ্যাড ৬৫৮৪।

(৯) তাজকিরাত্‌-উল্‌-মুলুক, ইয়াহিয়া খান, ১১৪৯ হিঃ ইণ্ডিয়া অফিস্‌ এথে, ৪০৯।

(১০) আহ্‌ওয়াল-উল্‌-খাবাকিন্‌, মহম্মদ কাশিম, ১১৫১ হিঃ/১৭৩৮-৩৯ খৃঃ, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অ্যাড ২৬২৪৪।

(১১) তারিখ-ই-শাকিরখানি, শাকির খান (মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল) বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অ্যাড ৬৫৮৫।

(১২) তারিখ-ই-হিন্দি, রুস্তম আলি খান, ১১৫৪ হিঃ/১৭৪১-৪২ খৃঃ, বৃটিশমিউজিয়াম, রিউ ৩, অর ১৬২৮।

(১৩) মুন্তখাব-অজ্‌-চাহার-গুলজার-ই-শুজাই, হরচরণ দাস, ১১৯৯ হিঃ/১৭৮৪-৮৫ খৃঃ, বৃটিশ মিউজিয়াম অর ১৭৩২।

ইতিবৃত্ত-প্রকাশিত

(১) আকবর নামা, আবুল ফজল, বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, তিনখণ্ড, কলিকাতা ১৮৭৩-৮৭।

(২) তবকত্‌-ই-আকবরি, নিজাম উদ্দীন, বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, তিনখণ্ড, কলিকাতা ১৯১৩, ২৭,৩১-৩৫।

(৩) মুন্তখাব-উৎ-তবারিখ্‌, আবদুল কাদের বদাউনি, বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা, তিনখণ্ড, কলিকাতা ১৮৬৯।

(৪) তুজ্বক্-ই-জাহাঙ্গীরি, জাহাঙ্গীর, সৈয়দ আহ্মদ সম্পাদিত, প্রাইভেট প্রেস, আলিগড়, ১৮৬৪।

(৫) ইক্বালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, মুতামদ্ খান, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৬৫।

(৬) বাদশাহ্নামা, আবদুল হামিদ লাহোরি, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, দুইখণ্ড, কলিকাতা, ১৮৯৮।

(৭) অমাল-ই-সালেহ, মহম্মদ সালেহ কাম্বো, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, তিনখণ্ড, কলিকাতা, ১৯২৩, ১৯২৭, ১৯৩৯।

(৮) আলমগিরি নামা, মুন্সি মহম্মদ কাজিম, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৭২।

(৯) মুন্তখাব-উল্-লুবাব, কাফি খান, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, দুইখণ্ড, কলিকাতা, ১৮৬৮, ১৮৭৪।

(১০) সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন, গুলাম হুসেন তাবাতাবাই, তিন খণ্ড, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৭৮৪।

(১১) রিয়াজ্-উস্-সালাতিন্, গুলাম হুসেন সলিম, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৯০।

(১২) মিরাট-ই-আহ্মদি, আলি মহম্মদ খান, ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট, বরোদা, তিন খণ্ড, ১৯২৩।

(১৩) মাসির-উল্-উমারা, শাহ্নাওয়াজ খান, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, তিন খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৮৮-৯১।

প্রশাসনিক সার-গ্রন্থ

(১) আইন-ই-আকবরি, আবুল ফজল, নওল কিশোর প্রেস, দুই খণ্ড, লক্ষ্ণৌ, ১৮৯৩।

(২) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-শাহানশাহী, ১৬৩৮-১৬৫৮, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অ্যাড. ২২৮৩১।

(৩) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-আলমগিরি, ১৬৫৮ খৃস্টাব্দের পর, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ১, অ্যাড. ৬৫৯৯।

(৪) জাবাবিৎ-ই-আলমগিরি, ১৬৯২ খৃস্টাব্দের পর, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ৩, অর. ১৬৪১।

(৫) খুলাসৎ-উস্-সিয়াক্, ১১১৫ হিঃ/১৭০৩-৪ খৃঃ স্থলেমান ৪১০/১৪৩ ঃ স্থভানুল্লা, জামিমা, ৯০০/১৫ ; মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড় ; বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ২, অ্যাড. ৬৫৮৮।

(৬) ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি, জগৎরাই শুজাই, ১০৯০/১৬৭৯ খৃঃ আবদুস সালাম ৮৫/১৩৫ ; মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

(৭) হিদায়াৎ-উল্-কায়েদ্, হিদায়াৎ উল্লা বিহারী, ফারুখ সিয়ারের রাজত্বকাল, আবদুল সালাম, ৩৭৯/১৪৯, মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

(৮) মালুমৎ-উল্-অফাক্, আমিন উদ্দীন খান, ১১২৫ হিঃ/১৭৩১ খৃঃ, আবদুস সালাম, ১৪৯/৩৭৯, মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

(৯) হাকিকৎ-ই-হিন্দুস্থান, লছ্মি নারায়ন ১২০৮ হিঃ/১৭৯৩ খৃঃ ফারসিয়া আখবর, ১০০, মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

(১০) হাকিকৎ-ই-দামি-ওয়া-হাসিলৎ-ই-মুমালিক-ই-মাহ্রুসা, অজ্ঞাত, বাহাদুর শাহের রাজত্বকাল, সুলেমান ৯০০/২১, মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

(১১) দামি-ই-ওয়া-হাসিল-ওয়া-মুসাফ্ত-ই-মুমালিক-ই-মাহ্রুসা, গুলাম আহ্মদ, ১৭৪৮ খৃস্টাব্দের পর, ফারসিয়া আখবর, ১২৬, মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

সংগৃহীত দলিল ও চিঠিপত্রাদি

(১) নিগার নামা-ই-মুন্সি, মুন্সি মালিকজাদা, ১০৯৮ হিঃ/১৬৯৩ খৃঃ মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

(২) দস্তুর-উল্-অমাল-ই-বেকাস্, জওহর মাল বেকাস, ১১৫৪ হিঃ/১৭৩১ খৃঃ সুভানুল্লা ৯৫৪/৪, মৌলানা আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়।

(৩) রুক্ক্ৎ-ই-আলমগিরি, নজিব আশরফ নাদ্বি সম্পাদিত, দারুল মুসান্নিফিন্, আজমগড়।

(৪) রুক্কত-ই-আলমগিরি, কানপুর।

(৫) মাক্তুবাৎ-ই-খান্-ই-জাহান, গোয়ালিয়র নামা, জালাল হিসারি সম্পাদিত, শাহজাহানের রাজত্বকাল, বৃটিশ মিউজিয়াম রিউ ২, অ্যাড. ১৬৮৫৯।

(৬) এলাহাবাদ ডকুমেণ্টস্, ফারমান, পরওয়ানা, বিক্রয়-দলিল, তাসিহা, আদালতের ডিক্রি ইত্যাদি, সময়কাল আকবর থেকে মহম্মদ শাহ।

(৭) ইম্পিরিয়াল ফারমান (১৫৭৭-১৮০৫), মাননীয় টিকায়ৎ মহারাজ, বোম্বাই-কে প্রদত্ত, ১৯২৮।

(৮) সিলেক্টেড্ ডকুমেণ্টস্ অব্ শাহ্জাহান'স রেন, দপ্তর-ই-দিওয়ানি, হায়দ্রাবাদ, ডেকান ১৯৫০।

(৯) দুরুল-উলুম্, সাহিব্ রাই ১১০০ হিঃ/১৬৮৮ হিঃ ১১৮৯ খৃঃ, এম. এস. বোড ১ ৪০০ (ওয়াকার ১০৪)।

ওয়াকাই এবং আকবরাত বা নিউজ লেটার

(১) ওয়াকাই সুবা আজমীর, ইনায়েতুল্লা, মীর বক্সী-ওয়া-আকবর নবিস ২২ তম, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ২৪ তম বৎসর (আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিসার্চ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়)

(২) সিলেক্টেড্ ওয়াকাই অব্ ডেকান, সেণ্ট্রাল রেকর্ডস অফিস, হায়দ্রাবাদ।

(৩) আকবরাৎ-ই-দরবার-ই-মুয়াল্লা, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডন, তের খণ্ড, কালানুক্রমে বাঁধানো। প্রতি বছর ক্রমানুসারে নম্বর করা।

ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি

(১) রিসালা-ই-জিরাত, ১৭৫০, এডিনবরা পাণ্ডুলিপি (পৃঃ ১২৩) নং ১৪৪।

(২) গ্লসারি অব্ রেভিনিউ টার্ম, খাজা ইয়াসিন অব্ দিল্লী, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ, বৃটিশ মিউজিয়াম, রিউ ২, অ্যাড. ৬৬০৩।

(৩) রিপোর্ট (পার্সিতে) অন দি প্রি বৃটিশ সিস্টেম অব্ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বেঙ্গল, রাই রায়ান ও কানুনগোগণ প্রণোদিত, ১৭৭৭, রিউ ১, অ্যাড. ৬৫৯২, অ্যাড. ৬৫৮৬।

(৪) 'মেময়্যারস্ অন্ দি রেসেস্ অব্ দি নর্থ ওয়েষ্টার্ন প্রভিন্সেস্ অব ইণ্ডিয়া' এইচ, এম এলিয়ট, দুই খণ্ড, লণ্ডন ১৮৬৯।

(৫) এ গ্লসারি অব্ জুডিশিয়াল এণ্ড রেভিনিউ টার্মস অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া, ডব্লু. এইচ উইলসন, লণ্ডন, ১৮৭৫।

(৬) সিলেক্শনস্ ফ্রম দি রেভিনিউ রেকর্ডস অব দি নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্সেস্, ১৮১৮-১৮২০, কলিকাতা, ১৮৬৬।

(৭) স্টাডিস্ ইন্ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল ১৭৬৯-১৭৮৭, আর. বি. র‍্যামস্‌বথাম, কলিকাতা ১৯২৬।

বিবিধ পাণ্ডুলিপি

(১) মিরাট-উল্-ইস্তিলাহ, আনন্দরাম মুখলিশ, মহম্মদ শাহের শেষ জীবন, আনজুমান-ই-তারাকি-ই-উর্দু লাইব্রেরী, আলিগড়।

(২) মাখ্জান-ই-আকবর, সাদাৎ খান ১২০৫ হিঃ/১৭৯০-৯১, উত্তর প্রদেশ, রাজ্য মহাফেজখানা, এলাহাবাদ, ডকুমেণ্ট নং ১৮৩।

বিদেশী পর্যটক

(১) 'জাহাঙ্গীরস্ ইণ্ডিয়া,' ফ্রান্সিস্কো পেলসারেট, মোরল্যাণ্ড এবং গিল অনুদিত, কেম্ব্রিজ, ১৯২৫।

(২) 'বের্নিয়েস্ ভয়েজ্ টু দি ইস্ট ইণ্ডিস্,' ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ে, ইলিসিয়াম প্রেস, কলিকাতা ১৯০৯।

(৩) 'এ জার্ণি থ্রু দি কিংডম অব্ আউধ ইন্ ১৮৪৯-১৮৫০,' ডব্লু. এইচ. স্লিম্যান, দুই খণ্ড, লণ্ডন ১৮৫৮।

(৪) দি গার্ডেন্ অব্ ইণ্ডিয়া, অর চ্যাপটারস্ অন্ আউধ হিস্টরি এণ্ড এফেয়ারস্,' এইচ. সি. আরউইন, বি. এ. অক্সন্, লণ্ডন, ১৮৮০।

গৌণ সূত্র

(১) 'লেটার মুঘলস্, ডব্লু আরভিন, কলিকাতা ১৯২২।

(২) 'ফল অফ দি মুঘল এম্পায়ার' (প্রথম খণ্ড), যদুনাথ সরকার, ১৯৩২।

(৩) 'পার্টিস্ এণ্ড পলিটিক্স্ অ্যাট দি মুঘল কোর্ট,' ১৭০৭-১৭৪০, সতীশ চন্দ্র, আলিগড় ১৯৫৯।

(৪) 'মুঘল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন,' যদুনাথ সরকার, কলিকাতা ১৯৫২।

(৫) 'দি আর্মি অফ দি ইণ্ডিয়ান মুঘলস্, ডব্লু আরভিন, লণ্ডন ১৯০৩।

(৬) 'দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব্ মোস্লেম ইণ্ডিয়া' ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড, সেণ্ট্রাল বুক ডিপো, এলাহাবাদ।

(৭) সাম আসপেক্টস্ অব মুসলিম এ্যাডমিনিস্ট্রেশন' আর. পি. ত্রিপাঠী, এলাহাবাদ ১৯৩৬।

(৮) 'সেন্ট্রাল স্ট্রাক্চার অব দি মুঘল এম্পায়ার' ইব্ন-ই-হাসান, লণ্ডন ১৯৩৬।

(৯) 'দি প্রভিনশিয়াল গভর্ণমেণ্ট অব দি মুঘলস্' (১৫২৬-১৫৫৮) পি. শরণ, এলাহাবাদ।

(১০) 'দি মন্সবদারি সিস্টেম এ্যাণ্ড দি মুঘল আর্মি' আবদুল আজিজ্, লাহোর, ১৯৪৫।

(১১) 'পার্সিস্ এ্যাট দি কোর্ট অব আকবর,' জীবনজী জামসেদজী মোদি, বম্বে, ১৯০৩।

(১২) 'ইণ্ডিয়া এ্যাট দি ডেথ অব আকবর' ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড, লণ্ডন ১৯২০।

(১৩) 'ফ্রম আকবর টু আওরঙ্গজেব,' ডব্লু. এইচ. মোরল্যাণ্ড, লণ্ডন, ১৯২৩।

(১৪) 'রেভিনিউ সোর্সেস অব দি মুঘল এম্পায়ার ইন্ ইণ্ডিয়া ফ্রম এ. ডি. ১৫৯৩ টু ১৭০২' ই. টমাস, লণ্ডন ১৮৭১।

(১৫) 'দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব্ দি সুলতানেট অব্ দিল্লী,' ইস্তিয়াক্ হুসেন কুরেশী, লাহোর ১৯৪৪।

(১৬) 'মোহামেডান থিয়োরিস্ অব্ ফাইন্যান্স', নিকোলাস. পি. এগিণ্ডেস, ১৯১৬।

নির্দেশিকা পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি

(১) 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম,' এম. টি. এইচ, হোৎস্মান এ্যাণ্ড আদারস্ ১৯৩৭।

(২) 'ইসলামিক কালচার,' ষোড়শ খণ্ড, ১৯৪২।

(৩) 'দি জার্নাল অব্ দি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি,' লণ্ডন ১৯৩৬।

(৪) দি জার্নাল অব্ দি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি' লন্ডন ১৯১৮।

(৫) 'দি মিডিয়াভ্যাল ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৬১।

নির্দেশিকা

(মূল ইংরাজী গ্রন্থের ন্যায় ইংরাজী বর্ণানুক্রম অনুসরণ করা হয়েছে)